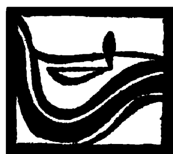


প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
আলেম আনসারী

ছেপেছেন
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

লায়লা রহমান
কল্যাণীয়াসু
আ. র.

ভূমিকা

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনুবাদ এবং উপন্যাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ দুটি ছাড়া বাকী সব রচনাই ইতঃপর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বারোমাসীবিষয়ক প্রবন্ধটি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে লিখিত এবং প্রকাশিত পাঁচটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের সম্পাদিত সমাহার।

শিশুসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধটিও প্রথমে খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধের আকারে লিখিত এবং প্রকাশিত হয়। আমার জন্যে গৌরবের বিষয়, প্রবন্ধগুলি অনেকেই তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, গভীর দুঃখের কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জনৈক প্রাক্তন অধ্যাপক—যিনি এক সময় বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন এবং চার খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের একখানি ইতিহাসগ্রন্থ লেখেন, এই প্রবন্ধগুলির বহু অংশ বিনা স্বীকৃতিতে হুবহু তাঁর গ্রন্থে বাংলাদেশের শিশুতোষ ছড়া আর কবিতা সম্পর্কিত অধ্যায়ে ঢুকিয়ে নেন। সম্প্রতি জানা গেল, তাঁর অপকর্মের সাক্ষী উক্ত গ্রন্থখানি আবার বাংলা সাহিত্যের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নসহায়ক গ্রন্থ রূপেও অনুমোদিত হয়েছে।

উপন্যাস সম্পর্কিত প্রবন্ধটি একটি সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে লিখিত হয়। এগুলির—এবং অন্যান্য প্রবন্ধেরও—রচনা তথা প্রথম প্রকাশের পর যতো দূর সম্ভব সংশোধন, পরিবর্ধন, এবং পরিমার্জন করেছি।

এই গ্রন্থের নামকরণের জন্যে আমি সহকর্মী বন্ধু রেডিয়ো ইঞ্জিনীয়ার জনাব আজিজল হকের কাছে ঋণী।

আ. র.

চর্যাপদে কালের কথা

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে আবিষ্কৃত এবং দেশ-বিদেশের বহু মনীষী কর্তৃক আলোচিত চর্যাপদাবলী বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। এই পদাবলী সংখ্যায় বেশী নয়। কিন্তু এগুলির মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের যে তত্ত্বাদি নিহিত রয়েছে, ধর্মরসিকদের কাছে তা অত্যন্ত মূল্যবান। অন্য দিকে, ভাষা-বিশেষজ্ঞদের মতে, চর্যাপদগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতমো সার্থক নিদর্শন।

সাধারণ পাঠকদের কাছে চর্যাপদাবলীর আরো দুটি মূল্য স্বীকৃত। এগুলির মধ্যে এদেশের প্রাচীন কালের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের যে চিত্র বিধৃত রয়েছে, তা সমকালীন অন্যাবিধ সাহিত্যে দুর্লভ। চিত্রগুলি অসম্পূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে আভাস মাত্রে পর্যবসিত এবং সে-আভাসও নানা শ্রেণীজন অধ্যুষিত এই দেশটির রূপদর্শী নয়। তবু, তাম্রশাসন, পত্রদলিল, শাস্ত্র-পুরাণ, মুদ্রা-মোহর এবং বিদেশী পর্যটকদের সফরনামা থেকে এদেশের যেসব প্রাচীন ইতিহাস-কথা পাওয়া যায়, সেগুলির বিস্তৃতি এবং চমক যতোই থাক, জোনাকির ভূমিকায়ও তাদের সার্থকতা প্রাকৃতজনের কাছে অসম্পন্ন। তাম্রশাসনাদি রাজন্যবর্গ এবং অসাধারণদের কাহিনী। কিন্তু চর্যাপদাবলীর ক্ষণদীপ্তি শুধুমাত্র প্রাকৃত-জনলোকেরই অন্ধকার ছিদ্রময় করেছে। বাংলা সাহিত্যের এক প্রখ্যাত ইতিহাসকারের ভাষায়, 'চর্যাগীতিতে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাভাষিত চর্যাগীতি-গুলিতে, সমসাময়িক জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আর কোথাও নাই, এমন কি মধ্যকালীন সাহিত্যেও এমন বস্তু নাই। চর্যাগীতিতে যে জীবনচিত্র ক্ষণোদ্‌ভাষিত—তাহা দেবী-দেবার নয়, রাজা-উজীরের নয়, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের নয়, ব্যাধ-বণিকেরও নয়। ইতিহাসে

সাহিত্যের রীতিসিদ্ধ গতানুগতিক বর্ণনা নাই। সেকালের ছোট-বড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার ও আচরণের বিম্বপ্রায় প্রতিরূপ গানগুলিকে ঐতিহাসিক জীবনরসিকের কাছে মূল্যবান করিয়াছে।'[১]

চর্যাপদাবলী বাংলার যেসব তথ্যের বাহক, আর একটি কারণে সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাম্রশাসনাদি ছাড়া আর কোনো সূত্র থেকে আহরিত ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সন-তারিখ দ্বারা চিহ্নিত নয়। অথচ ইতিহাসে সন-তারিখের মূল্য প্রায় অপরিসীম। চর্যাপদাবলীর রচনাকাল দিনক্ষণের বেড়া দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা আজও সম্ভব হয়নি। তবু, এ-সিদ্ধান্ত এখন প্রায় তর্কাতীত যে, এগুলি এদেশের সংস্কৃতির আদি যুগের দিগ্‌দর্শক। যে-যুগ সম্পর্কিত তথ্য এখনো আমাদের সঞ্চয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এবং যুগটির গুরুত্ব যে কোথায়, ইতিহাসকারদের কাছে তাও অজ্ঞাত নয়। আজ থেকে 'প্রায় হাজার বছর আগে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ভারতবর্ষে'র মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে শুরু করলে— তখন গুপ্ত যুগ শেষ হয়েছে, পাল যুগ চলছে, সেনযুগ আছে সামনে। এই সময়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্ম।'[২] বলা বাহুল্য, যে কোনো বিষয়েরই সূত্রপাতের কাহিনী এবং পটভূমিকা তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্যে অপরিহার্য এবং চর্যাপদাবলী নির্দিষ্ট কালের তথ্য দিয়ে এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে।

রচনাশৈলী বা শিল্পগুণের দিক থেকে চর্যাপদাবলীর স্থান বাংলা সাহিত্যে যে কোটিতেই হোক না কেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো চিত্রাঙ্কনের সচেতন প্রয়াস তাদের মধ্যে লক্ষণীয় নয়। মুখ্যতঃ ধর্মতত্ত্বের আলোচনাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য এবং সমসাময়িক সমাজের যে ছায়া তাদের মধ্যে পড়েছে, তা 'বিম্বপ্রায়' হলেও নিতান্তই আধা-প্রাসঙ্গিক। মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট করবার জন্যেই তার আবির্ভাব। ঠিক যেমনভাবে আমাদের লোকসাহিত্যে স্থান-কাল ছায়া ফেলেছে।

একথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে, প্রথম দিকে চর্যাপদাবলী-সম্পর্কিত আলোচনাগুলির লক্ষ্য ছিলো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতমো

---

[১] সুকুমার সেন: 'চর্যাগীতি-পদাবলী.' পৃঃ ২৫-২৬
[২] গোপাল হালদার: 'বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ,' পৃঃ ১৯

নিদর্শনের প্রচার। ধর্মতত্ত্ব, সমাজচিত্র ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসব আলোচনায় এসেছে গৌণরূপে। বিশেষভাবে কোনো প্রসঙ্গ অবলম্বনে সম্পাদিত গবেষণা অত্যন্ত অল্প। অবশ্যি, চর্যাপদের সংখ্যাল্পতা কোনো প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগও দেয় না।

তবু, দেশ-বিদেশের মনীষীরা চর্যাপদাবলী নিয়ে এ-যাবৎ যে সমস্ত আলোচনা এবং গবেষণা করেছেন, মত আর পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মিলিতভাবে সেগুলি পাঠকদের সম্মুখে চর্যাসাহিত্যের প্রায় পূর্ণ পরিচয়ই তুলে ধরে। এই সব আলোচনা-গবেষণার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ডঃ সুকুমার সেনের 'চর্যাগীতি-পদাবলী'। অন্যান্য মনীষীর গবেষণা প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থে চর্যাপদাবলীর পূর্ণ পরিচয় দানের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং তাঁর প্রতিটি প্রসঙ্গের আলোচনা তথ্যের দিক থেকে ঋদ্ধ। চর্যাযুগের জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করেছেন, সমালোচনা-মূলক বিশ্লেষণ তাতে নেই। তবু, আজও তা অতুলনীয়। পূর্বভাষণেই স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়, বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচনা এবং প্রতিপাদ্যের প্রধান ভিত্তি 'চর্যাগীতি-পদাবলী'।

বক্তব্যের প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ্য। আগেই বলা হয়েছে, ডঃ সুকুমার সেন তথা তাঁর সতীর্থদের মতে, চর্যাগীতিতে চিত্রিত জীবন সাধারণ মানুষের এবং এই সাধারণ মানুষ বিশেষ কোনো শ্রেণী. গোত্র বা সম্প্রদায়ের নয়। কিন্তু লক্ষণীয়, চর্যাকারদের দৃষ্টি যাদের দিকে বেশী ছিলো, তারা নিরতিশয় দরিদ্র। পক্ষান্তরে, যেহেতু বৃহত্তরো সমাজের কোনো অংশের পক্ষেই অন্যান্য অংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব নয়, তাই চর্যাগীতিতে প্রাকৃত সমাজ-সম্পর্কিত প্রসঙ্গে এমন কথার উল্লেখও আছে, যা সেকালের সমগ্র সমাজের বেলায়ই প্রযোজ্য। যেমন, বিবাহ-উৎসব এবং মৃতের সৎকারের বর্ণনা।

সব মিলিয়ে চর্য্যপদাবলী থেকে সেকালের যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলিকে মোটামুটি হিসেবে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মনৈতিক এবং রাজনৈতিক। এগুলি ছাড়াও এমন দুই-একটি বিষয় চর্যাপদে আছে, যেসবের আলোচনা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের

ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ অসম্ভব। কিন্তু উপরি-উক্ত বিষয়গুলির সাহায্যে চর্যাযুগের বাংলার মনকে একটুখানি জেনে নেয়ার চেষ্টা দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়।

আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, চর্যাপদে সেকালের মানুষের যে জীবন বিধৃত, তা 'ক্ষণোদ্‌ভাসিত'। ক্ষণোদ্‌ভাসের পক্ষে পূর্ণ চিত্র উপস্থাপন কখনো সম্ভব নয়। একথা সমগ্র সমাজের বেলায় তো বটেই, সমাজের যেসব অংশ চর্যাপদে আলোকিত, তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য। এই অসম্পূর্ণতা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় চর্যাপদাবলী স্বল্পবাক, যদিচ এক্ষেত্রে তথ্যগুলি সংখ্যা এবং ঔজ্জ্বল্য উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট মূল্যবান। সাধারণ জীবনযাত্রার আভাস, সম্প্রদায় বিশেষের জীবিকার্জনের উপায়, আহার্য-পানীয়, অলঙ্কার-প্রসাধন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো অনেক বিষয়ের উল্লেখই বিভিন্ন চর্যাপদে পাওয়া যাবে।

চর্যাপদের যুগে এদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিলো, তা অবশ্য বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলি থেকে বিস্তারিতভাবে এবং নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব নয়। অনেক বাঙালীর ঘরে সোনা-রূপোর লোভনীয় সঞ্চয় দেখা গেছে, ব্যাপার-বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট আয় হত এবং সচ্ছল গৃহস্থরা দুধে ভাতে দিন কাটাতো,—এমন তথ্যের আভাস একাধিক চর্যায় আছে। কিন্তু 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী, হাড়ীত ভাত নাঁহি',—আমার বাড়ী টোলায়, আমার না আছে পড়শী, না আছে হাঁড়িতে ভাত,—এ-ধরনের কথা বলবার লোকেরও অভাব ছিলো না। একটি চর্যায় দেখি,—'সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ,'—ডোমনী সরোবর থেকে মৃণাল তুলে খায়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই মৃণাল-ভোজন সব সময় সখের ব্যাপার ছিলো না। দুই-একটি চর্যায় প্রাকৃতজনের বাসগৃহের বর্ণনা আছে। সে-বর্ণনায় আর যা-ই থাক, গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের কথা নেই। দরিদ্র কুলবধূদের প্রসবের সময় আঁতুড়-ঘর খুঁজে বেড়াতে হত। চর্যাপদে যারা ভীড় করেছে, তাদের প্রায় সবারই দশা এদের মতো। এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য, শুধু বর্তমান কালে নয়,

জ্ঞাত ইতিহাসের প্রায় সর্ব যুগেই সমাজে এ-জাতীয় লোকের সংখ্যাই ছিলো সবচেয়ে বেশী। দেশের বিশেষ একটি অঞ্চল (সেকালে বঙ্গ দেশ নামে পরিচিত) যে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছোয় এবং তার এই দুর্দশা যে তাকে অন্যান্য অঞ্চলের লোকচক্ষে সব দিক থেকেই হেয় করে তোলে, ভুসুক তাঁর একটি চর্যায় তার তো স্পষ্ট প্রমাণই দিয়েছেন,—

··অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী ॥···

—নির্দয় দস্যু দেশ লুট করে গেল, তার ফলে আমি ভুসুক বাঙালী হলাম এবং আমার গৃহিণীকে চণ্ডালে কেড়ে নিলো।

পদকর্তা সরহের একটি ইঙ্গিত এর থেকেও কঠোর। তাঁর মতে, বঙ্গ দেশের মেয়ে বিয়ে করলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও নষ্ট হত। তিনি নিজের উদ্দেশে বলেছেন, —'বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিণাণা।' অর্থাৎ বঙ্গ দেশে বিয়ে করবার পর তোর বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে গেল।

এই সব সাক্ষ্য দেখে একটি কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে। আমাদের প্রাচীন 'সোনার' বাংলা দেশের সর্বত্র এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্যে দুধ-মধুর নদী প্রবাহিত হত না। ইতিহাস-পরিবেশিত অন্যান্য তথ্য এবং প্রসঙ্গের আলোচনা থেকেও এ-কথার সমর্থন মিলবে।

দেশে ভূমিস্বত্বভোগী বিত্তবান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিলো, কৃষি এবং বাণিজ্য ছিলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ইত্যাদি ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগ চর্যাকাররা আমাদের অবশ্যই দিয়েছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির সম্পর্কে তাঁরা খুব বেশী কথা বলেননি। তাঁদের রচনায় তো ভীড় বেশী শবর-চণ্ডাল, শুঁড়ি-কাপালিক এবং সূত্রধর-তন্তুবায়ের মতো প্রাকৃতজনের। তাও আবার দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের।

এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শবরদের জীবন এবং জীবিকা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় শবরপাদ, শবর এবং কাহ্নের তিনটি চর্যায়। প্রথম দুটি থেকে আমরা জানি, শবরদের বাসভূমি ছিলো উঁচু উঁচু পাহাড়ে। তাদের বাড়ীর আশপাশে কার্পাস এবং কঙ্গুচিনা ধানের চাষ করা হত।

সন্দেহ নেই, শবর গৃহস্থদের নিয়মিত আহার-বস্ত্র যুগিয়েছে তাদের নিজেদের ক্ষেতের পাকা ধান এবং কার্পাস তুলো। কিন্তু কৃষিই তাদের একমাত্র জাতিবৃত্তি ছিলো না। শবরদের মূল বৃত্তি শিকার। এবং শিকারের অস্ত্র ছিলো তীর-ধনুক। ভুসুকের দুটি চর্যায় শিকার-পদ্ধতিরও উল্লেখ রয়েছে। শিকারীরা প্রথমে শিকারভূমির চারদিক জাল দিয়ে ঘিরে নিতো, তারপর হরিণ-হরিণীকে হাঁক ছেড়ে তাড়া করে জালে এনে ফেলতো। হরিণের মাংস ছিলো তাদের প্রিয় খাদ্য এবং আপন মাংসের স্বাদুতাই ছিলো হরিণের শত্রু। ভুসুকের ভাষায়,—

…বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥…

—চতুর্দিকে বেষ্টিত হাঁক পড়ছে। আপন মাংসেই হরিণ নিজের বৈরী। ভুসুক শিকারী ক্ষণমাত্রও ছাড়ে না।

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত এই শ্রেণীর শিকারীর অস্তিত্ব বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কিছু দিন আগেও একেবারে বিরল ছিলো না। বর্তমান কালের এজাতীয় শিকারীদের লক্ষ্য অবশ্যি শুধুমাত্র হরিণ নয়, আরো অনেক বনবাসী প্রাণী। এরা প্রধানতঃ সমতলবাসী। চর্যায় হরিণ এবং পাহাড়ের উল্লেখ দেখে মনে হয়, সেকালের শিকারী বা শবররা হয়তো শুধু পাহাড়ী এলাকাতেই বাস করতো। তাদের বাসভূমির এই সীমাবদ্ধতার কারণ কি অর্থনৈতিক? দুঃখের বিষয়, সমসাময়িক কালের কোনো সূত্র থেকেই এ-প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

আরো একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের পেশার উল্লেখ চর্যাপদে আছে। এরা ডোম। শবরদের মতো এরাও ছিলো সাধারণ জনবসতির বাইরের মানুষ। কাহ্নের একটি চর্যার ইঙ্গিত থেকে আমরা দেখি, ডোমরা কুটীরশিল্পী,—

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।…
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা।…

—ডোমনী, নগরের বাইরে তোর কুঁড়ে ঘর।… ডোমনী বিক্রি করে তাঁত আর চাঙারি।

এই বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারি, এ-যুগের মতো চর্যাযুগের ডোমদের ঘরেও তাঁত এবং বাঁশের অন্যান্য জিনিষ তৈরী হত। এ-ধরনের শ্রম-শিল্পজাত জিনিষের বিকিকিনিতে সম্ভবতঃ মধ্যব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলো না। বিক্রয়কর্মে ডোমনীর অংশগ্রহণ প্রমাণ দেয়, ডোম বধূ বা কন্যারাও পরিবারের জীবিকার্জন প্রচেষ্টায় নিজেদের নির্লিপ্ত রাখেনি। হয়তো বা তাঁত এবং চাঙারি তৈরীতেও তাদের ভূমিকা ছিলো সক্রিয়।

কাহ্নের উপরি-উক্ত চর্যা এবং ডোম্বীর 'নৌবাহিকা ডোম্বী' চর্যায় নৌচালনের উল্লেখও রয়েছে। প্রথম চর্যাটিতে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নৌবিহাররতা ডোমনীর সাথে। দ্বিতীয় চর্যায় ডোমনীর আবির্ভাব মাঝিরূপে। এই চর্যাটিতে নৌযাত্রী যোগী তাকে উদ্দেশ করে বলছেন,—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ···
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা।···

—গঙ্গা-যমুনায় নৌকো বাওয়া হয়।··বাও, ডোমনী, তুমি (তাড়াতাড়ি) নৌকো বাও। পথে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ডোমনীকে এইভাবে নৌকোয় আবির্ভূত হতে দেখে কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন, নৌচালনও ছিলো ডোমদের একটি জাতিবৃত্তি। কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত দুর্বল। প্রথম চর্যাটিতে ডোমনী যাত্রিণী মাত্র। দ্বিতীয় চর্যাটির সাক্ষ্য দেখে অবশ্যি বলা যায়, কিছু সংখ্যক ডোম-ডোমনী হয়তো নৌচালনে অভ্যস্ত ছিলো। কিন্তু গঙ্গা-যমুনার মতো দুস্তর জলপথে নৌচালনে ডোমনী মাত্রেই কি রাজী হত? ডোমনীর নৌকো বাইবার কথাটি 'ডোম্বী' হয়তো শুধু রূপকার্থেই বলেছেন।

চণ্ডালদের তাঁত বিক্রয় ছিলো দেশে বয়নশিল্পের বিকাশ এবং প্রসারের ফল। গৃহস্থবাড়ীর আশপাশে বা ক্ষেতে যে কার্পাস উৎপন্ন হত, তা ধুনুরী-তন্তুবায় সম্প্রদায় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। সেকালের তন্তুবায়দের দক্ষতা শুধু বস্ত্র বয়নেই প্রকাশ পায়নি। তারা সম্ভবতঃ বস্ত্র বয়নের তাঁতে মাদুরও তৈরী করতো। তাঁতিরা যে নিজেদের তৈরী সুতোয়ও বস্ত্র বয়নে অভ্যস্ত ছিলো, এমন কথাও একটি চর্যায় আছে,—

···হাঁউ সে তাঁতি সুতা অপণা
অপনে সুতের লক্খন ন জানা॥···

—আমি তাঁতি, সুতো নিজের। আমার নিজের সুতোর লক্ষণ জানা নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদির প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্যে গৃহস্থবাড়ীতে নিজেদের ক্ষেতের তুলো থেকে সুতো তৈরী করা এবং পড়শী বা প্রজা তাঁতিকে দিয়ে মোটা কাপড় বুনিয়ে নেয়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নিকট অতীতেও ছিলো অতি সাধারণ ব্যাপার। যদিচ তখন দেশে মিলের কাপড়ের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেছে। শোনা যায়, ভালো সুতো কাটবার ক্ষমতা তখন বিবাহযোগ্যা কুমারীদের বিশেষ গুণ বলে গণ্য ছিলো।

বস্ত্র বয়ন, শিকার, বাঁশের জিনিষপত্র তৈরী আর কৃষি ছাড়াও আরো দুই-একটি শিল্প এবং ব্যবসায়ের কথা চর্যাকাররা উল্লেখ করেছেন। সেকালের বাংলায় নৌকোর ব্যবহার ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। অনেক ক্ষেত্রে তক্তা পেতে সাঁকো তৈরী করা হত। সুতরাং কাঠের ব্যবসায়ে যে তখন অনেক লোক নিয়োজিত ছিলো,—এমনকি, নৌকো তৈরী যে কারো কারো পেশায় দাঁড়িয়ে যায়, তা সহজেই অনুমেয়। কাঠ কাটবার জন্যে ছোটো-বড়ো কুড়ুল এবং সম্ভবতঃ করাতও ব্যবহৃত হয়েছে। একটি চর্যায় দেখা যায়, কাপালিকরা নট-ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতো। তেল তৈরীর জন্যে সেকালেও ঘানির ব্যবহার ছিলো।

পেশার বাইরের কয়েকটি জিনিষের উল্লেখও বিভিন্ন চর্যাপদে পাওয়া যাবে। কিন্তু তা অতি সামান্য। এবং পেশার মতো এই জিনিষগুলিকে সব সময় বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ জিনিষ হয়তো ব্যবহারকারীর জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ে সহায়ক। কিন্তু চর্যাপদে উল্লিখিত অনেক জিনিষই যে ছোটো-বড়ো সবার দ্বারা ব্যবহৃত হত, এমন কথা মেনে নেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

যে কোনো পরিবার, সম্প্রদায় বা জাতির আর্থিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির মান নির্ণয়ের অন্যতমো মাধ্যম তার খাদ্য এবং পানীয়। কিন্তু চর্যাপদাবলী তৎকালীন বাংলার খাদ্য-পানীয়াদির সম্পর্কে বিশেষ কোনো কথাই বলেনি। ভাত, দুধ, মাংস এবং মদ ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য-পানীয়ের উল্লেখই নেই। দুধ এবং মাংস যেসব পরিবারের নিয়মিত খাদ্য ছিলো, তাদের অবস্থা ছিলো

সচ্ছল, এমন কথা বললে হয়তো ভুল হবে না। ধনী গৃহস্থরা যে দুধের জন্যে বাড়ীতে গাই পুষতো, চর্যাপদে তার প্রমাণ আছে। শবরদের বাড়ীতে হয়তো মাংস ছিলো দৈনন্দিন আহারের বস্তু। কিন্তু তাদের জাতিগত পেশা শিকার। সুতরাং শবর পরিবারে মাংসের নিত্য ব্যবহার যে সমৃদ্ধির পরিচায়ক ছিলো না, তা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও মাংস ব্যাপকভাবে বা বিলাসভোজনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তথ্যের অভাবে এমন সিদ্ধান্ত করবারও উপায় নেই।

চর্যাযুগে অন্ততঃপক্ষে শবর-চণ্ডাল সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে মদের ব্যবহার ব্যাপক ছিলো, তার প্রমাণ মেলে একাধিক চর্যা থেকে। একটি চর্যায় দেখি, সেকালের কোনো কোনো বাড়ীতে ধেনো মদ তৈরী হত। অবশ্যি, শুঁড়িখানার পশারও ছিলো যথেষ্ট। একটি চর্যায় এক সমৃদ্ধ শুঁড়িখানার বিস্তারিত বর্ণনা আছে,—

এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥…
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥…

—এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢোকে এবং চিয়ান বাকড়ে (চিকন বাকলে?) মদ চোলাই করে। দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজের থেকেই দোকানে আসে। চৌষট্টিটি ঘড়ায় মদ সাজানো রয়েছে। গ্রাহক দোকানে এসে আর বেরুতে চায় না।

শুঁড়িখানার উপরি-উক্ত বর্ণনায় দশমী দুয়ারের উল্লেখ, আমার মনে হয়, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই চিহ্নের সাহায্যেই শুঁড়িখানাকে অন্যান্য দোকান থেকে শুঁড়িরা পৃথক করে দেখাতো। কিন্তু চিহ্ন দানের প্রয়োজন হত কি শুঁড়িখানা সর্বসাধারণের গম্য স্থান নয় বলে? এবং দশমী দুয়ার কি ছিলো দশম দরজা?

খাদ্য-পানীয়ের মতোই বাসনপত্রের প্রসঙ্গেও চর্যাকাররা স্বল্পবাক। তাঁরা উল্লেখ করেছেন মাত্র চারটি জিনিষের। ভাত রাঁধবার হাঁড়ি, দুধ দুইবার

পিটা, মদ বা পানি রাখবার ঘড়া এবং মদ খাওয়ার ঘড়ুলি (গাড়ু ?), যার নল ছিলো সরু। এসব জিনিষ যে কোনো বাড়ীতেই থাকতে পারে। এ-কারণে, ব্যবহার্য পাত্র হিসেবে এগুলি যথেষ্ট প্রাচীন, এছাড়া এদের সম্পর্কে আর কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

আর্থিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির মান নির্ণয়ের আর একটি বড়ো মাধ্যম পোশাক-পরিচ্ছদ। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে কোনো কথাই চর্যাপদে নেই। তবে, একাধিক চর্যায় কতকগুলি অলঙ্কার এবং বিলাসদ্রব্যের উল্লেখ আছে। সেকালের কুলবধূ, কুলকন্যা এবং যোগীরা গলায় মুক্তাহার, কানে কুণ্ডল, হাতে কঙ্কণ এবং পায়ে ঘণ্টা নেউর বা নূপুর ব্যবহার করতেন।[৩] অলঙ্কারের মূল্য ব্যবহৃত ধাতুর মূল্যের ওপর নির্ভরশীল এবং এই মূল্যই ব্যবহারকারীর আর্থিক অবস্থার মান নির্ণায়ক। এ-সম্পর্কিত তথ্য আমরা চর্যাপদে খুব বেশী পাইনে। তবু বলা যেতে পারে, চর্যাযুগে অলঙ্কার পরবার ক্ষমতা সবার ছিলো না। 'শবরপাদ'-এর একটি চর্যা সাক্ষ্য দেয়, শবরকন্যারা প্রসাধনের জন্যে ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জা ফুলের মালা ব্যবহার করতো। কর্পূর সহযোগে পান খাওয়া ছিলো সেযুগের অন্যতমো বিলাস। চর্যাপদে আয়নার কথাও আছে। এবং সেকালেও সর্ব শ্রেণীর মানুষ কেশ-চর্চায় উৎসাহী ছিলো।

ওপরে আলোচিত তথ্যাবলী ছাড়াও চর্যাপদে এমন কতকগুলি কথা আছে, যার থেকে সেকালের বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু আভাস পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ এবং যানবাহনের প্রসঙ্গ। সেযুগে 'রথ' অর্থাৎ স্থলযানের চেয়ে জলযানের ব্যবহার এবং কদর ছিলো বেশী। অবশ্যি, ভেলা এবং নৌকো ছাড়া আর কোনো জলযানের কথা চর্যাপদে নেই। নৌকোর বিভিন্ন অংশ এবং সরঞ্জামের উল্লেখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, সেযুগের নৌকোও ছিলো এযুগের নৌকোর মতো। কাহ্নের একটি চর্যা থেকে আমরা জানতে পাই, সেকালে আট কামরাবিশিষ্ট বজরা এবং বহু দাঁড়যুক্ত নৌকোও তৈরী হত। প্রয়োজনের সময় গুণ টানবার ব্যবস্থাও ছিলো।

---

[৩] কানে কুণ্ডল এবং হাতে কঙ্কণ ধারণকারী যোগীরা ছিলেন সম্ভবতঃ নাথপন্থী। দ্রষ্টব্য,– ডঃ কল্যাণী মল্লিক: 'নাথপন্থ', পৃঃ ১৯

অনেক সময় মেয়েরাও যে নৌকো বাইতো, একথা আগেই বলেছি। সংকীর্ণ জলপথ বা নালা সহজে পার হওয়ার জন্যে সেকালের বঙ্গবাসীরা তক্তা পেতে সাঁকো তৈরী করতো।

চর্যাযুগের বাংলায় রাজপথের কোনো কোনো জায়গায় এবং নৌঘাটায় শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিলো। নৌপথের পারানি এবং জলপথ আর স্থলপথে শুল্ক আদায়ের জন্যে ব্যবহৃত হত কড়ি। কিন্তু কড়িই সেযুগের একমাত্র মুদ্রা বা বিনিময়-মাধ্যম ছিলো কিনা, চর্যাপদাবলী থেকে তা জানবার কোনো উপায় নেই। চর্যাপদাবলীর রচনাকাল এখনো তর্কাতীত-রূপে নির্ণীত হয়নি।[৪] অনেকেরই অনুমান, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময়ে চর্যাকাররা পদগুলি রচনা করেন। এই যুগের প্রথম দিকে এবং মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ পাল-সেন রাজবংশের আমলে মুদ্রার ব্যবহার ছিলো। সেন যুগের তাম্রশাসনে তো অন্ততঃপক্ষে দুই ধরনের মুদ্রার কথা রয়েছে। কিন্তু সে-সময়ে সত্যিই কি মুদ্রার প্রচলন ছিলো? এ নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গবিজয়ের সময়কার ইতিহাস-লেখক মিনহাজের সাক্ষ্য অনুসারে তখন বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিলো। তবে, সেকালের সব মুদ্রার কথা এখনো সঠিক জানা যায়নি। চর্যাপদে কড়ি ভিন্ন অন্য কোনো মুদ্রার উল্লেখ নেই দেখে সে-সময়ের মুদ্রা ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোও তাই সম্ভব নয়।[৫]

নৌযানের প্রসঙ্গে দেখতে পাই, নৌপথে 'বলবান' জলদস্যুর উপদ্রব ছিলো। তৎকালীন নিম্নবঙ্গের অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রধান কারণ বহিরাগত জলদস্যুর আক্রমণ। দেশের অভ্যন্তরে যে দস্যু-তস্করের উপদ্রব বহু লোকের নিঃস্বতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ভুসুকু তার প্রমাণ দিয়েছেন। গুণ্ডরীর একটি চর্যায় তালাচাবির উল্লেখ আছে। এর থেকে মনে হয়, চর্যাযুগে সাধারণ ছিঁচকে চোরের উৎপাতও কম ছিলো না।

---

৪ ডঃ সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদাবলীর রচনাকাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী, প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম-একাদশ শতাব্দী এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে সপ্তম-একাদশ শতাব্দী।

৫ দ্রষ্টব্য,—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য : 'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস', পৃঃ ২৯

আগেই আভাস দিয়েছি, চর্যাযুগের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক কোনো বর্ণনা পাওয়া না গেলেও অনুমান করবার অবকাশ আছে, সে-সময়ে সমাজবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিলো প্রবল। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ্য। চর্যাপদে পরিবেশিত সমাজবিষয়ক তথ্যাবলী থেকে লক্ষণীয়, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যও সেযুগে কম ছিলো না।

চর্যাকাররা অন্ত্যজ সম্প্রদায়গুলি ছাড়া আর কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক তথ্য পরিবেশন করেননি। কিন্তু একাধিক চর্যায় ব্রাহ্মণের উল্লেখ রয়েছে। সেযুগের ব্রাহ্মণরা ছিলেন আচারনিষ্ঠ আর শুচিতাপ্রিয় এবং সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিলো অত্যন্ত অনুদার। এর থেকেই স্পষ্ট, সেকালের হিন্দু সমাজও বর্ণাশ্রম প্রথার দ্বারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত।

একাধিক চর্যায় বলা হয়েছে, অন্ত্যজ সম্প্রদায়গুলি বাস করতো সাধারণ জনবসতির বাইরে। ডোমদের সম্পর্কে কাহ্নের একটি উক্তি এখানে পুনরায় স্মরণীয়,—'নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।' 'কাবালী' বা কাপালিক সম্প্রদায়ের স্থান হত অন্ত্যজদের পাশে এবং 'কুলীনজন' বাস করতেন অন্ত্যজ এলাকার বিপরীত দিকে, কাপালিক এলাকার পরে, সর্ববিধ অশুচি স্পর্শ থেকে দূরে। অন্ত্যজ সম্প্রদায় যে প্রায় সবার কাছেই একান্ত অস্পৃশ্য ছিলো, কাহ্নের একটি চর্যায় তারও আভাস আছে। প্রতিবেশীহীনা নিন্দিতা ডোমনী আদর পেয়েছে কেবল বিদ্বজ্জনের কাছে। এবং সে-আদর ছিলো গভীর। কাহ্ন লিখেছেন,—

> ···অন্তে কুলীণজণ মাঝেঁ কাবালী ॥
> তঁই-লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ···
> কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই
> বিদুজণ-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ ॥···

—অন্তে রয়েছেন কুলীনজন, মাঝখানে কাপালিক। ডোমনী, তুই সবই অশুচি করলি। কেউ কেউ তোকে মন্দ বলে। কিন্তু বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না।

অন্য একটি চর্যায় কাহ্ন বলেছেন, ডোমনীকে বিয়ে করে তাঁর জন্ম সফল হল।

সাধারণ জনবসতিতে সম্প্রদায়বিন্যাস কাহ্নের বর্ণনা মাফিক থাকলেও কখনো কখনো অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চ বর্ণের মানুষের ঘৃণা বা অসদ্ব্যবহার যে চরমে ওঠে, এমন কথা ভাববারও কারণ আছে। আগেই বলেছি, 'ঢেণ্ঢণ-পা'-র একটি চর্যায় কোনো অন্ত্যজা স্বগতোক্তি করেছে, আমার ঘর টোলায়, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। এই অন্ত্যজার ঘরে অরন্ধন ছিলো নিত্যকার ঘটনা। এবং তার কাছে নিত্যই প্রেমিকের দল আনগোনা করতো। দরিদ্র রমণীর দেহবিক্রয় বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু সমাজ যখন তার দারিদ্র্য দূর না করে দেহবিক্রয়ের জন্যে তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে, তখন ব্যাপারটি সত্যিই বিচিত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু চর্যায় উল্লিখিত অন্ত্যজাটির টোলা-বাসের কারণ ছিলো কি সমাজের এই মনোভাব? যে-দেহবিক্রয় সমাজের এমন মনোভাবের হেতু, তার মূল তো দারিদ্র্য। এবং দারিদ্র্যের কারণ যা-ই হোক, শুধুমাত্র দারিদ্র্য নিশ্চয়ই কাউকে প্রতিবেশীহীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য করে না। 'ঢেণ্ঢণ-পা'-র চর্যাটির যে কোনো পাঠকই ভাবতে পারেন, উক্ত অন্ত্যজার নির্জন বাসের কারণ আসলে দারিদ্র্য নয়, সমাজের এক নিষ্ঠুর ঘৃণা।

বিভিন্ন চর্যাকারের উক্তি এবং ওপরের আলোচনা থেকে সেকালের জনবসতির গঠন বা প্যাটার্ণের যে পরিচয় আমরা পাই, তার ভিত্তিতে একটি কথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। একালের জনবসতির গঠনের থেকে সেকালের জনবসতির গঠন বস্তুতঃ আলাদা ধরনের ছিলো না। আমাদের কালের মতোই সেকালেও মানুষ যৌথভাবে বাস করেছে। এই-ই ছিলো সেকালের সাধারণ সামাজিক ব্যবস্থা এবং এ-ব্যবস্থায় তখনও পরিবারই ছিলো সমাজের প্রাথমিক ভিত্তি। তবে, গঠনের দিক থেকে সেকাল এবং একালের পরিবারকে অভিন্নরূপ বলা বোধ হয় সম্ভব নয়। যদিচ পরিবার বলতে সেকালেও সাধারণতঃ যৌথ পরিবারই বোঝাতো। একাধিক চর্যায় দেখা যায়, তখনও শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলো পরিবারের শীর্ষে এবং কুলবধূরা দিনপাত করেছে তাদেরই শাসনে আর ছায়ায়। কাহ্নের একটি চর্যা থেকে আমরা আরো জানতে পাই, শাশুড়ীর সাথে ননদ এবং শ্যালিকারাও একই বাড়ীতে থাকতো। শাশুড়ী-ননদের সাথে শ্যালিকাদেরও একই পরিবারে থাকবার অর্থ কি, বলা সহজ নয়। সেকালের সমাজে নিম্ন

শ্রেণীর মানুষের যৌথ পরিবার কি ছিলো বিশেষ ধরনের পুঞ্জ পরিবার, যেখানে ঘরজামাই প্রথার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ দুই পরিবার একই বাড়ীতে বাস করতো, নাকি, শ্যালিকারা ভগ্নীপতির বাড়ী চলে আসতো?

সেকালের বিশেষ কোনো রীতি-আচারের উল্লেখ চর্যাকাররা করেননি। প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কেবল বিয়ের এবং সে-বিয়েও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের। চর্যাকার কাহ্ন বিয়ের একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রূপকার্থের বাইরে সে-বর্ণনার সার কথা, ডোম সম্প্রদায়ের বিয়েতে ঢোল, কাঁসি এবং দুন্দুভি বাজানো হত, বিয়ের পর বর শ্বশুরবাড়ীতে মহিলাদের ভীড়ের মধ্যে নববধূকে নিয়ে বাসররাত্রি উদ্‌যাপন করতো এবং বাসর-জাগানিয়ারা সরে যাওয়ার পর শুরু হত বধূর প্রতি তার উন্মত্ত প্রেম নিবেদন।

এই বর্ণনায় যদিচ শুধু ডোম সম্প্রদায়ের কথা বর্ণিত, বর্তমান কালের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষণীয়, বাংলাদেশের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সমাজের বিবাহোৎসবের ধরনও এমনি এবং বহু কাল তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বস্তুতঃ, ডোম সম্প্রদায়ের উৎসব-রীতি মোটামুটি হিসেবে সমস্ত আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিলো এবং আজও আছে।

বিয়ের পদ্ধতির উল্লেখ অবশ্য কাহ্নের বর্ণনায় নেই। তবে, ডোম সমাজে তখনও যে এখনকার মতো বিধবা বিয়ে বৈধ ছিলো, কাহ্নেরই অন্য দুটি চর্যায় তার প্রমাণ আছে। একটি চর্যায় তিনি বলেছেন, 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ-সাঙ্গে', কাহ্ন মহাসুখে সাঙ্গা করতে চললেন। এই উক্তি থেকে মনে হয়, বিধবা-বিয়েও সাধারণ বিয়ের মতোই জনপ্রিয় এবং আনন্দদায়ক ছিলো। চর্যাপদাবলী আরো সাক্ষ্য দেয়, যে কোনো বিয়েতেই অনেক যৌতুক পাওয়া যেতো। এর অর্থ, বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা যথেষ্ট প্রাচীন। এবং হয়তো চর্যাযুগের আগেও এদেশে এই প্রথা ছিলো।

কাহ্নের দুটি চর্যায় বলা হয়েছে, ধর্মসাধনে বিদুজন' অর্থাৎ বিদ্বজ্জন জ্ঞান অর্জনের জন্যে নিন্দিত পথ অবলম্বন এবং পথের বাধা দূর করবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু গ্রন্থাদির সাথে তাঁদের জ্ঞানের সব সময় সম্পর্ক থাকতো

কিনা, সে-বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত তাঁর চর্যা দুটিতে নেই। তবে, তাঁর উক্তির ভঙ্গি দেখে মনে হয়, বিদ্বজ্জনরা তখনও সমাজে উচ্চ আসনই পেয়েছেন। অধ্যয়নাদি সারস্বত কর্মে অন্ততঃপক্ষে কিছু সংখ্যক ধর্মসাধক যে অভ্যস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ কাহ্নের অন্য একটি চর্যায় আছে। এই শ্রেণীর সাধকরা আগম পুঁথি পড়তেন, ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করতেন এবং নিয়মিতভাবে মালা জপতেন। কাহ্ন কিন্তু শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান বা পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে কৃত ধর্মসাধনাকে ভালো চোখে দেখেননি। চর্যাটিতে জপ-অধ্যয়নসর্বস্ব সাধকের প্রতি তাঁর কটাক্ষ লক্ষণীয়,—

জো মণ-গোঅর আলা-জালা
আগম পোথী ঠঠা-মালা ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায়
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায় ॥…

—যে মনোগোচর, তারই জন্যে আড়ম্বর, আগম-পুঁথি, ঘণ্টা আর জপমালা। কায়মনোবাক্যে প্রবেশ যাতে সম্ভব নয়, তাকে কেমন করে সহজ বলা যায়!

লুইয়ের একটি চর্যায়ও এই ধরনের কটাক্ষ আছে।

কেবল সারস্বত কর্মই নয়, সেকালের সংস্কৃতির অন্য দুই-একটি বিষয়ের আভাসও একাধিক চর্যায় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি চর্যার ওপরে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। যার অর্থ, প্রয়োজনকালে চর্যাগুলি গীতও হত। কুক্কুরীপাদ তো একটি চর্যায় সোজাসুজিই বলেছেন, 'অইসনি চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ',— কুক্কুরীপাদ এমনি একটি চর্যা গাইলেন। অবশ্য, রাগ-নির্দেশ সব চর্যায়ই রচনাকালে দেওয়া কি না, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

চর্যায় সুর দানের জন্য পুঁথি এবং বৃত্তিতে মোট আঠারোটি রাগ-রাগিণীর নাম দেওয়া রয়েছে। এই রাগ-রাগিণীগুলি হল অরু, ইন্দ্রতাল, কহ্নগুঞ্জরী, কামোদ, গাউড়া, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ধানসী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, ভৈরবী, মল্লারী, মালবী, গউড়া, রামক্রী এবং শবরী। এগুলির মধ্যে অরু, ইন্দ্রতাল এবং কহ্নগুঞ্জরী রাগের কথা বর্তমান কালের সঙ্গীত-শাস্ত্রে নেই। গউড়া বা গোরা নামও এখন অপ্রচলিত। মালসী গউড়ার

আধুনিক নাম মালসী গৌরা। শবরী কি একালের সাবেরী? বরাল বেলাওল ঠাটের পটমঞ্জরী। মল্লারী বর্তমানে অপ্রচলিত এবং রামক্রী, দেবক্রী ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর নাম ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। দেশাখ সম্ভবতঃ 'সঙ্গীত-পারিজাত'-এর দেশাখ্য বা দেবশাখ। এই রাগে তীব্রতমো রেখাব (অর্থাৎ বর্তমান কালের কোমল গান্ধার) এবং তীব্র গান্ধার ব্যবহৃত হত। রাগটির এমন রূপের এখন প্রচলন নেই।[৬]

যন্ত্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গে দুই-একটি চর্যায় একতারা এবং বাঁশীর উল্লেখ আছে। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি, বাংলা দেশের এই যন্ত্র দুটি অতি প্রাচীন। অন্যান্য প্রাচীন যন্ত্রের মধ্যে ছোটো-বড়ো ডুগডুগি, দুন্দুভি, মাদল, কাঁসি, ঢোল এবং পটহ বা ঘটকের উল্লেখ বিভিন্ন চর্যাপদে পাওয়া যায়। শোষোক্ত যন্ত্রগুলি সেকালে সাধারণতঃ উৎসব উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাদকরা নিজেদের অবসর বিনোদন বা অন্যের মনোরঞ্জনের জন্যেও বাঁশী এবং একতারা বাজাতেন।

চর্যাযুগে সাধারণ মানব-সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই নৃত্যচর্চা করতো। কাহ্নের একটি চর্যা থেকে আমরা জানতে পাই, যৌথ বা দ্বৈত নাচও সেকালে অজ্ঞাত ছিলো না। চর্যাকার বীণা তাঁর একটি চর্যায় লিখেছেন, 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী,'—বজ্রধর (অর্থাৎ ভগবান হেরুক) নাচেন এবং দেবী (অর্থাৎ ভগবতী ডোমনী) গান করেন। এই উক্তিটি সাক্ষ্য দেয়, নাচ এবং গান এক সঙ্গেও অনুষ্ঠিত হত।

সেকালের সমাজে নাটকও অজ্ঞাত ছিলো না। এর প্রমাণও বীণার উপরি-উক্ত চর্যা থেকেই পাওয়া যাবে। তিনি বজ্রধরের নাচ এবং দেবীর গানের কথা বলবার পরই লিখেছেন, 'বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই',—বুদ্ধ-নাটক এমনি গুরুত্বপূর্ণ হয়। নাচ-গানের কথায় জের টেনে বলা এই কথাটি থেকে আমরা আরো অনুমান করি, নাচ-গান সেকালে অন্ততঃপক্ষে কিছু সংখ্যক নাটকের অঙ্গীভূত ছিলো।

---

৬ দ্রষ্টব্য,—রাজা নওয়াব আলী খান: 'মারিফুন্নাগমাত' (মকবুদুর রহমান হিলালী কর্তৃক অনূদিত), পৃঃ ২৭৫ এবং রবীন্দ্রনাথ রায়, 'রাগ-নির্ণয়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০৫

নাচ-গান এবং শাস্ত্রপাঠ ছাড়া সেকালের বাংলার আর মাত্র একটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের উল্লেখ চর্যাপদাবলীতে পাওয়া যায়। সে-যুগের বাংলাদেশেও এখনকার মতোই দাবা খেলার প্রচলন ছিলো। চর্যাপদে এই খেলাকে বলা হয়েছে 'নয়বল'। এবং রাজার তৎকালীন প্রতিশব্দ 'ঠাকুর'। শব্দটি তুর্কী ভাষার। ডঃ সুকুমার সেন এই শব্দটি দেখে মন্তব্য করেছেন, 'হয়ত চর্যায় বর্ণিত খেলার পদ্ধতিটি বিদেশ হইতেই আসিয়াছিল।' এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় প্রচলিত হওয়ার মূলে থাকে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ। নয়বল খেলার চর্যা-বর্ণিত পদ্ধতি কি ভাবে এদেশে এসেছিলো, আজ আর তা বলা সম্ভব নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে বিদেশীর আগমন শুরু হয় ইতিহাসের আদি যুগে। এবং এখানে মুসলিম শাসনের সূত্র-পাত ঘটে ৭১১ খৃষ্টাব্দে। এর দুই শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানদের প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। নয়বল খেলার পদ্ধতিটি সেই সময়েই এদেশে এসেছিলো কি না, কে জানে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শুধু তুর্কী ভাষার শব্দ নয়, স্থানীয় ভাষার শব্দও চর্যায় ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। চর্যাযুগের অন্যতমো শক্তি-শালী ভাষা ছিলো অবহট্‌ঠ। পণ্ডিতদের মতে, সেকালের বাংলা ভাষার ওপর এই ভাষাটির প্রভাবই পড়েছে সবচেয়ে বেশী। চর্যাপদাবলীর বাংলার লিঙ্গরীতি এবং ছন্দ-প্রকরণ সম্পূর্ণতঃই অবহট্‌ঠের দান। যে কোনো ভাষাই অন্য ভাষার দ্বারা নানা কারণে প্রভাবিত হতে পারে। বাংলা ভাষা তো তখন সবে যাত্রা শুরু করেছে। এজন্যে, সে-যুগে তার ওপর অন্য ভাষার গভীর প্রভাব পড়বার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

গবেষকদের ধারণা, বর্তমান কালে বাংলা বলে পরিচিত ভাষাটির জন্ম সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময়ে। জন্মগ্রহণের পর দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে এ-ভাষা মুসলিম নবাবদের আমলে আজকের বাঙালী সমাজের বোধগম্য রূপ লাভ করে। এই রূপ গ্রহণের আগে তার কথ্য রূপ কেমন ছিলো, তা বলা অত্যন্ত কঠিন। অবহট্‌ঠ চর্যাযুগের সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু এ-ভাষার দ্বারা

প্রভাবিত বাংলা ভাষাও যে সাধারণ মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হত এবং সেই সাধারণ মানুষের সংখ্যাও যে নেহাৎ কম ছিলো না, বাংলায় চর্যাকারদের দ্বারা পদাবলী রচনা এবং সেগুলির পাঠক-শ্রোতার কথা ভেবে দেখলে তা সহজেই বোঝা যাবে।

চর্যাকারদের ধর্মমতের আলোচনার স্থান এখানে নেই। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন কোনো কোনো মনীষী সমস্ত চর্যার ধর্মমতকেই এক রকম বলে ধরে নিয়েছেন। তবে, তাঁদের মত সকলের দ্বারা তর্কাতীত-রূপে গৃহীত হয়নি। তাঁদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য, 'অভ্যন্তর বিচারে সবগুলিই যে বৌদ্ধ--তান্ত্রিক সহজপন্থী মন্ত্রপন্থী, বজ্রপন্থী যাই বলি না কেন কোন একটিমাত্র সাধক গোষ্ঠীর রচনা তাহা বলা যায় না।'[৭] এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, তর্ক তোলা সত্ত্বেও প্রথম দলের মতো দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতরাও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, চর্যাপদাবলীর ধর্মমতকে সহজযান বলাই বাঞ্ছনীয়। এবং সহজযান বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্মেরই একটি শাখা।

একাধিক মতবাদের সমষ্টিগত অভিধা সহজযানের ব্যাখ্যা যে সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়, তা ওপরের তর্কাভাস থেকেই অনুমেয়। আমরা কেবল বলতে পারি, সব মতবাদেরই একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিলো। যার নাম দেওয়া যায় সাধারণ অবস্থা প্রাপ্তি। 'সহজ এমন একটি অবস্থা যা পেলে সাধকের মায়িক জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। তখন আর আত্মপর ভেদ থাকে না, সংস্কার বিনষ্ট হয়, ভবমোহ বিলুপ্ত হয় এবং শূন্যতাজ্ঞান লাভ হয়। সে অবস্থা যে সুখে পর্যবসিত হয় তা হচ্ছে সহজ সুখ।...সে অবস্থা না লাভ করতে পারলে সাধকের মুক্তিলাভ হয় না।'[৮]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সহজপন্থীরা সাধারণতঃ অনুষ্ঠানিকতার ওপর জোর দেন না। তাঁদের কেউ কেউ ধর্মসাধনে তান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। এঁরাও যদি ধর্মমতের দিক থেকে বৌদ্ধ হন, তাহলে

---

৭ সুকুমার সেন: 'চর্যাগীতি-পদাবলী', পৃঃ ২৯

৮ প্রবোধচন্দ্র বাগচী: 'বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য', পৃঃ ৫০—৫১

প্রশ্ন উঠবে,—যে বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্বতার বিরোধী, তা কি করে তান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে? তান্ত্রিকতা কি বৈদিক ধর্মের প্রভাবের ফল? বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তান্ত্রিকতা আসলে বৌদ্ধ ধর্ম থেকেই হিন্দু ধর্মে গৃহীত হয় এবং এই ধর্মে তথা বাংলা-দেশে তান্ত্রিকতার আবির্ভাব ঘটে সম্ভবতঃ চর্যাযুগে বা তার কিছু আগে।

কিন্তু তান্ত্রিকতা যেখান থেকেই আসুক না কেন, চর্যাকারদের হাতে তা এক রহস্যময় রূপ লাভ করে। বস্তুতঃ, সমগ্র চর্যাকাব্যের বক্তব্যই এক দুর্বোধ্য রহস্যে আবৃত। চর্যার ভাষা সহজ সরল। হয়তো বা সে-যুগে এটা ছিলো প্রাকৃতজনের ভাষা। চর্যায় চিত্রিত জীবনও সাধারণ। এমনকি, চর্যাপদাবলীতে আমরা প্রধানতঃ যে সমস্ত মানুষ বা সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাই, তাদেরও কেউই অসাধারণ নয়। অথচ সবই অসাধারণ। চর্যাকাররা সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষদের নিয়ে যা কিছু বলেছেন, তার সবটুকুই ইঙ্গিত বা রূপক। সেই রূপকের আড়ালে যে বক্তব্য লুকিয়ে আছে, একালের মানুষের কাছে তো তা সম্পূর্ণতঃই অবোধ্য এবং সেকালেও তা খুব কম মানুষের পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব ছিলো। চর্যাপদাবলীর এক বিশিষ্ট কবি কুক্কুরীপাদও একটি পদে স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন, তাঁর দ্বারা গীত চর্যা 'কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইউ' অর্থাৎ কোটিতে একটি মাত্র হৃদয়ে গিয়ে পৌঁচেছে। আর, ঢেণ্টন-পা বলেন তাঁর 'গীত বিরলে বুঝই' অর্থা কম লোকেই বোঝে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, চর্যাকারদের বক্তব্যকে এমন দুর্বোধ্য করে রাখবার কারণ কি? এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দুর্বোধ্যতার কারণ হিসেবে অন্ততঃপক্ষে দুটি জিনিষের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি পুরোহিততন্ত্রের প্রাবল্য তথা পেশাগত তত্ত্ব আর তথ্য পরিবেশনে একচেটিয়া অধিকার রাখবার কঠোর প্রয়াস। অন্যবিধ সম্ভাব্য কারণ প্রতিপক্ষ হিসেবে অতি প্রবল এবং শত্রুভাবাপন্ন সমাজ বা রাজশক্তির ভয়ে যথাসম্ভব গোপনে এবং রূপকের মোড়কে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা।

চর্যাপদাবলীর ধর্মতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। চর্যাযুগের বাংলাদেশে হিন্দু বা বৌদ্ধ যে ধর্মেরই প্রাধান্য

থাক, না কেন,কোনো কোনো ধর্মসাধক যে আগম-বেদ পাঠ, জপ-তপ এবং ঘণ্টা-বাদ্য সহকারে পূজো-অর্চনা করবার পক্ষপাতী ছিলেন, অন্ততঃপক্ষে দুটি চর্যায় তার প্রমাণ আছে।এই ধর্মসাধকরা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ পূজারী। কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে দেবমূর্তিও রাখা হত। এর প্রমাণ পাই ধার্মের একটি চর্যা থেকে। তিনি লিখেছেন,—

…দাটই হরি-হর-বাহ্ম ভড়ারা।
দাটা হই নবগুণ শাসন-পড়া॥…

—হরি, হর এবং ব্রহ্মা ঠাকুর পুড়ে যান আর তাঁদের সাথে পুড়ে যায় পৈতা আর ভূমিদান-পাট্টা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব বৌদ্ধদের ঘরে ব্রহ্মাদি দেবতার মূর্তি থাকা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। মনে হয়, ধাম যে অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন, তা কোনো হিন্দুবাড়ীর। এবং সে-বাড়ীর কর্তা ছিলেন সম্ভবতঃ সঙ্গতিপন্ন। বিত্তহীন মানুষের বাড়ীতে দেবমূর্তি রাখা সহজ নয়। কারণ, দেবমূর্তি রাখলে তার পূজো আর সেবার ব্যবস্থাও রাখতে হয় এবং সে-ব্যবস্থা একেবারে নিখরচায় সারা চলে না। অন্য দিকে, ভূমিদান-পাট্টা যার বাড়ীতে থাকে, তাকে আর যা-ই বলি, না কেন, নিঃসম্বল কিছুতেই বলতে পারিনে। বিশেষতঃ যখন দেখি, তার বাড়ীতে একাধিক দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

কোনো কোনো গৃহস্থের ঘরে যে পট থাকতো, তার ইঙ্গিতও একটি চর্যা থেকে পাওয়া যায়।

'শবর'-এর একটি চর্যায় শবরদের মৃতদেহ-সংকারের বর্ণনা আছে। চর্যাটিতে ক্রিয়াকর্মের খুব বেশী উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়, সংকার-পদ্ধতিটি হিন্দু সমাজের মৃতদেহ-সংকার পদ্ধতির অনুরূপ এবং আজও এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। 'শবর'-এর চর্যাটির সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি,—

‥চারিবাসে গড়িল রে দিআঁ চঞ্চালী
তোঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী
মারিল ভবমত্তা রে দহ-দিহে দিধলি বলী
হেরি সে সবয়ো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী॥

—চারটি বাঁশ আর চাঁচাড়ি দিয়ে তৈরী খাটিয়ায় উঠিয়ে নিয়ে শবরকে দাহ করা হল। তাই দেখে শকুন আর শৃগাল কাঁদছে। ভবমত্ত শবরের মৃত্যুর পর দশ দিকে পিণ্ড দেওয়া হল। এই দেখো শবর নির্মূল হয়ে গেছে, তার শবরগিরিও ছুটে গেছে।

উপরি-উক্ত ধর্মীয় এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ থেকে লক্ষণীয়, চর্যাকাররা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের বাদ দিয়ে শবর-চণ্ডালের মতো নিম্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মমত যা-ই হোক, ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই কেবল নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। সুতরাং তাঁরা তো যে কোনো শ্রেণীর মানুষকেই তাঁদের শিষ্য বা উপদেশের লক্ষ্য করে নিতে পারতেন। তাঁদের সবাই যে নিম্ন বর্ণের বা শ্রেণীর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, তারও কোনো প্রমাণ নেই। তাহলে চর্যাপদাবলীতে নিম্ন বর্ণের লোকের প্রাধান্য লাভের কারণ কি ?

আমার মনে হয়, এ-প্রশ্নের দুটি আনুমানিক উত্তর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, সবাই জানেন, হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র পাঠ এবং আচার-অনুষ্ঠানের অধিকার তথা ধর্মের মূল তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানবার দাবী নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের জন্যে স্বীকৃত নয়। নিম্ন বর্ণের মানুষের প্রতি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে একটি প্রতিবাদী চেতনার জন্ম দেয়। বুদ্ধ বর্ণাশ্রমের বিরোধিতা করে তাঁর ধর্মের সকল বিষয়কে সর্বসাধারণের উপযোগী রূপ দানের প্রয়াস পান। এ-ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যি প্রথম উদ্যোক্তা নন। তাঁর আগেও কয়েকজন ধর্মপ্রচারক ব্রাহ্মণাদি বর্ণের একনায়কত্বের বিরোধিতা করেন।* কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি এই শ্রেণীর অন্যান্য ধর্মের শক্তির তুলনায় ছিলো অনেক বেশী। এর ফলে, অত্যাচারিত নিম্ন বর্ণের মানুষ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যতোটা আকৃষ্ট হয়, অন্য ধর্মের প্রতি ততোটা হয়নি। চর্যাকারদের সহজ ধর্মসাধন-পদ্ধতিও হয়তো একই ধরনের সাফল্য লাভ করেছিলো।

---

* 'টুয়েন্টি-ফাইভ হানড্রেড ইয়ার্স অব বুদ্ধিজম' গ্রন্থে সংকলিত এম, আয়াস্বামী শাস্ত্রীর প্রবন্ধ 'এ্যাপ্রোচ টু হিন্দুইজম' দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৩৪৫)।

চর্যাপদাবলীতে নিম্ন বর্ণের মানুষের প্রাধান্য অন্য একটি কারণেও ঘটে থাকতে পারে। চর্যাকারদের সবাই হয়তো ছিলেন বৌদ্ধদের ধর্মগুরু বা পুরোহিত এবং সেকালের বৌদ্ধ সমাজে হয়তো ডোমদের মতো নিম্ন বর্ণের মানুষের সংখ্যাই ছিলো বেশী। বাংলার পাল রাজবংশের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই, সেযুগে ডোমরা যথেষ্ট শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছে।[১০] এমনকি, এক সময় বাংলার উত্তর অঞ্চলে নাকি তাদেরই জ্ঞাতিরা রাজত্ব করতো। (শোনা যায়, কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোচরাও ডোমদেরই মতো একটি জাতি ছিলো।) ডোমরা ঠিক কখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়, তা অবশ্যি আমরা জানিনে। কিন্তু একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ডোম সমাজ একদা বৌদ্ধ ধর্মের অকপট অনুসারী ছিলো। বাংলায় সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক দিকে বিজিত জাতি রূপে, অন্য দিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হিসেবে ডোমরা আগেকার সামাজিক সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলে। তাদের দুর্দশার অবশ্যি এইখানেই শেষ নয়। পরাজিত, ক্ষমতাহীন ডোম জাতি ক্রমশঃ নির্বিত্ত এবং ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে। হয়তো ব্রাহ্মণ্যবাদের এমনি দাপটের যুগেই বৌদ্ধ ধর্মের চর্চায় এবং অনুসরণে গোপনতা আর দুর্বোধ্যতার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিহাসপাঠকরা অবশ্যি জানেন, গোপনতা আর দুর্বোধ্যতার আশ্রয় নিয়েও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা একে একে তিব্বত বা নেপালের দিকে পালিয়ে গেছেন, আর, ডোমদের মতো নিঃসহায় সাধারণ মানুষেরা শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে এবং হিন্দু সমাজের নীচু স্তরে মিশে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে।

আগেই বলেছি, চর্যাকাররা অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তেমন মুখর নন। রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গে তাঁদের অমুখরতা তো নীরবতারই নামান্তর। দুই-তিনটি বিষয়ের আভাস ছাড়া চর্যাপদাবলী থেকে সেকালের রাষ্ট্রনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যবহারাদি সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

---

[১০] লৌকিক ছড়া 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে'-তে যে ডোমদের কথা আছে, পণ্ডিতদের মতে তারা ছিলো ডোম-সেনা।

'ঢেণ্ঢন-পা'-র একটি চর্যায় আছে, 'জো সো চৌর সোই দুষাধী,'—যে চোর, সে-ই কোতোয়াল। এই উক্তি থেকে মনে হয়, চর্যাযুগে দারোগা বা কোতোয়াল (কোটাল) শ্রেণীর কিছু রাজকর্মচারী ছিলো। তারা শুধু চৌর্যবৃত্তির উৎসাদনেই ব্যস্ত থাকতো, না, সাধারণভাবে সর্ববিধ অন্যায়, অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলা দমনের মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখবার চেষ্টাও করতো, কে জানে! বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দোসাদ নামের কিছু অধিবাসী এখনো আছে। এরা সেকালের দুষাধীদের উত্তরপুরুষ কিনা, তা-ই বা কে বলবে? 'দোসাদ' শব্দটি 'দুষাধী'-র অপভ্রংশ হওয়াও বিচিত্র নয়। দোসাদরা নিজেদের পাসবান বা শাস্ত্রী বলে বংশগত পরিচয় দেয়। প্রসঙ্গতঃ আরো স্মরণীয়, ভারতীয় উপ-মহাদেশের অনেক বংশগত পদবীই আসলে পূর্ব যুগের রাজদত্ত পদবী বা রাজকর্মচারীদের শ্রেণীবাচক কিংবা পদমর্যাদাসূচক নাম।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনায় দেখা গেছে, সেকালে পথে ঘাটে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিলো। একাজ কোন্ শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা করতেন, কেবল গবেষকরাই বলতে পারেন। কাহ্নের একটি চর্যায় 'উআরি বলে একটি শব্দ আছে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে শব্দটি 'উপকারিকা'-র অপভ্রংশ এবং এর চর্যাকালীন অর্থ কাছারি বা সদরমহল। আমার অনুমান, কাছারির দায়িত্ব ছিলো রাজনির্দেশ কার্যে পরিণতকরণের মাধ্যমে পরোপকার সাধন। ঢাকার উয়ারি এলাকাটি কি সেকালের 'উআরি'-র স্মৃতিবাহক?

চর্যাযুগে বঙ্গ দেশ বলতে যে বর্তমান কালের বাংলাদেশ বোঝাতো না, তার আভাস একাধিক চর্যাপদে আছে। চর্যাকারদের ইঙ্গিত অনুসারে, তাঁদের যুগের বঙ্গ দেশ ছিলো নিম্ন বঙ্গ। অন্য দিকে, ইতিহাসকারদের মতে, 'প্রাচীন বাংলায়…বঙ্গ নামেও একটি জাতি বাস করিত। বঙ্গদের অধ্যুষিত দেশ বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। মোটামুটিভাবে এই জনপদের সীমা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, উত্তরে পদ্মা নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র। এক-কথায় বলিতে গেলে বাংলার দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলের কিছুটা লইয়া এই জনপদটি গঠিত ছিল'[১১]

এইখানে একটি প্রশ্ন। 'বাঙ্গালী' শব্দটি বৈদিক। এই 'বাঙ্গালী' বলতে যদি বাঙ্গাল নামধেয় কোনো দেশের অধিবাসীদের বোঝায়, তাহলে স্বীকার

করতে হবে. বৈদিক যুগেও দেশটির অস্তিত্ব ছিলো। বাংলার কতকগুলি শিলালিপিতে বঙ্গ এবং বাঙ্গাল উভয় দেশেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ইতিহাসকার আবুল ফজলের মতে, প্রাচীন বাংলার রাজারা আপন আপন এলাকায় উঁচু উঁচু আল তৈরী করাতেন এবং এই সব আল এতো বেশী পরিচিত ছিলো যে, 'বঙ্গ' শব্দটির সাথে 'আল' জুড়ে দিয়ে তাদের দেশের নাম বঙ্গাল বা বাঙ্গাল রাখা হয়। আবুল ফজল-বর্ণিত বঙ্গাল দেশের অস্তিত্ব কি বৈদিক যুগ থেকেই জ্ঞাত ?

এ-প্রশ্নের উত্তর যা-ই হোক এবং চর্যাকাররা বঙ্গ-দেশ বলতে যা-ই বুঝে থাকুন, না কেন তাঁরা যেসব তথ্য দেন, তা শুধু নিম্নবঙ্গবহির্ভূত বাংলার নয়। চর্যাপদাবলী নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরাও সম্ভবতঃ এ-কারণেই প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে এদেশের বিশেষ কোনো অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত বলে ভাবতে রাজী নন। আমার মনে হয়, সাধারণ পাঠকজনের জন্যেও এই মহাজন পন্থার অনুসরণই শ্রেয়।

[১৯৬১]

---

১১ অমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচয়, পৃঃ ৫

বাংলার বারোমাসী

বারোমাসী বা বারোমাস্যা ভারতীয় উপমহাদেশের লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। অভিজাত সাহিত্যেও এর প্রচলন নেহাৎ কম নয়। আঙ্গিক এবং বাচন ভঙ্গিতে অনন্য, বারোমাসী বিভিন্ন সময়ে কাব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থায় আর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ বা খণ্ড কবিতার আকারে যেমন এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়, তেমনি দীর্ঘ কাহিনীকাব্যের অংশ হিসেবেও এর ব্যবহার অতি বহুল। কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে যেমনি হোক, বারোমাসী জনসমাজে প্রচার লাভ করেছে প্রধানতঃ সুরের মাধ্যমে। সব মিলিয়ে বারোমাসী যে ধরনের কাব্যসৃষ্টি, তা পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে আছে বলে এখনো জানা যায়নি।

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের রচনাবলীর মধ্যে উৎকর্ষেও বারোমাসীর গুরুত্ব কম নয়। বস্তুতঃ, আঙ্গিকের দিক থেকে বারোমাসী প্রায় ক্ষেত্রেই সুসম্বদ্ধ রচনা এবং তার কাব্যরসও সরল, অকপট অনুভূতি থেকে উৎসারিত। তার বাণীধারা কাটা খালের জলের মতো বাঁধা পথে এগিয়ে চলে। এজন্যেই উচ্ছল হওয়ার অবকাশ তার সীমায়িত, অকারণে পথের সবটুকু সিক্ত করবার তাগিদও অমোঘ নয়। এই সব লক্ষণই তাকে চিনে নেয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়।

বারোমাসীর নাম-লক্ষণ বক্তব্যের সাথে বৎসরের বারোটি মাসের উল্লেখ। মাসগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই একই নামে পরিচিত। অন্য দিকে, বিভিন্ন ভাষার বারোমাসীর রূপ, বাচনভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে সামান্যতমো পার্থক্যও নেই এবং বারোমাসীর আদি যুগের নমুনাগুলি অলিখিত আর রচনার স্থানকালাদি সম্পর্কে নীরব বলে কোন্‌টি বয়েসে সবচেয়ে প্রাচীন, তা বোঝাও সম্ভব নয়। তাই, বিশাল ভারতীয় উপ-

মহাদেশের কোন্ অঞ্চল বারোমাসীর জন্মভূমি, কোন্ ভাষা তার মাতৃভাষা এবং কোন্ মানবগোষ্ঠী তার প্রথম লালনকর্তা, এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা যদিচ কাম্য, তবু অসাধ্য। তবে, বারোমাসী সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যতো আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে (পরিমাণে তা অতি সামান্য), তার থেকে জানা যায়, বাংলা ভাষায় এর প্রাচুর্য সর্বাধিক। সারা বাংলার কথা না-ই বা বললাম। শুধু বাংলাদেশেই কৌতূহলী মনীষীরা আজ অবধি যেসব বারোমাসীর সন্ধান পেয়েছেন, সংখ্যায় সেগুলি অন্য সমস্ত ভাষার বারো-মাসীর মোট সংখ্যার থেকে বেশী হয়তো নয়, কিন্তু তার থেকে কম, এমন কথাও নিঃসঙ্কোচে বলা চলে না। এবং লৌকিক আর অভিজাত দুই শ্রেণীর বারোমাসীই এখানে সংখ্যায় প্রচুর।

এই অনন্য শ্রেণীর রচনার প্রাচীনতমো নমুনাগুলি পাওয়া গেছে লোক-সাহিত্য থেকে। বহু বারোমাসীতে প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক সমাজ আর কালের এমন জিনিষের উল্লেখ আছে, যা শুধুমাত্র লোকসাহিত্যেই থাকা সম্ভব। তবু নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না, বারোমাসী প্রথমে দেখা দিয়েছিলো লোকসাহিত্যে। তার ছন্দোবদ্ধ সুনির্দিষ্ট রূপই আমাদের এমন মন্তব্য প্রকাশের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। এই বাধা আরো দুস্তর হয়ে ওঠে, যখন দেখি, অনুন্নত সমাজে যেমন বারোমাসী প্রচলিত আছে তেমনি বহু সাধকের উত্তরসূরী কালিদাসের রচনায় এবং একাধিক পুরাণেও বারোমাসী গোত্রের রচনা রয়েছে।

কিন্তু বারোমাসীর প্রথম উৎস লোকসাহিত্যই হোক, আর অভিজাত সাহিত্যই হোক, একটি বিষয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। একটু আগেই বলেছি, বাংলা সহিত্যের দুটি ধারাতেই তার প্রাচুর্য আছে। সহজেই অনুমেয়, এই প্রাচুর্য আমাদের সাহিত্যে তার ব্যাপক চর্চা আর উৎকর্ষের ফল। এমন চর্চা আর উৎকর্ষ আমরা আর কোনো ভাষায় দেখিনে। বাংলা সাহিত্যের ছোটো বড়ো অসংখ্য কবি বারোমাসী রচনা করেছেন। তার ধারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতরো হয়ে আসে। কিন্তু তা আজও একেবারে থেমে যায়নি। পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন, একালের লোকসাহিত্যের মতো অভিজাত সাহিত্যের আধুনিক কবিদের মধ্যেও বারোমাসী-রচয়িতার অভাব নেই।

কারো কারো মতে, বাংলার আদিতমো বারোমাসীগুলি রচিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগে। কিন্তু সে-সময়ের বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত নিদর্শন বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া গেছে, সেসবের সঙ্গে বারোমাসীগুলির ভাষার কোনো সাদৃশ্য নেই। উদাহরণস্বরূপ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' থেকে একটি বারোমাসীর কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি,—

…আশ্বিন মাসেত মেঘে বরিষন্ত ঝিঝিকানি।
নদীএ আছেন কূপজল পূরিত যে পানি॥
কাত্তিকে সোলুণ্ডেতে নাহিক আকুলা।
অঘানে পাকএ শিষ নামএ পড় একেলা॥…

কেউ বলেন, রামাই পণ্ডিত দশম-একাদশ শতকের কবি, কারো কারো মতে সপ্তদশ শতকের। কিন্তু বারোমাসীটির ভাষাকে ওই দুটি সময়ের কোনোটির ভাষা বলেই সহজে মেনে নেয়া চলে না। যদি মূল রচনা পরিবর্তিত না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে নতুনতরো সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

অবশ্যি, প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের বহু তথ্য আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এজন্যে, আদি যুগের বারোমাসীর ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও বিস্তারিত এবং তর্কাতীত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, লৌকিক এবং অভিজাত উভয় শাখাতেই বারোমাসীর ব্যাপক বিকাশের সূচনা ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। তারপর ক্রমে ক্রমে বারোমাসী রচনা হয়ে দাঁড়ায় অনেকাংশেই গতানুগতিক এবং অনুকরণের ব্যাপার। মধ্য যুগে বস্তুতঃ এমন বাঙালী কবি সম্ভবতঃ কমই ছিলেন, যাঁরা কখনো বারোমাসী রচনা করেননি। এ-প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে বলেছেন,—

> …আমরা প্রতি চণ্ডী কাব্যে ফুল্লরা ও খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণে' পদ্মাবতীর 'বারমাস্যা' (১৭৮৩ পদ), বিদ্যাসুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারোমাস্যা,' সৈয়দ আলাওল কবির 'পদ্মাবতী'তে নাগমতী। 'বারমাস্যা' মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধর প্রণীত রাধার 'বারমাস্যা', সেক কমরালী বিরচিত রাধার 'বারমাস্যা,' সেক জালাল প্রণীত সখীর 'বারমাস্যা' এইরূপ রাশি রাশি

'বারমাস্যার' সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের পথে-ঘাটে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটি সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপরেই উহা উপর্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তত্ত্বসার হইয়াছে।...

এই বিপুলসংখ্যক বারোমাসী কিন্তু পুনরাবৃত্তিদোষ সত্ত্বেও একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। বরং সীমায়িত অবকাশেও কবিরা স্বাদ বদলের প্রয়াস পেয়েছেন। তার ফলে, এক দিকে যেমন বিষয়ে কিছু কিছু নতুনত্ব আসে, অন্য দিকে তেমনি দেখা দেয় আঙ্গিকের বৈচিত্র্য। একটু আগেই বলেছি, বারোমাসীর একটি বিশেষ লক্ষণ, এতে বক্তব্য পরিবেশিত হয় বৎসরের সব কটি মাসের উল্লেখ করে, প্রত্যেক মাসের সঙ্গেই বক্তব্যের এক-একটি দিক বা অংশকে জড়িয়ে নিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বারো মাসের পরিবর্তে ছয় ঋতুর উল্লেখও আছে। যেমন, কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। বাংলায় কালিদাস রায়ের 'চিরমিলন' শীর্ষক কবিতাটি এই ধরনের রচনা।

যেসব বারোমাসীতে সব মাস বা ঋতুরই উল্লেখ আছে, আলোচনার সুবিধার জন্যে তাদের নাম দেওয়া যেতে পারে সম্পূর্ণ বারোমাসী। রচনালক্ষণে বারোমাসী, কিন্তু সকল মাসের উল্লেখ নেই, এমন রচনাও বাংলায় এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষায়ও—যথেষ্ট রয়েছে। এগুলির কোনোটিতে আছে আট মাসের কথা (যেমন, ষষ্ঠীবর দত্তের 'মনসামঙ্গল'-এ বেহুলার অষ্টমাসী), কোনোটিতে ছয় মাসের (উদাহরণ, 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-য় কঙ্ক ও লীলার ষাণ্মাসিকী), কোনোটিতে বা কেবল চার মাসের (যথা, 'পদকল্পতরু,-তে সংকলিত সিংহভূপতির চতুর্মাসী)। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে, এগুলি "বারোমাসী গীতিরই সগোত্র, এই নামেই এদের সাধারণ পরিচয়। সহজ কথায় বারো মাস বা ছয় ঋতুর চিত্র-চরিত্র অবলম্বনে মানব-মানবীর আনন্দ-অশ্রুর আবেগ-উচ্ছ্বাসময় গীতিই 'বারমাস্যা'।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চট্টগ্রামের ধলঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান আদিনাথ সরকার এমন এক গীত সংগ্রহ করেছেন, যাতে দশ মাসের উল্লেখ আছে। রচনাটি খুব [illegible]ব লৌকিক। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এটি 'সীতার দশমাস্যা' নামে পরিচিত এর আগেকার কোনো সংগ্রহে

দশমাসী দেখা যায়নি। 'সীতার দশমাস্যা'-য় আমরা পাই বৈশাখ থেকে মাঘ পর্যন্ত দশ মাসের উল্লেখ।

চতুর্মাসী, ছয়মাসী, অষ্টমাসী আর দশমাসীগুলিকে সাধারণভাবে অসম্পূর্ণ বারোমাসী বললে আশা করি অন্যায় হবে না।

এখানে বলা প্রয়োজন, সকল বারোমাসীতেই যে মাস বা ঋতুর উল্লেখ থাকবে, এমন কোনো কথা নেই। বারোমাসীসাহিত্যের পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এর বহু রচনায় কবিনির্দিষ্ট সময়েরও সব মাসের উল্লেখ মেলে না। এমনকি, কোনো কোনো রচনায় আদৌ কোনো মাস বা ঋতুর নাম নেই। অথচ এগুলিতেও বারোমাসীর কাব্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। এ-ধরনের বারোমাসীর সাক্ষাৎ মেলে সাধারণতঃ লোকসাহিত্যে। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থমালায় এই জাতীয় বারোমাসীর বেশ কয়েকটি নমুনা রয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব মাসের উল্লেখ না পেলে এগুলিকেও অসম্পূর্ণ বারোমাসী বলে ধরে নেয়াই বাঞ্ছনীয়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বারোমাসী বিরহ-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গমাত্র। কিন্তু এই মত নির্ভুল বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে, আঙ্গিকের মতো বিষয়ের দিক থেকেও বারোমাসীর নিজস্ব কিছু বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে।

এ-পর্যন্ত যেসব বারোমাসীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের বিষয়বস্তু মোটামুটি হিসেবে নির্দিষ্ট। বিষয়ভেদে বাংলা ভাষার লৌকিক এবং অভিজাত উভয় শাখার বারোমাসীকেই চার ভাগে ভাগ করা যায়,—ব্যবহারিক, আখ্যানমূলক, ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক এবং প্রেমমূলক। ব্যবহারিক শ্রেণীর বারোমাসী কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, চাষবাসের সময় গীত বা পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে রচিত বারোমাসী। আখ্যানমূলক বারোমাসী, তার নামেই প্রকাশ, কাহিনীজীবী। এগুলিতে প্রায়ই কাহিনী বিবৃত হয়ে থাকে। তৃতীয় গোত্রের বারোমাসীর উপজীব্য ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ঘটনা বা অবস্থা। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক সংগৃহীত রহিমুন্নিসার 'ভ্রাতৃবিলাপ' এবং ফুল্লরা, খুল্লনা, সীতা, বেহুলা, মনসা প্রমুখের অধিকাংশ বারোমাসীই এই শ্রেণীর। বারোমাসী

...ভুঁই মোগো মাতাপিতা, ভুঁই মোর গো পুত।
ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ।।

বস্তুতঃ, প্রকৃতির রূপ বা মহিমা বর্ণনা এবং তার সাথে আত্মীয়তা স্থাপন প্রকৃতিনির্ভর মানুষের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বারোমাসীসাহিত্যের পাঠকরা আরো লক্ষ্য করেছেন, বারোমাসীতে প্রকৃতির প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে নারীমানসের চিন্তা-অভুনুতির মাধ্যমে, মুখ্যতঃ দেহজ কামনার প্রসঙ্গে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, বাংলাদেশে এখন যেসব বারোমাসী প্রচলিত আছে, সেগুলির একটি বড়ো অংশ লালিত এবং গীতও হয় কেবল নারীসমাজে। সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই রওশন ইজদানী বলেছেন, 'মেয়েলী গীতের আর একটি বিশেষ দিক আছে, তা হচ্ছে, পল্লীনারীদের বারোমাসী গীত।' কিন্তু ওপরের আলোচনা থেকেই দেখা যাবে, বারোমাসীকে মেয়েলি গানের গোত্রে ফেলা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়। মেয়েলি গানেরও প্রধান উপজীব্য নারীজীবনের হাসি-অশ্রু। কিন্তু, নারীমানসের চিন্তা-অনুভূতির প্রাধান্য সত্ত্বেও, বারোমাসীর ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে এর থেকে ব্যাপক। পক্ষান্তরে, যে কোনো বারোমাসীই পুরুষসমাজে গীত হতে পারে, কিন্তু সব মেয়েলি গান পারে না। এবং অনেক বারোমাসী— বিশেষতঃ, প্রথম গোত্রের বারোমাসীগুলি শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা গেয়।

প্রসঙ্গতঃ, আদি যুগের অধিকাংশ বারোমাসীই কৃষিবিষয়ক এবং একালে কৃষকসমাজে প্রচলিত। মধ্য যুগে অনেক বন্দনামূলক বারোমাসী রচিত হয়। এই সব বারোমাসী সাধারণতঃ শোনা যায় অপেক্ষাকৃত ভদ্র শ্রেণীর পুরুষের মুখে এবং এগুলির লবকুশও প্রধানতঃ পুরুষ। অন্য সমস্ত বারোমাসীই নারীপ্রধান আর নারীগেয়। বক্তব্যও নারীসুলভ। ব্যতিক্রমস্বরূপ যে দুই একটি বারোমাসীতে পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেগুলির বক্তব্যও যেন নারীপ্রধান বারোমাসীগুলির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ বিরহিণী রাধা বর্ষাকালে তাঁর অন্তরের বেদনা প্রকাশ করেছেন এইভাবে,—

…আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরয়ে॥…
কেমনে বঞ্চিব রে বরিষা চারি মাস।
এ ভরা যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাশ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সতিআঁ এক সরী নিন্দ না আইসে॥…

মোটামুটি হিসেবে সমস্ত প্রেমমূলক বারোমাসীরই এই হল মূল সুর। বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে এমনি সুরেই তাঁদের নায়িকার মানসিক আর্তি প্রকাশ করেছেন। রায় গুণাকরের রচনাবলীতে বিস্তার বারোমাসী ছাড়াও বারোমাসীর আঙ্গিকে লেখা 'বর্ষা' এবং 'বসন্ত' নামে দুটি খণ্ড কবিতা আছে। কবিতা দুটির বক্তব্য বড়ু চণ্ডীদাসের বক্তব্যের অনুরূপ। প্রথম কবিতাটি থেকে এখানে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি। লক্ষণীয়, এতে কবির গৃহ-প্রত্যাবর্তনের কামনা এবং দেহজ কামনা যেন এক হয়ে গেছে,—

…বসন্ত নিদাঘ শেষ, পুনঃ তোর পরবেশ,
ভারত না গেল দেশ, আঃ আরে বর্ষা॥
ভুবনে করিল তুর্ণ, নদনদী পরিপূর্ণ,
বিরহিনী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা।…
ময়ুর ময়ুরী নাচে, চাতকিনী পিউ যাচে,
আর কি বিরহী বাঁচে, বুঝিনু নিকর্ষা।

অন্যান্য শ্রেণীর বারোমাসীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকৃতিনির্ভর কৃষিবিষয়ক বারোমাসীগুলি। তবে এই শ্রেণীর বারোমাসীতে প্রকৃতির উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার বর্ণনা রীতিমতো বিরল। বরং এসব রচনায় ফসলের বর্ণনা এবং কৃষকের সুখদুঃখের কাহিনীই মুখ্য। (অবশ্যি, বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে, কৃষিবিষয়ক বারোমাসীও সব সময় দেহজ কামনার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পারেনি।) এবং এ-ধরনের কাহিনী প্রার্থনার মতো হয়ে উঠতেও বাধা নেই,—

…ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল কাতিকে দেয় সাড়া,
অঘ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখবে আমন ছড়া।

আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছুই নাই, ..

আইস এবার যাবার বেলা চরণ বন্দি তার।...

প্রকৃতির বর্ণনা এবং দেহজ কামনার প্রকাশ সবচেয়ে কম দেখা যায় আখ্যানমূলক এবং ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ের বারোমাসীতে। এগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির প্রসঙ্গ কেবল মাস বা ঋতুর উল্লেখে সীমাবদ্ধ। বর্ণনা যা পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক। বারোমাসীর আঙ্গিকে রচিত কবিতায় প্রকৃতি এবং মাস-ঋতুর প্রসঙ্গ উত্থাপন অপরিহার্য,—হয়তো এই ধারণাই সংশ্লিষ্ট কবিদের গতানুগতিক প্রকৃতিপ্রীতির কারণ। সংক্ষেপতঃ, আখ্যানমূলক এবং ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক বিষয়ের বারোমাসী গীতে প্রকৃতির ভূমিকা কিছুটা গৌণ, যদিচ তার স্বতন্ত্র সত্তা সর্বদা স্বীকৃত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বারোমাসীতে প্রকৃতির এই দিগ্ব্যাপ্ত প্রভাব কেমন করে এলো? এবং নারীপ্রাধান্য?

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হলে একবার মানুষের আদি ইতিহাসে নজর বুলিয়ে নেয়া দরকার। ওপরে আমি সে-ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। এবার আমার বক্তব্য একটু বিস্তারিতভাবে বলি।

আজ মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক যেমনি হোক না কেন, একদিন সে ছিলো প্রকৃতির হাতের অন্ধ পুতুল। সেদিনের মূলতঃ প্রাণীভুক মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনে বন থেকে বনান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে বিচরণ করে ফিরেছে খাদ্য প্রাণীর সন্ধানে। হয়তো সে প্রাণীও ছিলো তারই মতো যাযাবর, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বা খাদ্যের অভাব আর প্রাচুর্যের চক্রবৎ পরিবর্তনে অস্থির। যূথচারী মানুষ সেদিনও আজকের মতোই প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করেছে। তবে, তখন সে তার প্রকৃতিনির্ভরতা সম্পর্কে সচেতন ছিলো, এমন কথা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সে যা-ই হোক, এক সময় তার জীবনে আসে দিন বদলের পালা। যাযাবর মানুষ আবিষ্কার করে কৃষি। আগে যাকে প্রাণ ধারণের জন্যে চেয়ে থাকতে হত শিকারের দিকে, সে এবার হয়ে ওঠে অন্নময় প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিনির্ভরতার চেহারা গেল পালটে।

মূল ধরন ঠিক থাকলেও। আগে যে-নির্ভরতা ছিলো পরোক্ষ এবং অন্ধ, এবার তা হল প্রত্যক্ষ এবং সচেতন। কৃষিজীবী মানবসমাজ ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে এবার দেখতে পায়, প্রকৃতিই তার অন্নদাত্রী। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যখন তখন এবং যেখানে সেখানে শস্য জন্মানো সম্ভব নয়। এর জন্যে বীজ, পরিশ্রম ইত্যাদির যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয়. প্রকৃতির আনুকূল্যের এবং সে-আনুকূল্য আসে ঋতুগত পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এই জ্ঞানে মহাজ্ঞানী মানুষ ক্রমে হয়ে উঠলো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সচেতন, সতর্ক পর্যবেক্ষক। পরিবর্তনের লক্ষণ কি, তার ভাবই বা কেমন, মানুষ তা বিস্তারিতভাবে জেনে ফেলে। প্রকৃতিতে-বা তার বিভিন্ন শক্তিতে-দেবত্ব বা দেবীত্ব আরোপে অযথা কালক্ষেপেরও আর প্রয়োজন থাকে না। মানুষ দেহমন দিয়ে বুঝতে পারে, প্রকৃতির দুর্বোধ্য শক্তি, অনুকূল-প্রতিকূল পরিবর্তনই কৃষির ব্যাপারে সুখদুঃখদায়িনী শঙ্কা-সম্ভাবনার স্রষ্টা। তার এই স্তরের প্রকৃতিনির্ভরতার স্বরূপ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বারোমাসী-বিশেষজ্ঞ ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' নামক গ্রন্থে বলেছেন,—

> ···সেদিনের মানুষের উৎসব ব্যসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল প্রকৃতি··· গাছের ফল-পুষ্পের বিকাশে তারা মেতে উঠত, আর তারই অপ্রকাশে তারা মর্মাহত হতো। ব্রত ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রতিকার প্রতিবিধানেও তৎপর হতো তারা। ঋতুতে ঋতুতে চাষবাসের বিচিত্র অবস্থা। তাই·· সেকালের ব্রত ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান ছিল মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে।···আর উৎসবের দেব-দেবী মাত্রই কৃষির দেবতা, ক্ষেতের দেবতা, প্রজনন শক্তির প্রতীক। ··

আদি যুগের অধিকাংশ বারোমাসীরই বিষয় কেন যে কৃষি হল, তা এর থেকেই বোঝা যাবে। কৃষিবিষয়ক বারোমাসীগুলি একান্তভাবে কৃষিনির্ভর সমাজেরই সৃষ্টি। পরবর্তীকালে মানুষের প্রকৃতি-সম্পর্কিত জ্ঞান তাকে প্রকৃতি জয়ে সাহায্য করে। তা সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক কারণে, সমাজের মূল কাঠামোতে বহু দিন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এজন্যে,

প্রকৃতির প্রসঙ্গ অনায়াসেই দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। তার ব্যাপকতা লাভের জন্যেও দায়ী তখনকার সমাজের প্রায়-অবিচল রূপ।

বাংলাভাষী অঞ্চলে কৃষিসমাজের গোড়াপত্তন কবে হয়েছিলো,-এমন প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কোনো ইতিহাসকারই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু একথা আমরা তর্কাতীতভাবেই জেনেছি যে, এ-অঞ্চলে প্রাচীনকালে যতো জাতি-উপজাতির আবির্ভাব হয়, মূলতঃ তাদের আদি বৃত্তি ছিলো অনেক ক্ষেত্রেই কৃষি। কিংবা নতুন বাসভূমিতে পৌঁছনোর অনতিকাল পরেই তারা শুরু করে কৃষিকাজ। বর্তমান কালের বাংলাভাষী অঞ্চলে প্রধানতঃ উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগই ছিলো তাদের প্রথম বাসভূমি। এই সব জায়গা থেকে তারা পরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। যতো দূর জানা যায়, তারা ছিলো আর্যেতর মানব-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মানুষ। আর্যজাতিও উপরি-উক্ত জায়গাগুলি দিয়েই বাংলায় প্রবেশ করে। তারাও ছিলো মূলতঃ কৃষিনির্ভর। 'আর্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই কৃষক। বাংলার প্রায় সমস্ত দেবদেবীই সেকালের এই আর্য এবং আর্যেতর জাতি-উপজাতির সঙ্গে এখানে আবির্ভূত এবং প্রতিষ্ঠিত হন। প্রতিষ্ঠার এবং তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং আদর্শগত কারণে সংঘর্ষ ঘটে। তার ফলে দেবদেবীদের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। তবু, তাঁদের অধিকাংশই যে আসলে কৃষির দেবদেবী, তা সহজেই বোঝা যায়। বাংলায় এবং বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সেদিন পর্যন্তও তাঁরা প্রায় স্বরূপে এবং সোজা পথে অতি-অনুন্নত কৃষক সম্প্রদায়ের ভক্তিশ্রদ্ধা ভোগ করেছেন। (আজও তাঁদের স্বরূপ খুব বেশী অস্পষ্ট নয়।) তাঁরা এবং তাঁদের পূজারীর দল প্রথমে যেসব জায়গার বাসিন্দা হন, বিস্তারিত বিচারে দেখা যায়, কৃষিবিষয়ক বারোমাসীগুলি প্রচলিত রয়েছে সেই সব অঞ্চলেই। বর্তমান আলোচনায় উল্লিখিত এই শ্রেণীর রচনা কটি রংপুর থেকে সংগৃহীত।

ওপরের একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, কৃষির দেবদেবীই প্রজনন শক্তির প্রতীক। যেহেতু বারোমাসীর দেবদেবীরাও এই গোত্রের, সে-কারণে এখানে বিষয়টি সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বারোমাসীতে নারীপ্রাধান্যের হেতুও এতে খুঁজে দেখা যাবে।

বারোমাসীসাহিত্যের মনোযোগী পাঠকরা জানেন, এতে দেবীদের তুলনায় দেবতাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, দেবদেবীর এই সংখ্যানুপাত আকস্মিক। কিন্তু আসলে এর পেছনে রয়েছে সভ্যতার বিবর্তনের এক কৌতুহলজনক কাহিনী। এবং সে-কাহিনীর জন্ম কৃষিযুগেরও আগে। মানুষ যখন কৃষি আবিষ্কার করে তার যাযাবর জীবনে যতি টানেনি, তখনই লক্ষ্য করে, নারী এক রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারিণী। সেই ক্ষমতার বলে তারা নতুন মানুষের জন্ম দেয়। কৃষিযুগে দেখা যায়, মাটি তথা পৃথিবীও এমনি কোনো ক্ষমতায় বন-প্রান্তর শস্যের সম্ভারে ভরে তোলে। রহস্যের সমাধানে অপারগ আদিম কৃষিসমাজ সেদিন ভেবেছে, এই দুই রহস্যময়ীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে শস্যের উৎপাদন সহজ হবে। মানুষ তখনও শিকার একেবারে ছেড়ে দেয়নি। যদিও বনের পশুকে আয়ত্তে আনার কৌশল সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। সন্দেহ নেই, এ-কাজে শারীরিক কারণে নারী ছিলো অল্পযোগ্য। হয়তো এই প্রাথমিক ওজুহাত দেখিয়েই সমাজ সেদিন কৃষিকাজের ভার দেয় নারীর ওপর। কিন্তু নারীর সৃষ্টি-ধর্মিতা সে-যুগের মানুষের মনে এক বিচিত্র বিস্ময় আর সংস্কার সৃষ্টি করে। তারপর যা ঘটে, সে-সম্পর্কে চার্লস সেণ্টম্যান তাঁর 'উইমেন ইন এ্যান্টিকুইটি' নামক গ্রন্থে বলেছেন, –

> ...From this there arose in ancient times fertility rites which exalted women in the eyes of their menfolk and which gave to many women periodically such splendours and delights as they have scarcely enjoyed since the 4th or 5th centuries of our era...

এ-অবস্থায় কৃষিসমাজে নারীর দেবীত্ব লাভ ছিলো অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ঘটনা।

অবশ্যি, তার দেবীত্ব লাভ কৃষি-সভ্যতার আগেই শুরু হয়েছিলো। গ্রীক পুরাণের আর্টিমিস শিকারের দেবী। পৌরাণিক ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সে-ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে এশিয়া মাইনরের রণরঙ্গিনী আমাজনদের মিলন ঘটে। আমার অনুমান, ভারতীয়

উপমহাদেশের দুর্গাও এক সময় এই শ্রেণীর দেবী ছিলেন। তিনি দশপ্রহরণধারিণী এবং তাঁর সব প্রহরণই যুদ্ধাস্ত্র। অপিচ, তাঁর অন্যতমো প্রধান পরিচয় রণচণ্ডী রূপে। রামচন্দ্র লঙ্কা জয়ের জন্যে অন্য কোনো দেবদেবীর শরণাপন্ন না হয়ে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকেই স্মরণ করেন। পৌরাণিক যুগের 'দেবী পুষ্পাঞ্জলি' শীর্ষক একটি স্তোত্রেও দুর্গা সম্বোধিত হন 'অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধর নির্জর শক্তিভৃতে' বলে।

এদিকে, ইতিহাসের এক সাক্ষ্য, নারীই কৃষি আবিষ্কার করে। তারপর, যে কারণেই হোক, তারাই বনে যায় কৃষির ব্যাপারে সর্বময়ী কর্ত্রী। ইতিমধ্যে মানুষ কৃষিকেই তার প্রাণ ধারণের প্রধান অবলম্বনে পরিণত করে। এর অর্থ, নারী তখন সমাজের অন্নদাত্রী। তারা সে-সময়ে যে কি ধরনের মর্যাদা লাভ করেছিলো, তা তাই সহজেই অনুমেয়।

পরে অবশ্যি নানা কারণে কৃষিতে নারীর প্রাধান্য লুপ্ত হয় এবং তাদের স্থান গ্রহণ করে পুরুষ সমাজ। কিন্তু আজও মানব সমাজে নারীপ্রাধান্যের যুগের রেশ রয়ে গেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে—বিশেষ করে, বাংলায় বহু ব্রত-পুজোর মূল আদি কৃষিসমাজে নিহিত। এই সব ব্রত-পুজোয় নারীর ভূমিকাই প্রধান। এমনকি, কোনো কোনোটিতে পুরুষের কোনো ভূমিকাই নেই।

এখানে আরো স্মরণীয়, বিবর্তনের প্রথম স্তরে মানবসমাজ ছিলো ছোটো ছোটো সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন। নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তা সত্ত্বেও পরিবেশগত কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কল্পনা-ধারণার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও তখনই দেখা দেয় এবং এক-এক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এক-এক রূপ পরিগ্রহ করে। পরে যখন জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন ঘটে এবং তার ফলে বৃহত্তরো সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, তখন তাদের কল্পনা-ধারণাও বিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাপকতরো রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো কোনো 'আধুনিক' ধর্মীয় সমাজে আমরা এই জন্যেই একই সঙ্গে একাধিক কৃষি-দেবীর পুজো দেখতে পাই। সুশীলার বারোমাসী, কমলার বারোমাসী, আর নিমাইয়ের বারোমাসীতে লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী, মনসা প্রমুখ দেবীর সমানভাবে শ্রদ্ধা লাভের মূলেও রয়েছে উপরি-উক্ত বিবর্তন।

দেবীদের ভিড়ে যে কয়জন দেবতা কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চন্দ্র, সূর্য, শিব এবং কার্তিক। ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যাবে, এঁদের সবাই প্রজনন শক্তি তথা উর্বরতাবাদের প্রতীক। এক সময়ে হিন্দু সমাজে সন্তান-কামনায় দেবীদের সঙ্গে এঁদের পূজোও করা হত। চট্টগ্রামের 'নিমাইয়ের বারোমাসী'-তে এর একটি চমৎকার প্রমাণ রয়ে গেছে। এই রচনাটিতে শচীদেবী সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছুক চৈতন্যদেবকে বলছেন,—

…আমার দুঃখের কথা শোন দিয়া মন।
তোমারে পেয়েছি বাছা তপস্যা কারণ॥…
আষাঢ় মাসে পদ্মপুষ্প শিবের সন্তরণ।…
পৌষ মাসে পুজিলাম চন্দ্র হেন দেবা।
মাঘ মাসে সূর্যদেবে দিয়াছি নানা জবা॥…

চন্দ্রপূজো কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু শিব-সূর্যের পূজো আজও নানান জায়গায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। বাংলায় সূর্যদেবতার আবির্ভাব ঘটে সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীতে। শোনা যায়, উক্ত শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা শশাঙ্ক রোগশান্তির জন্যে সরযূতীরের বালার্ক সমাজ থেকে বারোজন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে গৌড়ে নিয়ে আসেন। রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস'-এ বলেছেন, 'এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বঙ্গদেশে সূর্য-পূজার ও প্রতিমা-পূজার প্রচলন হয়।' সূর্য বৈদিক দেবতা। কিন্তু তিনি যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন কৃষিজীবী সমাজে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্ততঃপক্ষে কিছুটা বিবর্তিত হন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিবর্তিত রূপেই তিনি বারোমাসীতে আসেন।

প্রসঙ্গতঃ, পৌরাণিক যুগে রচিত 'নামস্তোত্রম্' শীর্ষক সূর্যস্তোত্রের একাংশে সূর্যের ক্ষমতা এবং বিভিন্ন মাসের নামরূপ যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সাথে বারোমাসীর প্রকৃতি-বর্ণনার ভঙ্গির সাদৃশ্য আছে,—

…অরুণো মাঘমাসেতু সূর্যোবৈ ফাল্গুনে তথা।
চৈত্রমাসেতু বেদনাঙ্গ ভানু বৈশাখ তাপনঃ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে তপোদি[illegible] আষাঢ়ে তপতে রবিঃ।
গভস্তেঃ শ্রাবণে মা[illegible] যমো ভাদ্রপদে তথা॥

ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্তিকে চ দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষে তপোহমিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥
এক এব প্রজ নিত্যং সংবর্ধয়তি রশ্মিভিঃ।
এষ ধাতা বিধাতা চ বীজং ক্ষেত্রং প্রজাপতিঃ ॥…

শিব শুধু ধর্মশাস্ত্রের বিচারেই নয়, সমাজতাত্ত্বিক বিচারেও অতি প্রাচীন দেবতা বলে স্বীকৃত হয়েছেন। পক্ষান্তরে, তিনি যে অনার্য এবং কৃষিজীবী সমাজের দেবতা, সে-বিষয়েও আজ আর বিতর্কের অবকাশ নেই। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ'-এ সংকলিত একটি বারোমাসীতে দেখা যায়, তিনি কৃষির দেবতা এবং উর্বরতাবাদ বা প্রজনন শক্তির প্রতীক রূপে অনেক দিন আগেই বাংলাভাষী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বারোমাসীটি থেকে এখানে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,—

একদিন রসহাসে কৈলাসে ভোলানাথে।
প্রেম রসে ত্রিলোচন পার্বতীর সাথে ॥
কৌতুক করিতে শিবে উপজিল কাম।
কামে উপজিল ধান কামদ বলি নাম ॥
যতেক ধান গোসাঞি সকল বুনিলা।
চাষ চষিয়া গোসাঞি লাঙ্গল তুলিলা ॥…

অবশ্যি, শিবের এহেন স্বীকৃতি সত্ত্বেও সমাজে এবং বারোমাসী-সাহিত্যে তাঁর থেকে দুর্গার জনপ্রিয়তা বাংলাভাষী অঞ্চলে অনেক বেশী ব্যাপক। শিব-দুর্গার জন্ম একই সমাজে, না, বিভিন্ন সমাজে, তা বলা সহজ নয়। তবে, তাঁদের গুণ, প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলি থেকে অনুমান করা চলে, উভয়েই এক সময় শিকারী সমাজের দেবদেবী ছিলেন। তাঁরা কৃষির দেবদেবী এবং উর্বরতাবাদের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা পান সম্ভবতঃ সামাজিক বিবর্তনের ফলে। তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের কথাও হয়তো প্রথমে ঘোষিত হয় নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন কোনো সমাজে।

এখানে একটি প্রশ্ন। সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা মানুষের মনে একদা যে রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করে, দুর্গা কি তারই ক্রিয়ায় ক্রমে শিবের থেকে প্রবল হয়ে ওঠেন? দেবী স্ত্রীর কাছে দেবতা স্বামীর পরাজয়ের

মন্দির তো ইতিহাসে আছে। প্রাচীন মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা অসিরিস বা অসার ছিলেন একাধারে সম্পদের উৎস, ধর্ম আর আইনের প্রবর্তক এবং উর্বরতাবাদের প্রতীক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্ত্রী এবং ভগ্নী ইসিসের কাছে হার মানতে হয়। ইসিস তাঁর গৌরবের স্বর্ণযুগে স্বর্গ আর মর্তলোকের রানী, মাতা বসুন্ধরা, দেবদেবীসহ সর্ব-জীবের জননী এবং সর্বভূতে মূল স্বরূপ প্রকৃতি বলে প্রতিষ্ঠা পান। এ-সময়ে আফ্রোদিতি আর আর্টিমিসের পরিচয় দাঁড়ায় তাঁর নামান্তর মাত্রে।

আদি কৃষিযুগের মানুষের প্রবল প্রকৃতিনির্ভরতা এবং সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ তথা উর্বরতাবাদে অন্ধ বিশ্বাসের ভিন্নতরো ফল এবং তার প্রমাণও অবশ্যি যথেষ্ট দেখা যায়। বহু ভাষায় পৃথিবী আর দেশ-মহাদেশের নাম স্ত্রীলিঙ্গ। প্রমাণ, ইউরোপ আর এশিয়া। প্রাচীন মিশর, গ্রীস, ভারত ইত্যাদি অঞ্চলে পৃথিবীর মাতৃরূপ কল্পনা করা হয়। যেমন, মাতা বসুন্ধরা, মাদার আর্থ ইত্যাদি। বাংলার প্রত্যন্তবাসী ওরাওঁ সম্প্রদায় এই সেদিনও মাটিকে নারী বলে ভাবতো এবং তাদের প্রায় সমস্ত উৎসবেরই ভিত্তি ছিলো এমনি ধারণা। এক সময় বাংলা-দেশে দেখা গেছে, লোকে মাটিতে লাথি মারা নিন্দনীয় বলে মনে করতো। সম্ভবতঃ এর মূলেও ছিলো মাটি বা পৃথিবীর কল্পিত দেবী কিংবা মাতা রূপ।

কালক্রমে সমাজ এবং সভ্যতার বিবর্তনের ফলে এক দিকে যেমন এজাতীয় ধারণাবলী ব্যাপকতরো রূপ লাভ এবং কিছু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে, অন্য দিকে তেমনি মানুষ ধারণাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা হারিয়ে ফেলে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই সেসবের জের টেনে চলে। এই জন্যেই উত্তর বাংলার কৃষক একই বারোমাসীতে মাতা বসু-ন্ধরার পূজোর প্রস্তাবের সাথে সাথেই প্রকৃতিনির্ভরতাকে একেবারে চরম রূপ দেয়। ভূমি তখন আর তার কাছে প্রাণহীন, জড়-পদার্থ মাত্র থাকে না, হয়ে ওঠে মানুষের মতোই প্রাণময়, মানুষের অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আর, সে বলে, 'ভুঁই মোগো মাতাপিতা, ভুঁই মোর গো পুত।' আবার, ওই অঞ্চলেরই কৃষিবিষয়ক অন্য একটি বারোমাসীতে নারীর মানসকামনা এবং প্রকৃতি আর কৃষির বর্ণনা যেন এক হয়ে গেছে,—

প্রথম অঘ্রাণ মাসে নয়া হেউতি ধান।
কেউ কাটে কেউ নাড়ে কেউ করে নচান ॥
এই মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল পৌষ মাস ॥…
শ্রাবণ মাসেতে কন্যা কিসসানে ওয় ওয়া।
হাঁড়ি কোণে করিছে মেঘ গগনে বর্ষে দেওয়া ॥ …
বর্ষেক রে বর্ষেক রে দেওয়া বর্ষেক পঞ্চ ধারে।
আমার ঘরে নাই সাধু ফিরিয়া আসুক ঘরে ॥…

আগেই বলেছি, প্রকৃতির ঋতুগত পরিবর্তনে বিস্মিত, অভিভূত মানুষ একদিন প্রকৃতিকে জীবনের সব অনুভূতির নিয়ামক শক্তি বলে মেনে নিয়েছিলো। এটাও অন্নময়প্রাণ মানুষের একান্ত প্রকৃতিনির্ভরতার ফল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই অন্নদাত্রী প্রকৃতির পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতির এই স্বীকৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধানেও হারিয়ে যায়নি। কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো বা পরোক্ষ রূপে তা বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এরই এক চরম রূপ পাই অষ্টাদশ শতকের একটি রচনায়। 'মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি' রহিমুন্নিসা-রচিত এই বারোমাসীটিতে ভ্রাতৃবিয়োগবিধুরা কবির শোকানুভূতি প্রকৃতির ঋতুগত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে,—

…শ্রাবণে দাদুরী রব, ময়ূর ডাহুক সব
নিজ স্থানে সদা সুখ মন।
বিহারিতে ভ্রাতৃ সনে, না দিলেক কোন জনে,
নিবান্ধবী হৈনু তে কারণ ॥
ভাদ্রেতে সম্পূর্ণ জল, করে মহী টলমল,
কোথা মোর ভাই গুণমণি।
না দেখি এ চন্দ্র মুখ, টুক-টুক হৈল বুক,
তোমা খেদে স্থির নহে প্রাণি ॥…

এই বারোমাসীটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, এটি মধ্যযুগের গতানুগতিক বারোমাসী থেকে

'সম্পুর্ণ' না হইলেও, বহুলাংশে স্বতন্ত্র।' রহিমুন্নিসার রচনাটি বিশিষ্ট অবশ্যি কেবল তার বিষয়ের জন্যে। বিরহ বারোমাসী সাহিত্যের অন্যতমো প্রধান বিষয়। কিন্তু ভ্রাতৃবিরহের মতো বিষয় নিয়ে আর কোনো কবি বারোমাসী রচনা করেননি। তবে, চরিত্রলক্ষণে অন্যান্য বিরহবিষয়ক বারোমাসীর থেকে রহিমুন্নিসার বারোমাসীর কোনো পার্থক্যই নেই। জীবনের নিয়ামক শক্তিরূপে প্রকৃতির পরোক্ষ স্বীকৃতি এর ছত্রে ছত্রে লক্ষণীয়।

প্রকৃতিনির্ভরতার বহুবিধ ফল এবং বহুধা ব্যাপ্তির একটি দিক এখনো অনালোচিত রয়ে গেছে। এটি হল বারোমাসীর অন্যতমো প্রধান অবলম্বন ঋতুনির্ভর দেহজ কামনা। এবার এ-সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, মানুষ নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলো কৃষিযুগের একেবারে শুরুতেই। এবং তখন থেকেই সে প্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তন সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যে সৃষ্টির নব নব অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশ রচনা করে, তাও সে সেই সচেতনতা থেকেই পায়। কিন্তু তার সে-যুগের কল্পনা এবং জ্ঞানের মধ্যে কি উর্বরতাবাদ বা প্রজননতন্ত্রের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা চলে? ঠিক সেই অর্থের উর্বরতাবাদ তথা প্রজননতন্ত্র, যা একালের বিজ্ঞানী সমাজে প্রচলিত? উর্বরতাবাদের সাথে জড়িত রয়েছে একটি জৈব কামনা সম্পর্কে বিশেষ চেতনা। উক্ত কামনাই সৃষ্টির কারণ,—এমন জ্ঞান। আদি কৃষিযুগে এই জ্ঞান মানুষের কতোটুকু ছিলো এবং এটা সে কৃষিতে প্রয়োগ করতে শেখে কখন থেকে?

ইতঃপূর্বে সেপ্টম্যানের একটি উক্তির উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমি আভাস দিয়েছি, সৃষ্টির ব্যাপারে রহস্যময়ী নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য কল্পিত হওয়ার পর কৃষিসমাজে নানা ধরনের যৌন উৎসব বা উর্বরতাবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান দেখা দেয়। এর অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, কৃষির তথা প্রকৃতির সঙ্গে নারীর এজাতীয় কল্পিত যোগাযোগ ঘটবার ফলেই উর্বরতাবাদ জন্ম নেয়। বরং দেখা যায়, সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখবার জন্যে শুধুমাত্র নারীর ভূমিকাই যে যথেষ্ট নয়, তা মানুষ আগে জানতো না। আদিম মানুষ শুধু ভেবেছে,

সৃষ্টির সাথে নারীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই ধারণার মূল রহস্য তার কাছে ছিলো একেবারেই অজ্ঞাত।

রহস্যের সমাধান হয় শিকারযুগের শেষ দিকে—বা তার অব্যবহিত পরে, পশুপালনের সময়,—পশুর (সম্ভবতঃ পালিত পশুগুলির) প্রজনন ক্রিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে। যেসব মানবসম্প্রদায় শিকারীজীবন থেকে সরাসরি কৃষকজীবনে চলে আসে, তারা সৃষ্টির ব্যাপারে নরনারীর যৌথ ভূমিকার কথা জানতে পায় আরো পরে। যখন তারা পশু পালন করতে শেখে। এর আগে মানুষ নারীকে কৃষির কাজে লাগিয়েছে অন্ধ এক ধারণা নিয়ে। পশুপালনে অনভ্যস্ত কোনো কোনো মানবসম্প্রদায়ের কাছে সৃষ্টিতে পুরুষের ভূমিকার কথা একালেও অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস, নরনারীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তার ওপর সৃষ্টি নির্ভর করে না। প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা এই সেদিন পর্যন্তও ভাবতো, সৃষ্টির ব্যাপারে নারী অনন্যনির্ভর।

এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার স্থান এটা নয়। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যেসব দেবতা শিবের মতো উর্বরতাবাদের প্রতীক, তাঁদের আবির্ভাব ঘটে সম্ভবতঃ সমাজে নারীর প্রাধান্য লোপের সূচনার যুগে। কিন্তু সেটা যে সময়েই হোক, দেবীরা ততো দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। নারীপ্রাধান্যের অবসান ঘটবার পরও তাঁদের কিছুতেই আসনচ্যুত করা যায়নি।

তবে, উর্বরতাবাদ বা প্রজননতন্ত্রের জন্ম যখনই হোক না কেন, এ-সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানভিত্তিক ধারণায় জন্ম এবং সেই ধারণার সঙ্গে কৃষি তথা প্রকৃতির যোগাযোগ যে কৃষির কিছুটা উন্নত পর্যায়ে ঘটেছিলো, তা ধরে নিতে বিশেষ বাধা নেই। সম্ভবতঃ উক্ত পর্যায়েই—কিংবা তার কিছু আগে—মানুষ নারীর সঙ্গে প্রকৃতির আর একটি সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। শস্য উৎপাদনের নব নব পরিবেশ নিয়মানুগ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আসে এবং শস্যচারার ফলবান হওয়ারও বিশেষ সময় আর লক্ষণ আছে। এদিকে, নারীর মধ্যেও নিয়মিতভাবে সৃষ্টির কিছু কিছু পূর্বলক্ষণ দেখা দেয়। এবং তার সৃষ্টিক্ষমতাও বিশেষ বিশেষ সময়ের ওপর নির্ভরশীল।

সন্দেহ নেই, আবিষ্কারটির মূলে ছিলো প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান। এবং নারীর সৃষ্টিসম্ভাবনার লক্ষণগুলি সম্পর্কিত কিছু ধারণাও। বৎসরের কালবিভাগ এবং নারীর সৃষ্টিক্ষমতার কালবিভাগ দুই-ই হয়তো উক্ত সাদৃশ্যচেতনার ফলেই পরে 'ঋতু' নামে অভিহিত হয়েছে। মানুষের ঋতুনির্ভর দেহজ কামনার প্রকাশও সম্ভবতঃ এরই ফল, হয়তো এই সাদৃশ্য-চেতনাই নারীর দেহজ কামনাকে প্রকৃতির সৃষ্টিকামনা তথা সৃষ্টিলক্ষণের সাথে জড়িয়ে ফেলে। একটি লৌকিক বারোমাসীতে দেখতে পাই, প্রোষিতভর্তিকা নায়িকা নিজেকে শস্যচারার সঙ্গে তুলনা করেছে। কালের হিসেবে অত্যন্ত অল্পবয়স্ক এই বারোমাসীটি নিশ্চয়ই এমন এক সমাজের সৃষ্টি, যার অস্থিমজ্জায় মিশে ছিলো আদিম কৃষিনির্ভর সমাজের ধ্যানধারণা,—

বৈশাখ মাসেতে ফুল ফোটে নানা রাশি,
ভোমরায় খায় মধু ফুল মাঝে বসি।
ভোমরার গুন রবে দগধে পরাণ,
আমার ফুলের মধু কে করিবে পান। .
কার্তিক মাসেতে হয় হাতি শিরে মোতি,
ধান্য আদি শস্য যত হয় গর্ভবতী।
আমি অভাগীর হইল সমুখে খেয়াতি।...

প্রসঙ্গতঃ, উপরি-উক্ত সাদৃশ্যচেতনার মূলে মানুষের মনে নারী এবং প্রকৃতির সৃষ্টিসম্ভাবনা-সম্পর্কিত যেসব জ্ঞান আর ধারণা ছিলো, সেগুলিও তার সামাজিক এবং মানসিক জীবনকে কিছুটা প্রভাবিত করে। একথা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রকৃতি কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনলক্ষণের ব্যর্থতায় পীড়াদায়ক এবং সমাজ জীবনে সৃষ্টিধারা রক্ষার ব্যাপারে নারীর ব্যর্থতা দুঃখজনক। দুটি ক্ষেত্রেই সৃষ্টির সম্ভাবনা মানুষের মনে যে আনন্দ জাগায়, তার কথাও নতুন করে বলতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমার লক্ষ্য শুধু একটি তথ্য পরিবেশন। সেটি নারীর সৃষ্টিসম্ভাবনার দেওয়া আনন্দের সাথে জড়িত। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেও ঢাকা জেলার ভাগ্যকূল অঞ্চলে হিন্দু সমাজের কোনো অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়ের প্রথম ঋতুস্রাবের সময় উৎসব করবার এবং সামাজিক ভোজ দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। আনন্দটি একদিন

মানুষের সামাজিক জীবনে যে কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এই তথ্যটি থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

সে যাই হোক, নারী আর প্রকৃতির পরিবর্তনের সূক্ষ্ম জ্ঞান মানুষকে কেবল প্রকৃতির সৃষ্টিলীলার ব্যর্থতা আর সাফল্যের সঙ্গে নারীর দেহজ কামনার ব্যর্থতা-সাফল্যের স্থূল সাদৃশ্য কল্পনা করতেই উৎসাহ দেয়নি। প্রাকৃতিক সৃষ্টিলীলার নানা লক্ষণ, অনুষঙ্গ আর অনুকারী—যেমন, ফুল, পাখী, মেঘ, বিশেষ আবহাওয়া ইত্যাদিকে সে নারীর জীবনে কামনা-বৈচিত্র্যের কারণ এবং প্রতীক বলেও ধরে নিয়েছে। কোনো কোনো বারোমাসীতে প্রেমে বিরহে খাদ্যাখাদ্য বিচারের একটা প্রবণতা দেখা যায়। এ-প্রবণতাও হয়তো পরোক্ষভাবে উপরি-উক্ত জ্ঞানের ওপরই নির্ভর-শীল। যেহেতু প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সাদৃশ্য কল্পনা মানবেতিহাসের প্রথম দিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো, এজন্যে উল্লিখিত সংস্কার-বিশ্বাস নারীমনেই সবচেয়ে বেশী প্রশ্রয় লাভ করে। এবং নারীপ্রাধান্য লোপ পাওয়ার পরও, সমাজের মূল কাঠামো সম্পূর্ণ পরিবর্তিত না হওয়ায়, নারী-সম্পর্কিত অন্যান্য সংস্কার-বিশ্বাসের মতো এগুলিও এখনো সমাজের একাংশের চিন্তাভাবনায় নিয়ামক শক্তি রূপে জড়িয়ে রয়েছে।

বারোমাসীতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক সৃষ্টিলীলার সকল লক্ষণ, অনুষঙ্গ বা অনুকারী সম্পর্কে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্কীর্ণ পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি কথা অবশ্য উল্লেখ্য। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লক্ষণ-অনুষঙ্গাদিকে গ্রহণ করা হয়েছে কামনার তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে। প্রাকৃতিক সজীবতার অন্যতমো প্রধান হেতু মেঘের এমনি স্বীকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি সুন্দর উদাহরণ পাই রায় গুণাকরের রচনায় বিদ্যার উক্তিতে—

…আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥ ··

বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে, প্রকৃতিনির্ভর দেহজ কামনার এহেন বোধ এক সময় ধর্মবিষয়ক বারোমাসীকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো। পদাবলীসাহিত্যে এর অজস্র প্রমাণ রয়ে গেছে। খাঁটি বাংলা বারোমাসীগুলির বর্ষাকালীন বিরহবোধের সঙ্গে তুলনা করবার জন্যে

'পদকল্পতরু'-তে সংকলিত 'সিংহভূপতির চাতুর্মাস্য' শীর্ষক একটি রচনা থেকে এখানে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি, –

…আওয়ে শাওন বরিখে ভাঙন ঘন সোহায়ল বারি।
পঞ্চশর শর ছুটত রে কৈছে জীয়ে বিরহিণী নারী॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো কাকো কহি হই দুঃখ।
নিডরে ডর ডর ডাকে ডাহুকি ছুটয়ে মদন কন্দুক॥

কিন্তু উপরি-উক্ত লক্ষণ-অনুষঙ্গাদি সবচেয়ে বেশী আঁকড়ে ধরে বিরহ-মূলক অনুভূতিকে। এসব ক্ষেত্রে বিরহিণীর বা প্রিয়সঙ্গবঞ্চিতা নায়িকারা প্রকৃতির পরিবর্তন এবং তার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সঙ্গে আপন আপন অবস্থার তুলনা করে নিজেদের রীতিমতো অসহায় বলে ভেবেছে। প্রকৃতির সৃষ্টিসাফল্য দেখে তাদের সাময়িক ব্যর্থতা হয়ে ওঠে আরো প্রখর। এটা প্রেমবিষয়ক বারোমাসীগুলির মূল সুরেরই অঙ্গ। ওপরে এর দুই-একটি প্রমাণও দিয়েছি। এখানে 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'-র কমলার বারোমাসী থেকে আরো একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি,—

...আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার॥
ধনু হাতে লইয়া মদন পুষ্পেতে লুকায়।
বেহুড়া যুবতী ঘরে না দেখে উপায়॥...

বর্ষা আর বসন্তে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় অন্যান্য ঋতুর তুলনায় অনেক বেশী স্পষ্ট এবং মনোরম। বারোমাসীর কবিরাও তাই এই দুটি ঋতুর বর্ণনায়ই সর্বাধিক উৎসাহ বোধ করেছেন। এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্যও হয় ব্যাপকতরো। বিপুল বারোমাসীসাহিত্য থেকে দুই-চারটি উদ্ধৃতি দিয়ে একথার সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে, বর্তমান প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলি থেকে এর অন্ততঃপক্ষে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

এখানে আর একটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। প্রকৃতির বর্ণনা তো পৃথিবীর প্রাচীন-আধুনিক কোনো সাহিত্যেই বিরল নয়। কিন্তু এ-বর্ণনা বারোমাসীকে এতো বেশী আশ্রয় করলো কেন?

বারোমাসী যে মূলতঃ প্রকৃতিনির্ভর সমাজের সৃষ্টি এবং আশ্রিত, তা আমি ওপরে একাধিক বার বলেছি। অতিরিক্ত প্রকৃতিনির্ভরতার ফলে

সম্ভবতঃ কোনো কোনো মানব সম্প্রদায় এক সময় বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকৃতি-পূজোর বা ব্রত উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করে। এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তাদের পক্ষে বারোমাসীর আঙ্গিকে ব্রত-পূজোর মন্ত্র বা কথা রচনায় হাত দেওয়াও বিচিত্র নয়। হয়তো এর মাধ্যমে তারা চাইতো প্রকৃতিকে তুষ্ট করে তার অনুগ্রহ পেতে। গোটা বৎসর বা তার বিশেষ কোনো অংশের বর্ণনা দিয়ে জীবিকার ব্যাপারে সাফল্য লাভের জন্যে প্রার্থনা জানানোও অসম্ভব ছিলো না। ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো উপজাতি সমাজে এখনো এক ধরনের সঙ্গীতময় বাষিক অনুষ্ঠান করবার রেওয়াজ আছে।

বারোমাসীর জন্ম সংক্রান্ত উপরি-উক্ত অনুমান সত্যি হলে অবশ্যি আরো স্বীকার্য, বারোমাসীর আঙ্গিকে মন্ত্র বা কথা রচনা বিশেষ কোনো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলো না। কেননা. বারোমাসী উপমহাদেশের অনেক ভাষাতেই রয়েছে। তবে বাংলার মতো আর কোনো অঞ্চলে এতো বেশী বারোমাসী দেখা যায় না। হয়তো এই অঞ্চলেই প্রকৃতিপূজক সম্প্রদায়গুলির ভিড় ছিলো সবচেয়ে বেশী। কিংবা হয়তো বাংলা সাহিত্যের সর্বাগ্র এবং সর্বাধিক অগ্রগতিই এর জন্যে দায়ী।

কিন্তু দায়ী যা-ই হোক, প্রকৃতিপূজক সম্প্রদায়গুলি কেবল প্রকৃতি-পূজোতেই সন্তুষ্ট থাকেনি। বারোমাসীসাহিত্যই সাক্ষ্য দেয়. তারা অন্যান্য ধরনের পূজো-অর্চনাকেও প্রভাবিত করেছে। এই সব পূজো-অর্চনাতেও প্রকৃতিনির্ভর কৃষিসমাজের চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর মেলে।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন।

বারোমাসীতে আমরা যে-সমাজের সাক্ষাৎ পাই, তার মূল সর্বাংশেই এদেশে নিহিত, এমন ধারণা করলে ভুল হবে। অতীতের বাংলায় নানা স্থান থেকে আগত মানব সম্পদায়ের মিশ্রণ ঘটে। তার ফলে তাদের সংস্কার-বিশ্বাস আর রীতি-প্রথারও। এমনিতেও প্রতিবেশী সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে এসবের বিনিময় হয়ে থাকে। এই সব কারণে বাংলা-ভাষী সমাজে বাইরের বহু জিনিস আছে। বাংলার মাটির গুণে আজ হয়তো তারা পুরোপুরি বাঙালীর বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সঠিক পরিচয়ের জন্যে তাদেরও মূলের সন্ধান করা দরকার।

এক দিকে বাংলার বিভিন্ন আদিম মানব সম্প্রদায়ের সংস্কার-বিশ্বাসের মিশ্রণ, অন্য দিকে বহিরাগত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাদের সংস্কার-বিশ্বাসের বিনিময়, এই দুইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাপ পাওয়া যায় ধর্মবিষয়ক চিন্তায় আর ক্রিয়ায়।

নানা মতের সংঘাতে ক্রমান্বয়ে সমাজে এক-এক সময় হয়তো এক-এক সম্প্রদায় জয় লাভ করে। কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ই যেন স্বাধীন সত্তায় বলবান বা সম্পূর্ণরূপে অন্যনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। বরং মিশ্রণের ধারা সব সময়ই অব্যাহত থেকেছে এবং কালক্রমে ধর্মীয় সংস্কার-বিশ্বাসও এমন একটি রূপ নিয়েছে যা অনেক ক্ষেত্রেই আপন সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম। (বলা প্রয়োজন আমার এই বক্তব্য বর্তমান আলোচনার জন্যে হিন্দু ধর্ম-সম্পর্কিত। যে কারণেই হোক, মুসলিম সমাজের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা বা সংস্কার-বিশ্বাসের স্বাক্ষর বারোমাসীসাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে।) কিন্তু, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে, এ-অবস্থায়ও 'বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক বা অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতি যখন প্রশস্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির আওতায় এসে নতুন করে ঘর বাঁধে, তখন আদি ও অনার্য জীবন-পর্বের কোন ধারা, কোন আদর্শ, কোন বিশ্বাস সংস্কারই বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়নি।'

আমরা দেখেছি, বারোমাসীর প্রধানতমো বৈশিষ্ট্য বৎসরের বিভিন্ন মাস বা ঋতুর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বক্তার অনুভূতি আর বক্তব্যের সম্পর্ক স্থাপন। এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির সাথে আদিম মানুষের মানসিক আত্মীয়তা, যা লৌকিক ধর্মের অঙ্গ। অর্থাৎ বারোমাসীতে লৌকিক ধর্মের ছাপ পড়তে শুরু করে একেবারে গোড়া থেকেই। একটি বারোমাসীতে বলা হয়েছে,—

…(এই) পোষ মাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়।
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায় ॥…

এই বারোমাসীটি এখনো বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে চাষবাসের সময় চাষীদের দ্বারা গীত হয়। এর শেষাংশে আছে কৃষি-সমাজের চিরকালের কামনা, 'এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা

ভরে।' রচনাটির মধ্যে যেন আদিম মানব সমাজের যাদুবিশ্বাসের রেশ রয়ে গেছে। সেকালের মানুষ জীবন এবং জীবিকার নানান কাজের আগে সেগুলির কৃত্রিম অনুষ্ঠান বা অভিনয়ের মাধ্যমে আশা বা কামনা—এমনকি, বিশ্বাস করতো. এজাতীয় অনুষ্ঠানের যাদুশক্তি আছে এবং সে-শক্তির বলে তার আসল কাজে সাফল্য আসবে। হয়তো কোনো সময়ে কৃষিকাজেরও কৃত্রিম অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিলো। কিন্তু কালক্রমে অভিনয় এবং আসল অনুষ্ঠান এক হয়ে যায় এবং তার সাথে অন্যান্য জিনিষও মেশে। লক্ষণীয় ওপরের উদ্ধৃতিটুকুতে একই সঙ্গে বাস্তুদেবতা আর বসুমতীর উল্লেখ আছে। অবশ্যি, প্রাচীন কৃষিসমাজেও বাস্তুদেবতা বা বসুমতী—কেউই হয়তো অনন্যনির্ভর ছিলেন না। বাস্তুদেবতা বলতে এখন আমরা বুঝি মনসাকে। আর ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়, 'মনসা-কাহিনীর সূত্রপাত বৈদিক যুগে এবং পূর্ব-ভারতে বৈদিক যুগ শেষ হইবার আগেই তিনি বাস্তুদেবতায় ও গ্রামদেবীতে পরিণত হইয়াছিলেন।'

শিব সম্পর্কে আমি অন্য প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, বাংলাভাষী অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পরাজয়ের পর কৃষির দেবতা রূপে দেখা দেন। এবং তারপর ক্রমে ক্রমে চাষীসমাজে তিনি হয়ে ওঠেন অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী। এবং তখন আসন পান অনেক ওপরে। এমনকি, ব্রাহ্মণসমাজেও। অথচ বৈদিক ধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ সমাজে আগে শিবের মাহাত্ম্যকীর্তন ছিলো নিষিদ্ধ। এখানে আরো উল্লেখ্য, এ-সমাজে তাঁর পত্নী দুর্গাও পূজিত হতে থাকেন। যদিও আগে তিনিও ছিলেন লৌকিক পদ্ধতিতে পূজিত কৃষিসমাজের দেবী। রংপুরের চাষীসমাজে প্রচলিত একটি বারোমাসীতে লৌকিক পদ্ধতি অনুযায়ী দুর্গার পূজো করবার কথা আছে,—

> ···আশ্বিন মাসে হে কন্যা দুর্গা অষ্টমী।
> ধানে দুর্বায় করে পূজা বিধবা ব্রাহ্মণী॥
> পূজুক পূজুক পূজা মাগিয়া লব বর।
> আমার সাধু ফিরলে দিব লক্ষ ছাগল॥···

এখানে দুর্গার উদ্দেশ্যে লক্ষ ছাগল বলি দেওয়ার ইঙ্গিতে বোঝা যায়, তিনি কেবল কৃষির দেবীই ছিলেন না, বারোমাসীটির রচনাকালে

তাঁকে ভক্তদের অন্যবিধ কামনা পূর্ণ করবার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হত। এই দ্বৈত রূপ তিনি নিশ্চয়ই গোড়াতেই পাননি।

অবশ্যি, শক্তির দেবী রূপে তাঁর পূজো আরম্ভ হয় বহু আগে। বাংলাভাষী অঞ্চলে শক্তিদায়িনী হিসেবে তাঁর ব্যাপক পূজোর সূচনা ঘটে মধ্য যুগে। এই সময়, মুসলিম শাসনের সূত্রপাতের পর, স্থানীয় এবং বহিরাগত রাজশক্তি আর সংস্কৃতির সংঘর্ষে দেশে স্থানীয় সমাজে একটি অচলাবস্থা দেখা দেয়। এর অবসান ঘটে প্রায় তিন শতাব্দী পরে। মুসলিম শাসনে ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ বর্গের মানুষরা ইতি-মধ্যে নতুন রাজশক্তির প্রতি বিমুখ হয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিম্ন বর্গের মানুষের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতরো করবার প্রয়াস পায়। এই প্রয়াসের দরুন কিছু ধ্যান-ধারণা আর সংস্কার-বিশ্বাসের পারস্পরিক বিনিময় চলে এবং যেসব দেবদেবী আগে সঙ্কীর্ণ সমাজে পূজ্য ছিলেন, ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে কিংবা হয়তো অপরিবর্তিত অবস্থায়ই—তাঁদের ব্যাপকতরো পূজো আরম্ভ হয়।

বস্তুতঃ, এই যুগ কেবল হিন্দু সমাজেরই নবতরো আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ নয়, নানান লৌকিক দেবদেবীরও নতুনতরো প্রতিষ্ঠার যুগ। বাংলা সাহিত্যে বারোমাসীর সর্বাধিক প্রকাশও উক্ত সময়েই ঘটে। এজন্যে, তখনকার দেবদেবীদের বহু কথা বারোমাসীতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, অভিজাত শাখার বারোমাসী তখন যেন প্রায় পুরোপুরিই ধর্মাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। এই যুগ থেকেই দুর্গাকে আমরা অম্বিকা, চণ্ডী বা চণ্ডিকা (সেন-যুগে বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিতা), বনদুর্গা, নবদুর্গা, কাত্যায়নী ইত্যাদি নামে এবং রূপে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পূজো পেতে দেখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব রূপে তাঁর পূজোর সময় আশ্বিন মাস তথা শরৎ কাল। এক সময় যার পর পরই আসতো বৎসরের প্রথম মাস বা মার্গশীর্ষ। তখন ঘরে নতুন ফসল এলে দুর্গাপূজোর সঙ্গে সঙ্গে—অথবা তার কিছু পরে শুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব। বারোমাসীর কবিরা তাই আশ্বিন মাস আর মার্গশীর্ষের সুখপুণ্যকথায় মুখর। দ্বিজ মাধবের ভাষায়,—

...আশ্বিন মাসেতে কন্যা জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয়॥...

বৈষ্ণব কবি লোচন দাস বা লোচনানন্দ দাসও নবান্নের কথা ভুলতে পারেননি,—'আঘনে নবান্ন করে নতুন তণ্ডুলে।' এবং কবিকঙ্কনের ফুল্লরার বারোমাসীতে অন্নচিন্তাহীন মার্গশীষ'কে দেওয়া হয় একেবারে ভগবানের আসন,—

…মাস মধ্যে মার্গশীষ' নিজে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥…

এমন সুখের সময়ে পূজিতা দেবী দুর্গা লৌকিক ধর্মে সব রূপেই সমৃদ্ধির প্রতীক, কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা। তবু, শক্তির দেবী হিসেবে তাঁর উদ্দেশে যে বলিদানও করা হত, বারোমাসীতে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। এখানে ফুল্লরার একটি বারোমাসী থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি,—

.. আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥…
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥…

আদিম কৃষিজীবী মানবসমাজের দেবী হিসেবে দুর্গার পরিচয় সবচেয়ে স্পষ্ট বোধ হয় বনদুর্গা নবদুর্গা এবং আকাল দুর্গায়। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে, 'এঁদের আকৃতি-প্রকৃতি, এঁদের পূজোপকরণ ও পূজা-পদ্ধতির স্বরূপ আলোচনা বিশ্লেষণ করলে একথা বুঝতে আদৌ দ্বিধা আসে না যে, একালের যে সব শাস্ত্রীয় দেবীমূর্তির পূজা আমাদের সভ্য সংস্কৃত সমাজে প্রচলিত, তাদের সকলেরই উৎস এই জাতীয় আদিম কল্পিত তথাকথিত দেবদেবী-চরিত্র।'

'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র কমলার বারোমাসীতে দেখি, বনদুর্গার পূজোর সময় প্রাতঃকাল। সময়টি মনোরম। কিন্তু একালে বনদুর্গা যে-মূর্তিতে পূজিত হন তা রীতিমতো ভয়ানক। শাস্ত্রবর্ণিত রূপেও অবশ্যি তিনি আদৌ সুদর্শনা নন বরং কালীর মতো। তিনি ঘূর্ণমান মহালোচনা, ভীমমুখী, জটাধারিণী এবং সর্পভূষিতা ভয়ঙ্করী। বনদুর্গার একটি স্তোত্রে তাঁর মূর্তির আরো বিশদ বর্ণনা আছে,—

দেবীং দানব মাতরং নিজ মদা ঘূর্ণম্মহালোচনাং
দংষ্ট্রা ভীমমুখীং জটালি বিল সম্মৌলিং কপালস্রজম।
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্র হারোজ্জ্বলাং
সর্পাবদ্ধ-নিতম্ববিম্ব বিপুলাং বানান্ ধনবিভ্রতীম্ ॥

কমলার বারোমাসীতে আকাল দুর্গার পূজোর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তাঁর মূর্তি বনদুর্গার মূর্তির মতো ভয়ঙ্কর নয়,—

…আইল চৈত্রি রে মাস আকাল দুর্গা পূজা।
নানা বেশ করে লোকে নানা রঙ্গের সাজা॥
ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায়।
ঝাঁক ঝাঁক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়॥
মণ্ডপে মায়ের মূর্তি দেখিতে সুন্দর।
কারুয়া টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর॥…

দুর্গার—এবং তাঁর সঙ্গে শিবের—অনাড়ম্বর পূজোর পদ্ধতিও যে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিলো, তার প্রমাণও একাধিক বারোমাসীতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি শ্যামদাসের একটি রচনায় রাধার জবানিতে গোপিকাদের হরগৌরী পূজোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এ-ধরনের পূজো কি তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো?

…আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এই তিন পুরে।
আমরা আরোপি ঘট যমুনার তীরে॥
অখণ্ড শ্রীফল-দল অগুরু চন্দনে।
অনেক আরতি কৈনু গৌরী ত্রিলোচনে॥…

চণ্ডী, ষষ্ঠী বা কাত্যায়নী রূপে দুর্গা মূলতঃ কল্যাণী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এসব রূপে তিনি সন্তানদায়িনী এবং সন্তানের রক্ষাকারিণী। বহু বারোমাসীতে তাঁর রূপগুলির উল্লেখ আছে। কার্তিক পূজো বা ব্রতও অনুষ্ঠিত হয় 'পুত্রের লাগিয়া।' অর্থাৎ কার্তিক ব্রত পুত্রেষ্টি যজ্ঞের এক লৌকিক রূপ। চট্টগ্রামের প্রচলিত 'নিমাইয়ের বারোমাসী' শীর্ষক একটি রচনায় দেখি, চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবী সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে কেবল শিব আর ষষ্ঠীর পূজোই করেননি, চন্দ্র-সূর্য, মনসা, ভদ্রকালী, গোবিন্দ-তুলসী এবং 'শতেক সন্ন্যাসী'-র কাছেও হাত পাতেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, এই সব

পূজো 'অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলতঃ শুদ্ধ যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজা, যে-পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত।' পাঠক মাত্রেই জানেন, শস্যের দেবদেবীর পূজোর মতোই এ-সমস্ত পূজোও বহু প্রাচীন লৌকিক ধর্মের স্মারক।

মধ্য যুগের বাংলায় কোনো কোনো অঞ্চলে কার্তিক পূজোও সম্ভবতঃ অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। কমলার বারোমাসীতে এই পূজো উপলক্ষে আয়োজিত যে আনন্দোৎসবের বর্ণনা পাই, তা দুর্গা পূজোর আনন্দোৎসবের থেকে কোনো অংশে কম নয়,—

…কার্তিক মাসেতে দেখ কার্তিকের পূজা।
পরদিমের পট আঁকি বাতির করে সাজা॥
সারা রাত্রি হুলামেলা গীতি বাণ্ডি বাজে।
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে সাজে॥…

কমলার বারোমাসী যেন মধ্য যুগের বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের এক বিশ্বকোষ। এতে কেবল চণ্ডী, ষষ্ঠী, দুর্গা আর কাত্যায়নীর পূজো এবং কার্তিক ব্রতর কথাই নয়, লক্ষ্মী, মনসা আর কালীর পূজোর কথাও সবিস্তারে বলা হয়েছে। এই বারোমাসীটিতে কৃষির দেবী লক্ষ্মীর পূজো যেন নবান্ন উৎসবের নামান্তর,—

.. সেই ত' কার্তিক গেল আগন আইল।
পাকা ধানে সরু শস্যে পৃথিবী ভরিল॥
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া।
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া॥ ..
জয়াদি জুকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে॥
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পরান।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ॥

এখানে আভাসে নবান্ন উৎসবের কথাও বলা হয়েছে। ধান মাথায় নিয়ে বাড়ী আসাও শুধু লক্ষ্মীপূজোর প্রস্তুতি নয়। চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ভাষায়, 'ক্ষেতে ধান পাকিয়া উঠিলে সেই পাকা ধানের শিষ প্রথম ঘরে তোলা—সেও একটা ছোটখাট উৎসব। ইহারই নাম আগ লওয়া বা 'আউনি-বাউনি।'

কমলার বারোমাসীতে মনসা এবং কালীর পূজোর যে-বর্ণনা আছে, তাও লক্ষ্মী এবং কার্তিকের পূজোর বর্ণনার মতো।

'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। তাই, কমলার বারোমাসীর কাল সম্পর্কে আমরা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পোঁছতে পারিনে। তবে, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'মধ্যযুগের বাংলায় যখন সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্যের চর্চা হইতেছিল, এই গীতিকাগুলি তাহারই সমসাময়িক।' তাঁর মত যদি সত্যি হয়, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, মধ্য যুগের বাঙালী হিন্দু সমাজে কমলার বারোমাসীতে বর্ণিত সমস্ত পূজোই প্রচলিত ছিলো।

ডঃ ভট্টাচার্য অবশ্যি কমলাকে হিন্দুকন্যা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাঁর উদ্ধৃত উক্তির জের টেনে—এবং অন্যান্য মনীষীর মত না মেনে—'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,—

> ···চরিত্রগুলি হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে; কারণ হিন্দুর সমাজ-নীতি যেমন ইহারা স্বীকার করে নাই, মুসলমানের সমাজ-নীতিও ইহাদের মধ্যে অস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ইহাদের যদি কোন পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, ইহারা মানুষ।···

বর্তমান আলোচনায় আমি বারোমাসীর ধর্মবিষয়ক তথ্যগুলিকে হিন্দুধর্ম-সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছি। কমলার বারোমাসীর তথ্যগুলিকে ব্যতিক্রম রূপে ধরবার কোনো কারণ দেখিনে। ডঃ ভট্টাচার্যের কথার উত্তরে বলা যায়, কমলার বারোমাসী তথা 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র অন্যান্য রচনায় যেসব ব্রতপূজোর উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট কালের পরে অবিকৃত বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বৃহত্তরো হিন্দুসমাজে ঢুকে পড়ে। এজন্যে, বারোমাসীসাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে এগুলিকে এখন হিন্দু ধর্মে'র সঙ্গে জড়িত করলে অন্যায় হবে না।

অন্য দিকে, ডঃ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য পণ্ডিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র রচনাকাল সম্পর্কে' যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা মেনে নিলে কমলার বারোমাসীর বেশ কিছু তথ্যকে আমরা মধ্য যুগের সাথে জড়িত করতে পারবো। যেমন, নরবলির কথা। বারোমাসীটির সাক্ষ্য, মধ্য যুগের

বাংলায়, মুসলিম আমলেও, প্রায় প্রকাশ্যেই নরবলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো,—

...ঢাক ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পরে।
আজি গো কিসের পূজা দেবের মন্দিরে ॥
কালীপূজা হয় আজি দেবের মন্দিরে।
নরবলি হৈব আজি মায়ের দুয়ারে ॥

কমলার বারোমাসীতে বর্ণিত এই কালীপূজোয় বাদ্য বাদনের জন্যে নিয়োজিত হয়েছিলো কোচ সম্প্রদায়ের লোক।

বর্ণনাটিতে কালী পূজোর যে আড়ম্বরের উল্লেখ দেখি, তা মনসা পূজোর অনুষ্ঠানেও ছিলো। এর প্রমাণ কমলার উক্তিতেই রয়েছে। সে আমাদের জানায়, মনসা পূজো ছিলো প্রায় সর্বজনীন এবং এই পূজোর সময় নৃত্যবাদ্যাদির ব্যাপক ব্যবস্থা করা হত,—

...একদিন শুনি নগরের মধ্যখানে।
ঢাক ঢোল বাজে আর নাচে সর্বজনে ॥
দাসদাসীগণ যত আনন্দে অপার।
অঙ্গেতে বসন পরে যা আছে যাহার ॥
কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ান্যা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে ॥...

মনসাও আদিম কৃষিজীবী সমাজে প্রচলিত উর্বরতাবাদের প্রতীক এবং তিনি সেখানে থেকেই বৃহত্তরো সমাজে চলে আসেন। বাংলায় তাঁর প্রতিষ্ঠা যে বহু কাল আগেই শুরু হয়েছিলো, তা আমি ইতঃপূর্বেই বলেছি। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য, আরো অনেক দেবদেবীর মতো তিনিও মধ্য যুগের আগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাননি। লৌকিক দেবদেবীরা নিশ্চিন্ত আসন লাভ করেন হিন্দুসমাজের উচ্চ বর্গ আর নিম্ন বর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতরো হওয়ার সময়। এবং তখনও তাঁদের নতুন মর্যাদা লাভের পথ একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না। তাঁদের সকলকেই কিছু কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সবচেয়ে বেশী সংগ্রাম করেন সম্ভবতঃ মনসা। চাঁদ সদাগরের সাথে তাঁর দ্বন্দ্বের কথা আমরা সবাই জানি। সেই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণা মনসাকে চোখের জল কিছু কম ফেলতে হয়নি। বেহুলার

কাহিনী নিয়ে রচিত প্রায় সকল বারোমাসীতেই এর প্রমাণ রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের কবি শ্রীহট্টের ষষ্ঠীবর দত্তের 'মনসামঙ্গল'-এ একাধিক বারোমাসী আছে। একটিতে মনসা সখী নেতার কাছে যেভাবে তাঁর লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাতে তাঁর মনের জ্বালাও প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান আলোচনায় ঠিক প্রাসঙ্গিক না হলেও পাঠকদের জন্যে আমি সে-বর্ণনার কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি,—

...আশ্বিন মাসের দিনে নবদুর্গার পূজা।
সবানে পূজিল চাঁদ রাজা॥
চান্দে মোরে না দেয় পুষ্পপানী।
মোরে গালি পাড়ে চান্দে—লঘুজাতি কানি গো॥...
অগ্রায়ণ মাসেত চান্দে মোরে পাইল পথে।
বেয়াইন বলিয়া মোর ধরে বাম হাতে॥
মোর ঝিউ বিয়া কৈল চান্দের কোন পুতে গো॥...

মানুষের তেজস্বী স্বাধীনচিত্ততার মহান প্রতীক চাঁদ সদাগর অবশ্য শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। একে একে সাত পুত্রের মৃত্যুতেও তিনি অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরই পুত্রবধূ বেহুলার সাহায্যে মনসা বাংলায় চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান। মানুষের মর্যাদা এতে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে। অকালবিধবা বেহুলা আপন গরজে মনসার কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে সতী বলে অশেষ খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর জিদের ফলে শ্বশুর চাঁদ সদাগরেরও কিছু লাভ হয়েছিলো। কিন্তু সে-লাভের তুলনায় মানুষের পরাজয় অনেক বেশী। আমরা সেই পরাজয়ের কথা মনে রাখিনি। বাংলার মানুষ সব ভুলে গিয়ে মুখর কেবল বিভীষণের নারী-সংস্করণ বেহুলার তথাকথিত সতীত্বের কথায়, যিনি কুলবধূ হয়েও শ্বশুরের মর্যাদাকে উপেক্ষা করেছিলেন। বারোমাসীসাহিত্যও তাঁরই সমর্থক।

মধ্য যুগের ইতিহাসে অবশ্যি মনসার জয়ের একটি জনলোভন তাৎপর্য আছে। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মতো তাঁর জয়েও তখনকার সমাজের ধর্মীয় কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ঘটে ছিলো এবং তা অবশ্যই ভিন্নতরো সমাজ গঠনে সাহায্য করে। তবু আমরা বলতে বাধ্য, ইতঃপূর্বেই

ধর্মের অসংখ্য নিগড়ে বন্দী সমাজকে মুক্তি দেওয়া দূরে থাক, মনসা তার শৃঙ্খলের ভার আরো বাড়িয়েছিলেন। বেহুলার কাহিনী থেকে যেসব সংস্কার জন্ম নেয়, সেগুলির মধ্যেই একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র মলুয়ার অষ্টমাসীতে আমরা দেখি, হীরাধর বেহুলার কথা স্মরণ করেই শ্রাবণ মাসে কন্যা মলুয়ার বিয়ে দিতে চাননি,—

…শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাড়ি হইছে ॥…

এতোক্ষণ আমরা বারোমাসীতে ধর্মের যে উল্লেখ দেখলাম, তা মোটামুটি হিসেবে পরোক্ষ। বক্তারা এসব ক্ষেত্রে ধর্মের কথা বলেছেন অন্য বক্তব্যের প্রসঙ্গে। কিন্তু বারোমাসীসাহিত্যের একটি শাখা এক সময় প্রত্যক্ষভাবেই ধর্মপ্রচারের মাধমে হয়ে ওঠে।

এই প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বৈষ্ণব কবিরা। মধ্য যুগে তাঁরা কাব্যের আঙ্গিকের মতো বারোমাসীর আঙ্গিকেও সরাসরি ধর্মপ্রচার শুরু করে দেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের বাইরে ষষ্ঠীবর দত্তের মনসার বারোমাসী, ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র কর্তৃক রচিত 'শিবায়ণ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত রম্ভা-দুর্গার বারোমাসী ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোনো বিশিষ্ট বারোমাসী আমরা প্রত্যক্ষভাবে ধর্মপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখিনে। এবং এসব বারোমাসীর বক্তব্যও খুব বেশী ঋজু নয়।

বৈষ্ণব ধর্মের অভিনব প্রেমাদর্শে বাংলা সাহিত্যের লৌকিক এবং অভিজাত উভয় শাখারই যথেষ্ট উন্নতি এবং সমৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলীর একটি বড়ো দোষ ছিলো। ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্যই থাকে কথায় কথায় ধর্মপ্রচার। বৈষ্ণব কবিরাও সাহিত্যের কোনো শাখাতেই দ্বিধাহীন ভাষায় নিজেদের মত প্রচারে সঙ্কোচ বোধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রামে প্রচলিত 'রাধার বারোমাসী' শীর্ষক একটি লৌকিক রচনার শেষাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি,—

…রাধা বারোমাসী যেই পড়ে আর শুনে।
অন্তস্থানে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥

বারোমাসীর একটি বিরাট অংশের বিষয়বস্তু প্রেম। বৈষ্ণবসাহিত্যের বারোমাসীতেও এই বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। কিন্তু সেখানে প্রেম মূলতঃ আধ্যাত্মিক। ষোড়শ শতকের কবি শ্যামদাসের গ্রন্থ 'ভাগবত'-এর অন্তর্ভুক্ত রাধিকার বারোমাসীতে রাধার বিরহকে আধ্যাত্মিক রূপ দানের চেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট,—

…সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
স্মঙরি' স্মঙরি' কাঁদি এ ভব-তরঙ্গে ॥
দুঃখী শ্যামদাস গায়।
চিত্ত দৃঢ়াইলে গোপী পাবে শ্যামরায় ॥

বৈষ্ণবসাহিত্যে—এবং তার বাইরেও -কিছু কিছু বারোমাসীতে হোলি আর রাসের উল্লেখ রয়েছে। এগুলি বর্তমানে মূলতঃ বৈষ্ণব ধর্মের উৎসব-অনুষ্ঠান। কিন্তু এদের মূল নিহিত উর্বরতাবাদে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক ভারতীয় উপমহাদেশের সব জায়গায় নেই। অথচ রাস-হোলি প্রায় সকল অঞ্চলেই আছে। বিশেষ করে, অনুন্নত লোকসমাজে এ-যুগেও উৎসব দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সব দেখে পণ্ডিতরা ধরে নিয়েছেন, আদিম মানব-গোষ্ঠীর উর্বরতাবাদ বা প্রজনন শক্তির পূজোর ওপর রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রলেপ দিয়েই হোলি এবং রাসের মতো উৎসব তৈরী হয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললে ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাদির আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হোলি, রাস এবং উপরি-উক্ত অন্যান্য ব্রত-পূজোর মূলে উর্বরতাবাদ বা প্রজনন শক্তির পূজো থাকায় এবং এ-ধরনের ব্রত-পূজো ভারতীয় উপমহাদেশের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও অনেকটা আবিষ্কৃত অবস্থায় প্রচলিত রয়েছে দেখে অনেকেই বারবার দাবী করেছেন, এগুলি উপমহাদেশের বিশিষ্ট জিনিষ। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তো নিঃসঙ্কোচেই বলেন,—

> …পূজা ও উৎসবের এই জাতীয় ধারায় অনার্য ও অব্রাহ্মণ্য ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আর্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, লোক-সংস্কৃতির উপর পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বারমাস্যার পূজা পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠানের বিচিত্র পর্যায়ে এই যে আর্য ও অনার্য ধর্ম, লোকাচার ও শাস্ত্রাচার, গ্রন্থ ও

মন্ত্রশাসিত জীবনের পরিচয় নিহিত, সমগ্র ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশিষ্টতা এরই মধ্যে অনুসন্ধেয়।...

বারোমাসীর ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যে তথা লোকাচার-শাস্ত্রাচারের মিশ্রণে উপমহাদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু একে শুধু এক দেশের বৈশিষ্ট্য বলে দাবী করলে, আমার বিশ্বাস, ভুল হবে। কেননা, এর যা বাণী, তা পৃথিবীর সব দেশেরই সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তনের বাণী। আদিম কৃষিজীবী মানবসমাজের জীবনদর্শনের ভিত্তি সর্বত্রই ছিলো উর্বরতা-বাদ বা প্রজনন শক্তি। এবং অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, বর্তমান পৃথিবীর কিছু বিধিনিষেধেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার প্রভাব রয়ে গেছে।

কবিরা বারোমাসীতে ধর্মের প্রসঙ্গে শুধু যে কিছু ব্রত-পূজো আর সংস্কার বিশ্বাসের কথাই বলেছেন, তা নয়। কোনো কোনো রচনায় দুই-একটি ধর্মাশ্রয়ী সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লেখও আছে। এগুলিতে এক সময় প্রাকৃতজনের বিশ্বাস ছিলো দৃঢ় এবং তর্কাতীত। আধুনিক কালের যে কোনো হিন্দু পঞ্জিকা দেখলেও একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বেহুলার সাময়িক তথা অকাল-বৈধব্যের মূলে ছিলো শ্রাবণ মাসের বিয়ে, এই লৌকিক বিশ্বাসের কথা আমি আগেই বলেছি। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র মলুয়ার অষ্টমাসীতেই আমরা আরো দেখতে পাই, অতীতের বাংলায় কোনো কোনো অঞ্চলে ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসেও বিয়ে নিষিদ্ধ ছিলো,—

.. ভাদ্র মাসে শাস্ত্র মতে দেবকার্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগোনা।...
আগণ মাসে রাঙ্গা ধান জমিনে ফলে সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা॥
পৌষ মাসে পোষা আন্ধি দেশাচারে দোষ।
এই মাস গেলে হইব বিয়ার সন্তোষ॥...

কিছু আখ্যানমূলক বারোমাসীতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ থাকার সংবাদও রয়েছে। এই বারোমাসীগুলির

নায়িকারা সমাজের অনভিজাত স্তরের প্রতিনিধি। এর থেকে অনুমান করি, সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধগুলির প্রচারের মূলে ছিলো লোকধর্ম'। কবিকঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ফুল্লরার বারোমাসীতে আমরা দেখি, মাঘ মাসে শাক খাওয়া তো দূরের কথা, তোলাও নিষিদ্ধ। এর ফলে গরীব গৃহস্থদের ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হত,—

...ফুল্লরার আছে কত কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥...

'চণ্ডীমঙ্গল'-এর সুশীলার বারোমাসীতে নায়িকার একটি উক্তি দেখে মনে হয়, মাঘ মাসে মাছ খাওয়াও বিশেষ শাস্ত্রসম্মত ছিলো না। সুশীলা এই মাসের বিভিন্ন খাদ্যের উল্লেখ করে বলেছে,—

.. মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন ॥...

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সুশীলা-কাহিনী সিংহলের, কিন্তু বাঙালী কবির হাতে পড়ে সুশীলা ধর্ম'-বিশ্বাস আর সংস্কারে একেবারে বাঙালী মেয়ে বনে গেছে। সুশীলার সকল বারোমাসীতেই দেখা যায়, সে যেসব পাল-পার্বণের উল্লেখ করে, সেগুলি বাংলার। এমনকি, বাংলার প্রকৃতি আর সুশীলা-বর্ণিত সিংহলের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর।

কবিকঙ্কনের ফুল্লরার বারোমাসীতে মাংস-সম্পর্কিত একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে,—

···বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ ॥···

এই বারোমাসীটি থেকে আরো জানা যায় মাঘ মাসও 'নিদারুণ'। কেননা, এ-মাসেও 'সর্বজন নিরামিষ কিংবা উপবাস।'

বারোমাসীর কবিরা আকস্মিকভাবে দেশের দুই-একটি সম্প্রদায়ের ধর্মাশ্রয়ী বৃত্তির পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন। রংপুরের একটি লৌকিক বারোমাসীতে যোগিনীদের ভিক্ষের কথা আছে। তারা কানে কুণ্ডল ধারণ করতো। পণ্ডিতদের মতে, কুণ্ডলধারী যোগী-যোগিনীরা ছিলো নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, বারোমাসীতে ব্রত-পূজো-সম্পর্কিত যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যহীন। কমলার বারোমাসীতে বেশ কিছু পূজো উৎসবের বর্ণনা আছে। সেখানেও সবই যেন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু, সুখের বিষয়, শাস্ত্রাচার এবং লোকাচারের নিগড়ে বাঁধা অতীতের বাংলার সমাজ সম্পর্কিত আর যেসব তথ্য বারোমাসীসাহিত্যে পাওয়া যায়, সেগুলি পরিমাণে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বৈচিত্র্যে স্নিগ্ধ।

আমরা জানি বারোমাসীসাহিত্যের একটি বড়ো অংশ ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলি গান এবং এই জাতীয় অন্যান্য রচনার মতো নারীমনের স্বতোৎসারিত সুরধারার প্রত্যক্ষ বাহক। পুরুষ-রচিত বারোমাসীগুলির উপজীব্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীজীবনের বিভিন্ন ঘটনা বা অনুভূতি। এবং নারীর জগৎ প্রধানতঃ গৃহকোণ। এজন্যে, বারোমাসীতে আমরা যেসব সামাজিক তথ্য পাই, যদিচ সীমায়িত পরিবেশ থেকে পরিবেশিত, সেগুলি দেশের অকৃত্রিম এবং অন্তরঙ্গ পরিচয় দেয়। তথ্যগুলি সাধারণতঃ উল্লিখিত হয়েছে আধাপ্রাসঙ্গিকভাবে। এজন্যে, সেগুলি অনেকাংশেই গৌণ। কিন্তু গৌণ প্রাসঙ্গিকতা সত্ত্বেও অতীতের সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার-প্রসাধন, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক কথাই বারোমাসী থেকে জানা যায়। এমনকি, কিছু কিছু সামাজিক ধ্যান-ধারণা, নারীর অবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দুই-একটি তথ্যও বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে।

বাংলায় চণ্ডীর কাহিনী কখন, সাহিত্যে স্থান লাভ করে, আমরা আজও সঠিক জানিনে। অভিজাত সাহিত্যে প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মানিক দত্ত। অনেকের মতে, ইনি ছিলেন প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি। কিন্তু চণ্ডীর কাহিনী তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগেই বাঙালী সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। চণ্ডীকাব্যগুলির উপজীব্য ব্যাধরাজ কালকেতু এবং বণিক ধনপতি-শ্রীমন্তের উপাখ্যান। অভিজাত সাহিত্যে গৃহীত এই উপাখ্যান দুটিতে চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা বারোমাসীর মাধ্যমে যেসব তথ্য রেখে গেছেন, সেগুলি থেকে দুঃস্থ ব্যাধ এবং বণিকদের জীবনযাত্রার প্রায় নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায়।

কবিকঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ ফুল্লরার নিজের দুঃখদারিদ্র্যের বর্ণনার মধ্যে বড়ো বড়ো গৃহস্থের দুরবস্থার কথাও ছড়িয়ে রয়েছে।

ফুল্লরার কাহিনী থেকে আমরা জানতে পাই, কালকেতু-ফুল্লরার আদি বাসগৃহ ছিলো তালপাতায় ছাওয়া এবং ভেরেণ্ডার খুঁটি দেওয়া ভাঙা কুঁড়ে। প্রতি বছরই বৈশাখ মাসের ঝড়ে সে-ঘর ভেঙে পড়তো। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনো ঋতুতেই ফুল্লরার ভাগ্যে ভালো কাপড় জোটেনি। তার দিন কেটেছে 'খৈয়া' বা 'খুয়া বাস' পরে থেকে এবং সে-বসন 'শিরে দিতে নাহি আঁটে।' তাকে খালি গায়েই রোদ বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে মাংসের পশরা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। বৈশাখ মাসে মাংসাহার ছিলো দেশাচারবিরুদ্ধ। মাংসব্যবসায়ী ফুল্লরাদের তখন দুঃখের অবধি থাকতো না। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে। তখন ফুল্লরাদের থাকতে হত উপবাসী। কিংবা বঁইচি বা ক্ষুদকুঁড়ো খেয়ে। সে-যুগে আশ্বিনে দুর্গাপুজোয় লোক প্রচুর ছাগল-মহিষ-মেষ বলি দিয়েছে। তাই, সে-সময়ে সবার ঘরেই থাকতো দেবীর প্রসাদ। এ-কারণে তখনও ব্যাধদের সংসারে টানাটানি চলতো। পূজো উপলক্ষে ভালো পোশাক-আশাক তারাও পরেছে। কিন্তু সেই আনন্দের ভেতরও মন ছিলো অন্ন চিন্তায় কাতর। শীতের সময় মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পোশাক হিসেবে জুটেছে 'হরিণের ছড়' বা পুরোনো দোপাট্টা। এবং পৌষ মাসে কখনো কখনো গোটা একটি হরিণের বদলে পাওয়া যেতো 'পুরানো খোসালা'। আগেই বলেছি, মাঘ মাস ছিলো নিদারুণ। কারণ তখন 'সর্বজন নিরামিষ কিংবা উপবাস।' ফাল্গুন মাসেও সংসারের দুরবস্থা হত চরম। সে সময়ে ব্যাধগৃহস্থ তার একমাত্র সম্বল 'মাটিয়া পাথেরা' বাটিটিও বাঁধা রেখেছে 'ক্ষুদসের'-এর জন্যে। এ-অবস্থায় দাম্পত্য জীবন উপভোগ করা ব্যাধদের পক্ষে যে কতোটা সম্ভব ছিলো, তা সহজেই অনুমেয়। ফুল্লরার ভাষায় মধুমাসেও যখন—

…বণিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে॥
দারুণ দৈব দোষে দারুণ দৈব দোষে।
একত্র শয়নে স্বামী যেন যোল কোশে॥…

দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলের গীত'-এ কালকেতু-ফুল্লরার শীতকালীন দুরবস্থার যে বর্ণনা আছে, তা আরো করুণ। কবির উক্তিতে যদি সত্যের কণামাত্রও থাকে, তাহলে আরো বুঝতে হবে, অন্ত্যদের অবস্থাও ব্যাধদের অবস্থার থেকে উন্নত ছিলো না। দ্বিজ মাধবের কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বারো-মাসীতে এর কিছু প্রমাণও আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এবং অতিকথনের আশঙ্কা থাকলেও খানিকটা উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছিনে,—

·· শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে স্থান নাই ঘরে হাঁটু পানি॥
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পত্র মাথে দিয়া বঞ্চি দুইজনে॥ ..
শয়ন মৃগের চর্মে চর্মের বসন।
শীতেতে কাঁপিয়া ঘরে বঞ্চি দুইজন॥
অধর সহিতে ওষ্ঠ কাঁপে ঘন ঘন।
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোহাই হুতাশন॥ ··
খৈয়া বাস পরিধানে থাকি নিশাকালে।
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবিজালে॥···

খুল্লনার বারোমাসীগুলিতে তার দুঃখ-দুর্দশার যে বর্ণনা পাই, তাও প্রায় এমনি। তবে ফুল্লরার দুর্দশার মূলে ছিলো প্রধানতঃ তার সতীন। যাকে সে সহজবোধ্য কারণেই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেনি।

ঋতু-আশ্রয়ী বারোমাসীসাহিত্যের নায়িকারা বৎসরের বিভিন্ন সময়ের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নানা রকম ফলমূলের কথা বলেছেন। এদেশের মওসুমী খাদ্যের তালিকায় সেসবের স্থান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় তাদের তেমন কোন মূল্য নেই। তবে, প্রিয়জন সেবার প্রসঙ্গে উল্লিখিত খাদ্যপানীয়গুলির নাম থেকে সংশ্লিষ্ট বারোমাসীগুলির সমকালীন লোকসমাজের রুচি এবং আর্থিক অবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ, কবিকঙ্কনের 'সুশীলার বারোমাসী'তে সুশীলা স্বামীকে যেসব খাদ্যপানীয়ের লোভ দেখিয়েছে, সেগুলির কথাই বলি। জিনিষগুলি সিংহলের পটভূমিতে উল্লিখিত। কিন্তু সাধারণভাবে তাদের সেকালের বাংলার সমস্ত অবস্থাপন্ন ঘরের খাদ্যপানীয় বলে ধরে নিলে অন্যায় হবে না,—

…নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
পুরিবে উদর নাথ পাকা আম্ররসে ॥…
আমার মন্দিরে থাক না চলিহ পুর।
শালি অন্ন দধি খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর ॥ ··
শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে।
মৎস্য মাংস মধুপান আদি সহকারে ॥…

সম্ভবতঃ সেকালে মাঘ মাসে মাছ খাওয়ার রেওয়াজ খুব বেশী ছিলো না এবং সম্পন্ন গৃহস্থরা মাছ খেতে না পাওয়ার দুঃখ মেটাতেন প্রতিদিন 'মিষ্ট অন্ন পায়স'-এর ব্যবস্থা করে।

কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'-এ 'সুন্দরী নাগ'-এর প্রতি রম্ভার উক্তিতে হেমন্তের জনপ্রিয় খাদ্যপানীয়ের শ্রেণীবিভাগও তাৎপর্যপূর্ণ,--'নীর ক্ষীর দুই এই ঋতুতে প্রশংসি।' এবং তার পৌষ মাসের খাদ্যপানীয় আমাদের মনে রীতিমতো হিংসার উদ্রেক করে. – 'ঘৃত মধু পান করি দ্বিগুণ আহার।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বহু বারোমাসীতে দেখা যায়, অতীতের বাংলায় মধু ছিলো অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়। বিশেষতঃ, সচ্ছল পরিবারগুলিতে। অনুমান করি. তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে মধু উৎপাদন বা সংগ্রহ লাভজনক কাজ বলে গণ্য হত। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এ-সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, বাংলার উপজাতিদের মধ্যে এক সময় খৈয়া বা খুয়া বাস, খোসালা, দোপাটা ইত্যাদি পরিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। এমনকি, পশুচর্মও। সচ্ছল পরিবারের বসনভূষণ যে এসবের থেকে উন্নত ধরনের এবং মূল্যবান ছিলো, তা বলাই বাহুল্য। কবিকঙ্কনের রচনাতেই দেখতে পাই, কোনো নায়িকা তার স্বামীকে 'সামলী গামছা', 'পাটের মশারী' এবং শীত নিবারণের জন্যে 'তসর বসন' দানের প্রস্তাব করেছে। শান্তির নামে প্রচলিত একটি লৌকিক বারোমাসীতে অজ্ঞাতপরিচয় প্রণয়ী কর্তৃক শান্তিপুরী শাড়ী দিয়ে শান্তির মন জয়ের চেষ্টার কথা আছে,—

·· চৈত্র মাসেতে শান্তি আমি যাব বাড়ী।
তোর লাগি কিনি আন্যোম শান্তিপুরী শাড়ী ॥…

শান্তিপুরী শাড়ীর এমন উল্লেখ দেখে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, এ-জিনিষ এক সময় নারীসমাজের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় ছিলো। আর, পাটের শাড়ী? তা লোভনীয় না হোক, অতীতের বাংলায় তার প্রচলন যে অতি ব্যাপক ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বারোমাসীতে অলঙ্কারের নাম আমরা খুব বেশী পাইনে। পূর্বাঞ্চলের একটি রচনায় তার (তাড়?), তরু, পায়ের পাশলী, হাঁসুলী, কানফুল ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এ-ধরনের অলঙ্কারের কথা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও অনেক পাওয়া যাবে। নীলার বারোমাসীতে আমরা অষ্টালঙ্কারের ভেতর দুই-একটি স্বল্পপরিচিত অলঙ্কারের নাম দেখি। যেমন, বাঁকমল আর মদনকড়ি,—

> …ও সাধু বলেরে একেতে অঘ্রাণ মাসে মদনেরই বাড়ি,
> তোমার সর্বাঙ্গে তুল্যা দেব অষ্টালঙ্কার।…
> ও সাধু বলেরে খিল খাড়্যা বাঁকমল দেব পায়েতে পাশলী,
> মাঙ্গাতে জিঞ্জিরা দেব গলেতে হাঁসলী।…
> দুই কানে ঝুল-বিস্তার দেব সোনার মদনকড়ি।…

এই অলঙ্কারগুলির নাম মনে রাখবার মতো। এগুলির অধিকাংশই তখন পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিলো।

যে-সমাজে নারী অষ্টালঙ্কার পরতে পারতো, সেখানে তার আর্থিক অবস্থার উপযোগী বিলাসব্যসনের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই ছিলো। বস্তুতঃ মধ্য যুগের অসংখ্য বারোমাসী কেবল নারীর নয়, পুরুষেরও নানাবিধ ভোগবিলাস এবং প্রসাধনের সাক্ষী। সে-যুগে সম্পন্ন গৃহস্থরা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গরমের সময় আরামের জন্যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, এখন তাকে মনে হবে 'সেকেলে' এবং সাধারণ। কিন্তু তখনকার মানুষের কাছে সেটা ছিলো আভিজাত্যের পরিচায়ক। সে-সময়ে প্রেয়সীরা যে প্রিয়জনকে এমনি সব জিনিষের কথা বলে প্রলুব্ধ করতে চাইতো, তারও প্রমাণ আছে,—

> বৈশাখ বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
> প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহি সয়॥
> চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি।
> সামলী গামছা দিব সুগন্ধী কস্তুরী॥…

শীতল চন্দন দিব চামরের বায় ।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায় ॥···

উৎসব উপলক্ষে—এবং অন্যবিধ আনন্দের সময়ও—কুমকুম, চন্দন, চুয়া, আবির, কুসুম ইত্যাদির ব্যবহার ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। স্নানের সময় ব্যবহৃত হত 'উদ্বর্তন তৈল' এবং 'সুবাসিত জল'। একটি বারোমাসীতে রয়েছে মেয়েদের আমলকী-স্নানের উল্লেখ,—

···আমলকী স্নানের কষাএ বাস কেশে
ব্যজনে বিচিয়া সিঞ্চি চন্দনের রসে ॥···

গন্ধদ্রব্যাদির এহেন বহুল উল্লেখ থেকে সহজেই অনুমেয়, অতীতে বাঙালীসমাজে এসব জিনিষের ব্যবসাও বেশ ব্যাপক ছিলো এবং এগুলির উৎকর্ষও সাধিত হয়েছিলো যথেষ্ট।

প্রসঙ্গতঃ, ষোড়শ শতকের খ্যাতনামা কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য-ভাগবত'-এ তৎকালীন বাঙালীসমাজের গন্ধদ্রব্যপ্রীতি এবং গন্ধদ্রব্যের উৎকর্ষের একটি কৌতূহলজনক আভাস দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায়, চৈতন্যদেবের মতো ব্যক্তিও বিয়ের আগে গন্ধদ্রব্যের জন্যে স্বয়ং কোনো গন্ধবণিকের কাছে গিয়ে হাজির হন। বণিক তাঁকে এমন সব জিনিষের সন্ধান দেয়, যেগুলির দ্বারা যে কোনো মানুষকে আকৃষ্ট করা সম্ভব।

কবিচন্দ্রের বারোমাসীতে ধনী গৃহিণীদের বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত। তা সত্ত্বেও এর মধ্যে ধনীসমাজের আহারবিহার, ঘরগৃহস্থালি ইত্যাদি সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এখানে পাঠকদের অবগতির জন্যে বারোমাসীটির একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,—

···পোষে প্রবল শীতে শয্যার বিলাস।
খট্টায় শয়ন অট্টালিকায় নিবাস ॥···
নানা বর্ণে চীর পরি নানা অলঙ্কার ॥···
কুন্তলে লোটন গন্ধ তৈলের সুবাস।
সুপুর কর্পূর পাকা পান রসবাস ॥···
অলক তিলক লিখি কস্তুরী কুমকুমে।
স্বেদ নাহি হয় নিধুবন পরিশ্রমে ॥··
চন্দনে করিয়া চিত্র অলঙ্কার লিখি।
তমসুক পরি কুচে না সহে কঞ্চুকি ॥···

একটি লৌকিক বারোমাসীতে 'বিচিত্র পালঙ্ক' অর্থাৎ নকশাওয়ালা খাট ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এটি ঠিক কবেকার রচনা তা, বলা সম্ভব নয়। তবে এতে বাংলার বণিক-যুগের উল্লেখ আছে।

ওপরের বর্ণনাগুলির সঙ্গে ফুল্লরা-খুল্লনার দারিদ্র্যের বর্ণনা মিলিয়ে পড়লে মধ্য যুগের ধনী-দরিদ্রের অবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধেও পাঠকরা সহজেই একটি ধারণা করে নিতে পারবেন।

ছড়া, মেয়েলি গান, রূপকথা ইত্যাদির মতো বারোমাসীতেও অতীতের ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। প্রেমবিষয়ক অধিকাংশ বারোমাসীরই জন্ম ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশগত স্বামীর জন্যে প্রোষিতভর্তৃকার কাতরতায়। এই সব রচনায় সাধারণতঃ বাণিজ্যযাত্রীদের উল্লেখ করা হয় বণিক-যুগের স্মৃতিবাহক 'সাধু' বা 'সদাগর' শব্দের মাধ্যমে। 'কঙ্ক ও লীলা-র যাণ্মাসিকীতে বিরহিণী লীলার উক্তি থেকে নদীপথে বণিকদের দূর দেশে বাণিজ্যযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা,—

> ···শুকনা নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
> বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী॥
> পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়।
> আমার বঁধূর তারা লাগাল নি পায়॥···

সে-যুগে জলযান ছিলো বাণিজ্যযাত্রীদের প্রধানতমো বাহন,- তখন অনিবার্য কারণেই বর্ষাকালই হত বাণিজ্যযাত্রার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। চলাফেরার জন্যে লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার করেছে ছোটো নৌকো, কোশা বা ভেলা। বেহুলা-সম্পর্কিত সকল বারোমাসীতেই তার কোশা কিংবা কলাগাছের ভেলা ভাসানোর কথা রয়েছে। একটি অষ্টমাসীতে দেখি, শ্রীহট্টে ভেলার আঞ্চলিক নাম ছিলো 'ভেরুয়া'। তাতে 'রামকলা কাটিয়া, দেবী গো, ভেরুয়া সাজাইলু'। বাণিজ্যের প্রয়োজনে কিন্তু ব্যবহার করা হত একাধিক বড়ো নৌকো বা ডিঙ্গা। 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' কথাটির জন্ম এর থেকেই। বলা নিষ্প্রয়োজন, সপ্তডিঙ্গা মধুকর ছিলো মধুকর এবং আরো সাতখানি ডিঙ্গা নিয়ে গঠিত বাণিজ্যবহর। মানিক দত্তের ধনপতি উপাখ্যানে অবশ্যি মধুকর সপ্তডিঙ্গারই একখানি ডিঙ্গা। বাকী ছয়খানির নাম যাত্রাসিদ্ধি, চন্দ্রখোল, হরিণকালি, সাসিআ, ধুমডিঙ্গা এবং মধুকরা। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, গুপ্ত-যুগের বাংলায় পঁচিশ রকমের জলযান ছিলো।

সে যা-ই হোক, নৌকো নিয়ে অনেক সময় মেয়েরাও দূর দেশে যাওয়া-আসা করেছে। 'কঙ্ক ও লীলা'-র যান্মাসিকীই বলে, এ-যুগের বেদে মেয়েদের মতো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ব্যবসাজীবী ডোম মেয়েরাও ঝড়বাদল উপেক্ষা করে নদীপথে ঘুরে বেড়াতো,—

শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পশরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা॥…
দিন রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি॥
খাউরি বিউনা বরে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী॥…

দুর্যোগের মধ্যে নদীপথে বেরুনো যে সব সময় বাঞ্ছিত ছিলো না, তা না বললেও চলে। ডোম নারীরা প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করেছে কেবল অর্থনৈতিক কারণে।

ওপরের উদ্ধৃতিটিতে নদীতীরবাসীদের বর্ষাকালীন দুর্দশারও কিঞ্চিৎ আভাস রয়েছে।

নারীর সতীত্বের মহিমাকীর্তন প্রাচীন এবং মধ্য যুগের সাহিত্যের অনেক শাখাতেই আছে। বারোমাসীর কবিদেরও এদিকে ঝোঁক কম ছিলো না। সতী নারীদের কাহিনী নিয়ে বহু বারোমাসী রচিত হয়েছে। নীলা এবং শান্তির বারোমাসী বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই প্রচলিত রয়েছে। (শান্তির বারোমাসী নানান আকারে বাংলার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়।) শান্তি এবং নীলা দুজনেই এক সময় ছিলো প্রোষিতভর্তৃকা। তখন তারা পরপুরুষের দৃষ্টির সামনে পড়ে যায়। কিন্তু নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যেও তারা নাটকীয়ভাবে নিজেদের রক্ষা করে। কাহিনীগুলির নাটকীয়তাই যে সংশ্লিষ্ট কবিদের বারোমাসী রচনার অন্যতমো মুখ্য কারণ ছিলো, তা বলাই বাহুল্য। নীলার একটি বারোমাসীতে নায়িকা নীলার সতীত্ব-সম্পর্কিত যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, তা যে কোনো পাঠকের প্রশংসা লাভের যোগ্য,—

…ও নীলা বলে রে এমন নারী নহে
আমরা ঘুমাইয়া ভুলি,
পর রে পুরুষ নিয়া খেলা নাহি করি।…

ও নীলা বলে রে শাশুড়ীর দুর্লভ আমার
সোয়ামীর পরাণ,
পর রে পুরুষ দেখি আমরা বাপ-ভাইয়ের সমান।···

হেলিচা কন্যার বারোমাসীতে রাজা মহীপালের একটি দুষ্কৃতির কাহিনী আছে। মহীপাল হেলিচাকে দেখে জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রেম নিবেদন করতে থাকেন। তাতে সে সাড়া না দিলে তিনি বল প্রয়োগের ভয় দেখাতেও ছাড়েননি। কিন্তু হেলিচা সব কিছু উপেক্ষা করে তাঁকে জানায়,—

···উংকারে তারামু তোমার এ পাইক পহরী ॥
দাপটে মারুম তোমার হাতি গজমোতি ॥···

বারোমাসীর এই মহীপাল কোন্ মহীপাল, রচক তা আমাদের বলেননি। আমরা শুধু জানতে পাই হেলিচার পরিণামের কথা। নারীলোলুপ রাজার আক্রমণ থেকে সে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারেনি। তবু, তার তেজস্বিতা রাজা মহীপালের অপকীর্তির প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে পল্লীকবির দ্বারা বারোমাসীতে কীর্তিত হয়ে রয়েছে। এই বারোমাসীটি সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট মহীপালের সময়ের অথবা সেন-যুগের প্রথম দিকের রচনা।

অভিজাত সাহিত্যেও এ-ধরনের কাহিনীর অভাব নেই। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিরা সতীত্ববোধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে বক্তব্যকে অস্বাভাবিক এবং নায়িকার বিকৃত আত্মপ্রচারে পর্যবসিত করে ফেলেছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে দৌলত কাজীর 'লোর-চন্দ্রানী' থেকে ময়নাবতীর উক্তি তুলে দিচ্ছি,—

···প্রাণের দুলর্ভ কান্ত   দেখিলে হৃদয় শান্ত
আঁখিযুগে পীয়ায় সানন্দ
মধুরমূরতি পতি   আলোল বিলোল গতি
অমৃতমণ্ডলী মুখচন্দ।
করত দেয়ন্ত লোরে   যদি মোর শির পরে
না দোলয়ে দেহ যে আমার
[illegible] নামে ময়নাব[illegible]   জগতে রাখিমু খ্যাতি
মরণে ত মুক্ত স্বর্গদ্বার।

দেখলে অবাক হতে হয়, সতীত্বের মাহাত্ম্য কীর্তনের পাশাপাশি বারোমাসীসাহিত্যে অবৈধ প্রেমের কাহিনীও কিছু কম নেই। তবে, কাহিনীগুলি রূপকাশ্রয়ী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা মধ্য যুগে বহু কবির নিজের বা পরিচিতজনের প্রেমকাহিনী বর্ণনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁরা যে-কথা সোজাসুজি বলতে সাহস পাননি, তা জুড়ে দিতেন রাধাকৃষ্ণের মুখে। ফরিদপুর জেলায় প্রচলিত 'রাধার বারো-মাসী' শীর্ষক একটি লৌকিক রচনায় এ-ধরনের একটি কাহিনী আছে। তার নায়িকা রাধা স্নান করতে গেলে 'গোয়ালপাড়া'-র ছেলে বংশীবাদক কানাই তার পিছু নেয়। এবং প্রেম নিবেদনও করে। এই সময় কানাইয়ের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে 'নেতের অঞ্চল দিয়া রাধা বাঁশী চুরি করে।' তাতে অবশ্যি কানাইয়ের হার মানবার কথা নয়। তাই, এর পরও তাকে ঘাটে দেখা যায়। রাধাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টায়। তার ফলে কিছু দিন পরই রাধার সব যুক্তি উড়ে যায়। অবশেষে কানাইকে নিয়ে গোপনে রাত্রিযাপন করতেও তার দ্বিধা থাকে না। প্রাচীন রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সাথে এভাবে যতোই মিল দেখানো হোক না কেন, একে ঠিক বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃষভানু-কন্যা রাধার কাহিনী বলা সম্ভব নয়।

এবার একটি আধা-প্রাসঙ্গিক কথা বলে বারোমাসীর সামাজিক-অর্থ-নৈতিক তথ্যাদির আলোচনা শেষ করি।

ওপরে আলোচিত প্রেমকাহিনীগুলি এবং আরো অনেক বারো-মাসীতেই দেখা যায়, অতীতের বাংলার মেয়েরা অবাধেই বাইরে চলাফেরা করতো। তবে, এর থেকে কেউ যেন ধরে না নেন যে, সর্ব ব্যাপারেই তাদের স্বাধীনতা ছিলো। এ-ধরনের সিদ্ধান্ত যে কতোখানি বিপজ্জনক তা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন।

পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ওপরের অনেক উদ্ধৃতিতেই কিছু কিছু সাংস্কৃতিক তথ্য আছে। সংস্কৃতি তো সমাজের অঙ্গ। বারোমাসী-সাহিত্যের সামাজিক তথ্যাবলীর প্রসঙ্গে সংস্কৃতি-সম্পর্কিত আলোচনা

তাই অপরিহার্য। যেহেতু সাহিত্য সমকালীন সংস্কৃতির দর্পণ, সে-কারণে বারোমাসীর সংস্কৃতি-সম্পর্কিত তথ্যগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় সাহায্য করতে পারে। এজন্যেও বিষয়টির আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলেই দেখা যায়, বারোমাসীতে মোটামুটি হিসেবে তিন ধরনের সাংস্কৃতিক তথ্য আছে। প্রথম ধরনের তথ্যগুলি বাংলার বিভিন্ন যুগ, অঞ্চল এবং মানবসম্প্রদায়ের গীতবাদ্য-অভিনয়ের সংবাদ পরিবেশন করে। দ্বিতীয় ধরনের তথ্যগুলিতে রয়েছে প্রাকৃতজনের সংস্কৃতিচেতনার স্বাক্ষর। এছাড়া, প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিতে বিভিন্ন মানবসম্প্রদায়ের চিন্তার প্রভাবও কোনো কোনো বারোমাসীতে লক্ষণীয়।

বারোমাসীসাহিত্যের লৌকিক রচনাগুলি তো বটেই, অধিকাংশ অভিজাত রচনাও গীতিকবিতা। বৃহত্তর সমাজে প্রচারের জন্যে এসব রচনা নির্ভর করেছে প্রধানতঃ সুরের ওপর। এর প্রমাণ বারোমাসী-সাহিত্য নিজেই দেয়। কবিকঙ্কনের একটি বারোমাসীর শেষাংশে বলা হয়েছে, 'বারমাসী গীত গান শ্রীকবিকঙ্কন।' বহু দীর্ঘ অলিখিত বারোমাসী গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে অনেক কাল যাবৎ প্রচলিত আছে। এগুলি গান হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুরুষসমাজেও বারোমাসীর সুরনির্ভর প্রচার একেবারে বিরল নয়। এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনা কিছু কাল আগেও উত্তর বাংলায় চাষবাসের সময় চাষীদের দ্বারা গীত হত। বিভিন্ন বিষয় বিচার করে দেখা গেছে, এগুলি বাংলার বণিক-যুগের রচনা।

লৌকিক বারোমাসী এবং অন্যান্য লৌকিক গান সাধারণতঃ ঘরোয়া আসরেই গীত হয়। কিন্তু উৎসবে-উপলক্ষে গীতের আসর বসানোর রেওয়াজও বাংলায় অনেক দিন আগে থেকেই রয়েছে। এর প্রমাণও বারোমাসী থেকেই পাওয়া যায়। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র কমলার বারোমাসীতে বারো মাসের তেরো পার্বণের প্রসঙ্গে এমনি আসরের উল্লেখ করা হয়েছে। এই রচনাটি এক বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পাই, গানের জন্যে নটী নিয়োগের রেওয়াজও অতীতের বাংলায় ছিলো।

পণ্ডিতদের মতে, কমলার বারোমাসী ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের রচনা। তার সাক্ষ্য, আকাল দুর্গার পূজোয় 'ঝাঁক ঝাঁক শঙ্ক বাজে নটী গীত গায়।'

ভারতচন্দ্রের বিদ্যার বারোমাসীতে পুজো উপলক্ষে খেঁড়ু, খেউড় বা কবিগানের আসর বসবার সংবাদ পাই। খেউড়ের জন্মভূমি নদীয়া-শান্তিপুর। কিন্তু কালক্রমে এই গান বাংলার সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। তবে, মনে হয়, খেউড় তার প্রাকৃত রুচির জন্যে প্রথম দিকেও ভদ্রসমাজে সমাদর পায়নি। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাকৃত-সাহিত্যভক্তও একে 'পূর্বাপর পরিচয়হীন স্বল্পক্ষণস্থায়ী' সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। (হয়তো তাঁরই অনুসরণে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দে ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে খেঁড়ু গানের নাম দেওয়া হয় 'ইতর কবিতা'।) তাঁর মতের সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবিগানের কোনো ইতিহাসকার লেখেন,—

> ...ভাব, ভাষা এবং প্রকৃতি আধুনিক কাব্যের উৎসমুখ। যে যুগে ইহাদের আবির্ভাব, সে যুগ বাংলা সাহিত্যের আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের খরদীপ্তি লইয়া বিরাজমান ছিল না। আর, কবিগানও অতর্কিতে পঙ্গপালের মত আকাশ মসীলিপ্ত করিয়া ফেলে নাই।......

কিন্তু এই ইতিহাসকারও শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'গ্রামে গাঁথা বাংলাদেশের জীবনচর্যায় এগুলি নিম্নমূল্যের বলিয়া স্বীকৃত।' তবে, এক সময় খেঁড়ু গান যে রাজানুগ্রহ লাভ করেছিলো, ভারতচন্দ্রই তার প্রমাণ দেন। প্রবাসী—এবং দুর্গোৎসবের আকর্ষণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ—সুন্দর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা তুললে বিদ্যা তাকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে আটকাবার প্রয়াস পায়। সে-সময়ে সে সুন্দরকে নতুন নতুন ঠাটে খেঁড়ু শোনাবারও প্রস্তাব করে। ভারতচন্দ্র বিদ্যার মুখ দিয়ে বলছেন,—

> ...আশ্বিনে এদেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার।
> কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥
> নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
> নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥......

কবিকঙ্কনের 'সুশীলার বারোমাসী' থেকে জানা যায়, গৃহস্থঘরের মেয়েরা দোল উপলক্ষে সখীদের নিয়ে কৃষ্ণচরিত গান করতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গীতিনাট্যের ব্যবস্থাও হয়েছে। সুশীলার উক্তিতে আছে,—

··হরিদ্রা কুমকুম চুয়া করিয়া ভূষিত।
আগু দোল করিয়া গাওয়াব নিত নিত ॥
সখী মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত।
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত ॥···
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে।
মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে ॥···

অবশ্যি, চাষীর মুখে বারোমাসী গান শুনে বা সুশীলা আর তার সখীদের গান গাইতে এবং অভিনয় উপভোগ করতে দেখে যদি ধরে নিই, গীতবাদ্য অতীত সমাজের সকলস্তরেই সমানভাবে সমাদৃত ছিলো, তাহলে ভুল হবে। কারণ, নৃত্যগীত বৈদিক ধর্ম অনুসারে প্রায় না-জায়েজ। অন্য দিকে, অতীত কালে এদেশের সমাজ নারী এবং চাষীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি। এবং ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের আগে উচ্চতরো সমাজেও গীতবাদ্যের চর্চা খুব ব্যাপক ছিলো না। চৈতন্যদেব স্বয়ং গীতাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর নৃত্যবাদ্যযুক্ত নাম-সংকীর্তন এক সময় ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর কাজ বলে নিন্দিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষায়, বৈদিক ধর্ম অনুসারে—

···ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ গান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নৃত্যগীত করা নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্র এবং নারীরাই তা করতে পারতেন। সমাজে গীত-বাদ্য যাদের জীবিকা, তাদের স্থান খুব নীচে ছিল।···

এখানে প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, কৃষ্ণ আসলে নররূপী বিষ্ণু এবং চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমিক।

মুসলিম শাসনের সূত্রপাতের ফলে ক্ষমতাচ্যুত উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যখন সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার প্রয়াস পাচ্ছেন এবং তাদের বেদবিরুদ্ধ পূজার্চনাদিও মেনে নিচ্ছেন, তখনও কালীপুজোয় নরবলির সময় বাদ্য বাজাতো কোচেরা। যারা ছিলো তৎকালীন সমাজের নীচু স্তরের মানুষ। কমলার বারোমাসীতে এই ধরনের এক··· উপলক্ষের উল্লেখ আছে। কোচদের দিয়ে বাদ্য বাজানোর কারণ দুজ্ঞেয় নয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চ বর্ণগুলির সংস্কৃতি নিম্ন বর্ণের সংস্কৃতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। বস্তুতঃ, বাংলার সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের ফল। ওপরে 'সুশীলার বারোমাসী' থেকে দোল-উৎসবের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি, তাতেও এই মিশ্রণের আভাস পাওয়া যাবে। দোলের আদি রূপ যা-ই থাক না কেন, বর্তমানে উৎসবটি বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতি থেকে অবিচ্ছেদ্য। এ-সম্পর্কে ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন,—

> ··বারোমাস্যার অন্তর্নিহিত এই হোলি বা দোল উৎসব··· সংস্কৃতির আরও একটি রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে।···হোলি উৎসবের আদি চরিত্রের মধ্যে রয়েছে··নানা আদিম ও বন্য প্রবৃত্তির চিহ্ন ···উর্বরতাশক্তি বা প্রজননশক্তির পূজা-অর্চনার সূত্রে নানা উচ্ছৃংখল ও অসংযত যৌন মনোভাব। মদনোৎসব বা বসন্তোৎসবের প্রভাবে আদিরূপের কতকটা রদবদল হয়েছে, কতকটা রূপান্তর ভাবান্তর হয়েছে।...

প্রচলিত কৃষিবিষয়ক বারোমাসীগুলি সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। এ-ধরনের একটি রচনার কিছু অংশ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। তার থেকে দেখা যাবে, চাষীরা বারোমাসীটি গেয়ে চাষবাসে তাদের সাফল্য কামনা করে,—'এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে।' এই রচনাটিতে আদিম মানবসমাজের যাদুবিশ্বাসের রেশ রয়ে গেছে। ঠিক যেমনটি দেখা যায় ব্রতপুজোর ক্ষেত্রে।

বারোমাসীতে বাস্তু পূজো, বসুমতী পূজো, কাত্যায়নী ব্রত, কার্তিক ব্রত, অম্বিকা পূজো ইত্যাদি ধরনের অনেক পূজো এবং ব্রতের উল্লেখ আমরা আগেই দেখেছি। বলা বাহুল্য, জনসংস্কৃতির সাথে এই ব্রত এবং পূজোগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই এ-জাতীয় উল্লেখের কারণ।

বারোমাসীসাহিত্য নিজেও সংস্কৃতির অঙ্গ। তার বিপুলতা এবং উৎকর্ষ তাই অতীতের বাংলার ব্যাপক সংস্কৃতিচর্চার সাক্ষ্য দেয়। তবে, বারোমাসীসাহিত্যে বাঙালীর মানসলোকের কিছু পরিচয় থাকলেও এ-

জাতীয় রচনা যে সব সময় সুনির্দিষ্ট পথে বিশেষ কোনো লক্ষ্য নিয়ে চলেছে, তা নয়। বিপুলতা আর উৎকর্ষের পাশাপাশি বিষয়াদির পুনরাবৃত্তিজনিত গতানুগতিকতাও তো আছে। এই গতানুগতিকতা যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে আংশিক অচলাবস্থার স্বাক্ষর বহন করে, তা বলাই বাহুল্য। লৌকিক এবং অভিজাত উভয় সাহিত্যের বারোমাসীতেই এর অজস্র প্রমাণ আছে। এখানে অভিজাত সাহিত্য থেকে মাত্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ষোড়শ শতকের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গৌরাঙ্গ-বারোমাসীতে বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসের নাম নিয়ে সন্ন্যাস-গ্রহণাভিলাষী চৈতন্যদেবের জন্যে আকুতি প্রকাশ করেছেন এই ভাবে,—

> ...অঘ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
> সর্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
> পাটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
> সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥...

ঠিক এমনি ভাবই ব্যক্ত হয়েছে লোচন দাসের সমকালীন কবি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ, বিষ্ণুপ্রিয়ার বারোমাসীতে। জয়ানন্দ অবশ্যি কালের উল্লেখ করেছেন অন্যভাবে, অগ্রহায়ণের পরিবর্তে 'হেমন্ত' বলে,—

> ...হেমন্তে নূতন ধান্য জগতে প্রকাশে।
> সর্বসুখময় গৃহ কি কার্য সন্ন্যাসে॥
> পাটনেত ভোট শ্বেত খলিত কম্বলে।
> সুখে নিদ্রা যায় আমি থাকি পদতলে॥...

বারোমাসীর এই আত্মকণ্ডূয়ন অবশ্যই বিরক্তিকর। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এর অনাড়ম্বর রচনাও প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ। (হয়তো এই সমৃদ্ধি তথা এর আবেদনই পুনরাবৃত্তির বা অনুকরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।) রওশন ইজদানী ময়মনসিংহ জেলা থেকে ছোট্ট একটি লৌকিক বারোমাসী সংগ্রহ করেছেন। বাক্‌সংযম, ভাবস্পন্দ এবং সুরময় কাব্যমাধুর্যে এর সমপর্যায়ের বারোমাসী খুব কমই মিলবে। এখানে বারোমাসীটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করছি,—

কত পাষাণ বান্‌ছ রে সাধু তোমারো অন্তরে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আষাঢ় মাসে বর্ষিষার জল,
শায়ন মাস কাটাইলাম আমি সায়রে সায়রে ॥
ভাদ্র মাসে তালের পিঠ্যা, আশ্বিন মাসে শসা মিঠ্যা,
কার্তিক মাস কাটাইলাম আমি কাতরে কাতরে ॥...

অনেক কাল আগে থেকেই বারোমাসী রচনার ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে বলে এতে নানা অঞ্চল আর যুগের বহু শব্দ এবং কথা পাওয়া যায়। এই সব শব্দ এবং কথার অনেকগুলিই হয়তো এখন দুর্বোধ্য। কিন্তু এগুলি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবর্তনের সাক্ষী। আমি এখানে অপরিকল্পিত-ভাবে নির্বাচিত কিছু শব্দ উদ্ধৃত করছি,—'সবানে পূজিল চাঁদ রাজা' ('ষষ্ঠীবর দত্তের মনসার বারোমাসী), 'কার্তিকে সোলুঙেতে নাহিক আকুলা (রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এ সংকলিত শিবের বারোমাসী), 'হরিণ বদলে পাই পুরানা খোশালা (কবিকঙ্কনের ফুল্লরার বারোমাসী), বেহুড়া যুবতী' (কমলার বারোমাসী), 'সিঁথির সিন্দুর আমার মৈলাম হৈল, আসমানের চন্দ্র সূর্য আবেতে ঘিরিল, (ফরিদপুরের চিলার বারোমাসী), আন্ধা বিয়া দিতো মোরে নাইয়াদরির ঠায় (ময়মন-সিংহের নারীর বারোমাসী), 'কোন কালে শান্তি কন্যা বোদোর হইতো নয়' (চট্টগ্রামের শান্তির বারোমাসী) ইত্যাদি। বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির 'পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্যে এই ধরনের শব্দের সংগ্রহ আর পর্যালোচনা অপরিহার্য।

ওপরে বারোমাসীর যে সমস্ত আঙ্গিকগত এবং বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা গেল, বলা বাহুল্য, বারোমাসীসাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে সেগুলিই সব কথা নয়। যেহেতু বাংলায় বারোমাসীর ব্যাপক বিকাশ ঘটে, সেজন্যে তার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনায় আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। বাংলা বারোমাসী প্রাচীন যুগ থেকেই লৌকিক-অভিজাত উভয় সাহিত্যশাখাতেই বিকাশ লাভ করে। তাই, তার সাহায্যে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং

ধর্মনৈতিক বিবর্তনের যতোটা পরিচয় পাওয়া যাবে, তা বোধ হয় সাহিত্যের আর কোনো অঙ্গ থেকেই পাওয়া সম্ভব নয়।

তবু, দুঃখের বিষয়, বারোমাসীর আঙ্গিকে কৃত্রিম ভাবের দুই-একখানি গান রচনা করা ছাড়া তার সম্পর্কে আমরা খুব বেশী সচেতন নই। বারো-মাসী সংগ্রহে আজও আমরা কার্যতঃ নিস্পৃহ। আমার আশা, বাংলা-দেশের জনসাধারণ অবিলম্বে বারোমাসীসাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং সর্ব শ্রেণীর বারোমাসী সংগ্রহে আর পর্যালোচনায় তৎপর হবেন।

[১৯৬২]

সমকালীন ছোটো গল্পের ধারা

সমকালীন ছোটো গল্প-সম্পর্কিত এক ঘরোয়া আলোচনায় কোনো তরুণ লেখক একদা মন্তব্য করেছিলেন, বেশ একটা সমস্যায় পড়া গেছে। ছোটো গল্পের রাজ্যটা এখন যেন আপা আর দিদিদের দখলে। যেদিকে তাকাই, দেখি, শুধু ওঁরাই। ছোটো গল্পের প্রতিশব্দ কি আপা বা দিদিদের গল্প ?

বলা প্রয়োজন, উপরি-উক্ত মন্তব্যের সাধারণ লক্ষ্য ছিলো উভয় বাংলার ছোটো গল্প এবং বিশেষ লক্ষ্য, স্বাভাবিক কারণেই, এখানকার বিভাগোত্তর কালের গল্প। এবং দুই বাংলার গল্পীকে একই পঙ্‌ক্তিতে পিঁড়ি পেতে দেওয়ার কারণ, মন্তব্যকারীর মতে, এখানকার গল্পে পশ্চিম বাংলার মেজাজের অন্ততঃপক্ষে আংশিক প্রতিফলন।

মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা তর্কাতীত, এমন কথা নিশ্চয়ই কেউই বলবেন না। বস্তুতঃ, এখানকার ছোটো গল্পে পশ্চিম বাংলার সমকালীন ছোটো গল্পের ছায়াপাত ঘটেছে,—এই হেতুবাক্য বা পূর্বমীমাংসা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আমাদের ছোটো গল্প, বিশেষতঃ, সাম্প্রতিক গল্পগুলি আদৌ আপাপ্রধান কিনা, সে-সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, আপাপ্রাধান্যটা কি সত্যিই কোনো সমস্যা, না, সমস্যার লক্ষণ বা পরিণতি ? এবং সবশেষে, এটা সমস্যা, লক্ষণ বা পরিণতি যা-ই হোক না কেন, এর শক্তি কিংবা ব্যাপ্তি কি সত্যিই উদ্বেগজনক ? সন্দেহ নেই, ইত্যাকার একাধিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির ওপরই উপরি-উক্ত মন্তব্যের তথা উত্তরমীমাংসার সাফল্য নির্ভরশীল। আরো লক্ষণীয়, সব কটি জিজ্ঞাসাই কোনো না কোনোভাবে এখানকার সমকালীন ছোটো গল্পের গতি-পরিচয়ের মুখাপেক্ষী। তাই, সংক্ষেপতঃ, ওই পরিচয়ই উত্তর-মীমাংসার পথ সুগম করে দেবে।

কিন্তু আমাদের ছোটো গল্পের গতি-পরিচয়টুকু জেনে নেয়ার আগে তার প্রাথমিক পরিবেশ আর পরিণতি সংক্রান্ত দুই-একটি কথা জেনে নেয়া প্রয়োজন। কেননা, কোনো বস্তুই বিচ্ছিন্ন কোনো যুগের বৃত্তে বন্দী থাকে না।

আমাদের ছোটো গল্পের জন্ম কবে হয়েছিলো,—এ-প্রশ্নের উত্তরে কোনো তিথি-লগ্নের উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি বলি, তার বীজপত্র দেখা যায় আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বিভাগোত্তর কালের অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশের শুরুতে, তাহলে হয়তো মিথ্যাকথনের দোষ ঘটবে না। (দেশবিভাগের পর স্বদেশের পরিবেশে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে এখানকার মানুষ তার যে অন্তরঙ্গ পরিচয় পায় এবং সেই পরিচয় তাদের মনে যে অনুভূতির জন্ম দেয়, তাকেই আমি এই আলোচনার জন্যে চিহ্নিত করছি বিভাগোত্তর কালের অভিজ্ঞতা বলে।) এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিতে পারে কেবল তখনই, যখন তা হয়ে ওঠে বেশ কিছুটা ঋদ্ধ এবং তীব্র। এটা সময়-সাপেক্ষ এবং সাহিত্যে তার যে অস্তিত্ব পরিস্ফুট হয়, সেটুকু তাই বয়েসে দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে অর্বাচীন। এসবের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নেই। তবু বলে রাখা প্রয়োজন আদি পর্বে নবলব্ধ স্বাধীনতা এখানকার জনসাধারণকে স্বাভাবিক কারণেই তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলো এবং তাদের চেতনা ছিলো অত্যন্ত প্রখর। দেশজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এর প্রয়োগই হয়েছে তাদের কাছে কাম্য। বিভাগপূর্ব যুগে কল্পিত ধ্যানধারণার সাথে বেশী দিন এর মিতালির জের টেনে চলা যে সম্ভব ছিলো না—কিংবা বাঞ্ছনীয়,—তা সহজেই অনুমেয়। কেননা, নদীজলের মতো চিন্তাধারাকেও মানতে হয়, গতিই তার প্রাণ। এই-ই স্বাভাবিক। বয়োবৃদ্ধিকে উপেক্ষা করে যারা আঁতুড়ঘরের পোশাক আর অনুভূতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছে, তাদের সাথে জনসাধারণের গতির বৈষম্য তাই অচিরেই হয়ে উঠেছে অনিবার্য।

কোনো দেশ বা সাহিত্যের পঁচিশ-তিরিশ বছরের জীবনকে যদি সত্যিই পর্বে পর্বে খণ্ডিত করে দেখা সম্ভব হয়, তাহলে বলা চলে, কালের

সাক্ষী হিসেবে এই সময়কার গোড়ার দিকের সাহিত্য বিশেষ একটি পর্ব'নাম পেতে পারে। অলোচনার সুবিধার জন্যে এর নাম দেওয়া যাক অভ্যুদয় পর্ব'। এ-পর্বে আমাদের সাহিত্যের প্রধান অংশ ছিলো কবিতা আর ছোটো গল্প। কবিতার বক্তব্য আত্মপ্রচারের জন্যে বর্ণনামূলকভাবে ঘটনার কাঁধে ভর করে না। কিন্তু গল্পের বক্তব্যের জন্যে বাহ্যিক বা মানসিক ঘটনার উল্লেখ (বলা বাহুল্য, প্রতীকী) অপরিহার্য। সুতরাং একথা ধরে নিলে অন্যায় হবে না যে, অভ্যুদয় পর্বে' আমাদের সাহিত্যে কালের স্বাক্ষর বর্ণনামূলকভাবে দেখা দিয়েছিলো—উপন্যাসের সঙ্কটজনক অভাবে—প্রধানতঃ ছোটো গল্পে।

আগেই বলেছি, সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের জন্যে অভিজ্ঞতার বেশ কিছুটা ঋদ্ধ এবং তীব্র হওয়া প্রয়োজন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো খানিকটা বয়স্কও। বিভাগোত্তর যুগের প্রথম দিকে আমাদের স্থানীয় অভিজ্ঞতার বয়েস এবং ঋদ্ধি দুই-ই ছিলো অল্প। সে-সময়ে আমাদের গল্পীরা তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের জীবনবোধ আর ভবিষ্যৎ-জিজ্ঞাসাকে অনেক ক্ষেত্রেই তুলে ধরেন প্রাক্-বিভাগ যুগের পটভূমিতে (আবু জাফর শামসুদ্দীন: 'নেতা')। আবার, এমন সমস্যার অবতারণাও দেখা গেছে, যার ভিত্তি হিসেবে এখানকার বিভাগপূর্ব' কালের মুসলিম সমাজকে গ্রহণ করা যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব বিভাগোত্তর কালের মুসলিম সমাজকে গ্রহণ করাও (সরদার জয়েনউদ্দীন: 'ভাবী', আলাউদ্দিন আল আজাদ: 'সুরমা')।

তবু স্বীকার্য, বিভাগোত্তর অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশের সূচনা এইখান থেকেই। বিভাগপূর্ব' যুগে মুসলিম লেখকদের গল্পে উপরি-উক্ত শ্রেণীর বিষয়ের ব্যবহার দেখা গেছে কদাচিৎ। স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারে, বিভাগোত্তর কালের পরিবেশই ছিলো এই সব বিষয় তথা সমস্যার রূপায়ণে প্রধান সহায়ক।

অভ্যুদয় পর্বে'র শেষ দিকে, দেশবিভাগের চার-পাঁচ বছর পর, এখানকার মানুষের জীবনচেতনা নানা কারণে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিকশিত হতে থাকে। এবং সেই সঙ্গে ব্যাপ্তও। এ-সময়ের ছোটো গল্পে বিভাগোত্তর কালের অভিজ্ঞতার প্রকাশ সর্বব্যাপী হয়তো নয়,

কিন্তু বিস্ময়কর স্পষ্টতায় পাঠকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমাদের গল্পীরা তখন এক দিকে যেমন দাঙ্গা আর ভাষা আন্দোলনের মতো বড়ো ঘটনাকেও ছোটো গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে টেনে নিয়ে আসেন, অন্য দিকে তেমনি সমাজের অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত গলি খুঁজিতেও উঁকি দিতে থাকেন। নতুন-পুরাতনের বিরোধ (শাহেদ আলী: 'নানীর ইন-তেকাল,' সৈয়দ শামসুল হক: 'তাস'), গ্রামীণ মানুষের জীবনসংগ্রাম (আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী: 'মাস কাটাল', জহীর রায়হান: 'বাঁধ', মিরজা আ, মু, আবদুল হাই: 'মেহেরজানের মা'), শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি (আলাউদ্দিন আল আজাদ: 'টেবিল ঘড়ি'), মোহাজের সমাজের সমস্যা আর তার বিপদ (শওকত ওসমান: 'গেঁহু,' সিরাজুল ইসলাম: 'নাচ') 'দুম'র মানবতাবোধ (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'. হাসান হাফিজুর রহমান: 'আরো দুটি মৃত্যু') ইত্যাদি বহুবিধ ভাব আর বিষয়ের স্পর্শে এ-সময়ের ছোটো গল্প এক স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে ঝলমলে হয়ে ওঠে। পরিমাণের প্রাচুর্য তখন ছিলো না। তবু, এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি আজও আমাদের কথাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

আমার উপরি-উক্ত মন্তব্যের অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, অভ্যুদয় পর্বের দুর্বলতা বলতে কিছুই ছিলো না। এ-সময়ে জীবনবিমুখ চিন্তাধারা হয়তো জোয়ারের তারুণ্যে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তার ক্ষীণ একটা স্রোত পূর্বোক্ত জীবনবাদী ধারাকে বরাবরই সমান্তরভাবে অনুসরণ করেছে। এই ধারার তৎকালীন কোনো সাহিত্যিক পরে আর এর নিষ্ঠাবান অনুসারী থাকেননি। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য, সে-সময়ে কোনো কোনো প্রতিশ্রুতি-মান গল্পীর লেখনীও দ্বিধাহীন মনে ধারাটিকে সমর্থন করে (আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী: 'আদিম', 'সম্রাটের ছবি')। অন্য দিকে, বিষয়গত অনুকরণের একটা প্রবণতাও অনেক গল্পীকে টেনে নিয়ে যায় পিচ্ছিল স্খলনের পথে (আলাউদ্দিন আল আজাদ: 'মহামুহূর্ত')। এ-যুগের দুজন প্রগতিশীল লেখকের দুটি প্রশংসিত (!) গল্পে আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর নির্লজ্জ আঙ্গিকগত অনুকরণ দেখেছি।

তারপর একদিন আসে পরিবর্তন। যা ছিলো ক্ষীণদেহ, তার অঙ্গে দেখা দেয় পরিপুষ্টির লক্ষণ, পুষ্ট মনের গতি যায় নিস্তেজ হয়ে। তার ফল, গৌণের আসনে মুখ্যের এবং মুখ্যের আসনে গৌণের প্রতিষ্ঠা।

এর কারণ অনুসন্ধান করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন, দিন বদলের পালাটির সূচনা হয় মোটামুটি হিসেবে ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং জের চলে সপ্তম দশকের প্রায় মাঝামাঝি অবধি। এই সময়টি আমি চিহ্নিত করতে চাই বিভ্রান্তি পর্ব বলে। স্মরণ রাখা ভালো, কেবল সাহিত্যই নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক,—সব ক্ষেত্রেই এটা ছিলো বিভ্রান্তির যুগ। রাজনীতিকরা তখন কায়েমী স্বার্থবাদীদের খপ্পরে পড়ে দলীয় কোন্দলে মেতে উঠেছেন, পুঁজিপতি আর মুনাফাখোরদের চক্রান্তে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত। সমাজজীবন বিভ্রান্ত হয় এক দিকে দেশের সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে, অন্য দিকে আদর্শগত মোহভঙ্গের দরুন। বলা নিষ্প্রয়োজন, নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে সমৃদ্ধি আর আদর্শের যে রক্তিম ফলটি তাদের লুব্ধ করেছিলো, অচিরেই দেখা যায়, সেটি মাকাল ছাড়া আর কিছুই নয়। সবশেষে, শিক্ষার অগভীর প্রসার (কেননা, এ-প্রসাব তখনও প্রায় সর্বাংশেই এক পুরুষের) এবং জনবিরোধী, ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়কদের ইতিহাসজ্ঞানহীন মতাদর্শ প্রচারের জিদ সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথে হয়ে দাঁড়ায় প্রবল প্রতিবন্ধক। এমন পরিস্থিতিতে ভ্রান্তি-বিচ্যুতি-বিশৃঙ্খলা দেখা না দেওয়াটাই অস্বাভাবিক। এবং এ-সময়ে কেউ নিজের মন ছাড়া আর কোনো দিকে তাকায় কি? বিশেষ করে, যার চেতনা সমাজবিজ্ঞানের আলোতে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়?

এ-পর্বের ছোটো গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রলক্ষণ কি,—এমন প্রশ্ন উঠলে তাই এক কথায় উত্তর দেওয়া যেতে পারে, বিবিক্ত অন্তর্মুখিতা, জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক অতি শিথিল। কথাটা অনেকের কানেই গুরুতর অভিযোগের মতো শোনাবে। কিন্তু এ-পর্বের গল্পগুলি পড়বার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন, কথাটি কতো সত্যি। এ-সময়কার অধিকাংশ গল্পই প্রাণরসের জন্যে মূল প্রসারিত করে নির্জন মন আর কতকগুলি কাল্পনিক সমস্যার ঊষর পললে। এর প্রমাণ

মিলবে বিষয়ের বিশ্লেষণে। গল্পগুলির পরিসর জুড়ে রয়েছে সন্ত রোগমুক্ত কিশোরীর খেয়ালী পুলকে বাড়ীর সবার চোখ এড়িয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, বাগানের সান্ধ্য নির্জনতায় বুকের বসন অপসৃত করে অষ্টাদশী তরুণীর কাল্পনিক বেদনাকে ভাষায় রূপ দেওয়া, অনূঢ়া এবং চাপা নৈরাশ্যবাদী শিক্ষিকার আত্মরতির রহস্য তুলে ধরা ইত্যাদি ধরনের ঘটনা।

লক্ষণীয়, এই সব গল্পের প্রধান চরিত্র নারী। তারা নানাবিধ বিকৃত, অস্বাভাবিক বা স্বপ্নলোকচারী দেহকেন্দ্রিক চেতনায় উত্তেজিত। এবং তাদের প্রাতিস্বিক উত্তেজনার অভিব্যক্তি ধরা পড়ে কখনো গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ কোনো রোমান্সজীবী তরুণের কাছে, কখনো বা আপাতকুতূহলী দর্শকের দৃষ্টিতে। জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় তারা শুধু একটি পথেরই সন্ধান পায়। সে-পথ যৌনকামনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিতৃপ্তির। যদিও এই পরিতৃপ্তি তাদের ভাগ্যে সব সময় মেলে না।

বর্তমান আলোচনার শুরুতে আমি যে আপা (বা দিদি) সমস্যার উল্লেখ করেছি, তারও মূলে রয়েছে উল্লিখিত দেহকেন্দ্রিক চেতনা। নির্জনতাবিলাসিনী কিশোরী এবং নিষ্ক্রিয়যৌবনা তরুণীদের মতো আপারাও মনোবিকলনের এক-একটি মূর্ত প্রতীক। 'মায়ের প্রতিনিধি' এই আপাদের হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তাঁরা যেন মায়েদের সব অধিকার নাকচ করে ফেলে তাঁদের আসন জুড়ে বসেছেন, নয়তো অন্ততঃপক্ষে মায়েদের ঠেলে দিয়েছেন পর্দার আড়ালে। এবং যদিচ একাকিনী, প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিধানে তাঁরা হয়তো আজও কিছুটা অবলা। তাই, পাঠকজনের সম্মুখে তাঁরা উপস্থিত হন দুই-একটি অনুজ বা অনুজাকে দোসর করে। বলা বাহুল্য, এই অনুজ-অনুজারা তাঁদের সহোদর-সহোদরা নয়, প্রায় ক্ষেত্রেই পাশের বাড়ীতুতো বা পাড়াতুতো, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সহচর-সহচরী। তাদের সাথে আপাদের সম্পর্ক কখনো দরদী স্নেহের, কখনো বা অসম সখ্যের। কিন্তু সেই সম্পর্কই একদিন বিস্ময়কর অবলীলায় সহচর-সহচরীদের সামনে অনাবৃত করে দেয় আপাদের যৌন ভাবনায় পীড়িত মানসলোকের স্বরূপ।

মনের অনাবিষ্কৃতপূর্ব অন্ধকারে বা জটিলতায় দুর্গম বন্ধুর পথে উত্তেজিত বিচরণ বিপদসঙ্কুল, সন্দেহ নেই। কিন্তু অনভিজ্ঞা কিশোরী

আর নিষ্ফলযৌবনা তরুণীরা সেখানে নির্ভীক পথিক। সমাজ-সংসারের রক্তচক্ষু তাদের কাছে অজ্ঞাত বস্তু, সাধারণ জীবনের নিয়মকানুন পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত। অন্য কথায়, তারা যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসিনী। এই নায়িকাদের আবার একটুখানি ভাগ্যের জোরও আছে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের কল্যাণে তাদের যাত্রাপথে কিছুসংখ্যক আধাবয়েসী সঙ্গিনীও জুটে গেছে। এই সঙ্গিনীরা সচ্ছল সংসারের আত্মতৃপ্ত সন্তান, জীবনে সফলকাম স্বামীর সুখী সোহাগিনী, বিলাসের পরিমণ্ডলে মার্জিত রুচিতে মহিয়সী এবং সমাজের উদার আধুনিকতায় অঢেল সম্মানের অধিকারিণী। কিন্তু একদিন প্রখর পৌরুষের সামনে পড়ে তাঁরা দেখতে পান, তাঁদের আত্মতৃপ্তি আসলে আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। বস্তুতঃ, তাঁদের সারাটি জীবন কেটেছে শুধু মরীচিকার পেছনে ছুটোছুটি করে। সুখের মূল উপকরণ যে দৈহিক পরিতৃপ্তি (অবশ্যি, তাঁদের মতে), তার কোনো সন্ধানই তাঁরা এতো কাল পাননি এবং ভবিষ্যতে পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনাই নেই। আত্মআবিষ্কারের এই নাটকীয় মুহূর্তে তাঁদের একমাত্র পরিণতি হয় নৈরাশ্যে ভেঙে পড়া, যা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা অবধি গড়ানোও সম্ভব (আবদুস শাকুর : 'অপরাহ্নে')।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিকৃত মানসিকতাই কি ছিলো আমাদের তৎকালীন সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য? মানসিক অস্বস্থতা যে কোনো যুগে এবং এদেশের সমাজের মতো যে কোনো সমাজেই দেখা দিতে পারে। হয়তো কাঁচাবয়েসী মনে তার প্রকোপের কিছুটা প্রাবল্যও পাওয়া যাবে। কিন্তু সমাজমনে এমন অস্বস্থতার স্থান তো চিরকালই গৌণ। অথচ আমাদের বিভ্রান্তি পর্বের গল্পগুলি পড়লে মনে হয়, এই অস্বস্থ মানসিকতাই যেন তখন এখানকার তরুণ-সমাজের—এবং কিছুটা বা প্রবীণ-সমাজেরও —মনের সবটুকু জুড়ে বসেছিলো। জাতির অন্তরাত্মার পরিচয়, সমাজের বিভিন্ন অংশের পতন-অভ্যুদয়, আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত,—সবই সে-সময়ে তাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। আরো বিস্ময়ের বিষয়, যে-মানবমন আজও ঝানু সমাজবিজ্ঞানীর কাছেও অপার রহস্যের পিচ্ছিল নির্মোকে গুণ্ঠিত, বহুজনের প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতায় নিষ্ঠাবান কারবারী মনোবিজ্ঞানীর চোখেও অনেক জানা অথচ সবটুকু জানা নয়, আমাদের গল্পীদের দৃষ্টিতে

তা হয়ে গেছে চৌবাচ্চার জলের মতো স্বচ্ছ। তাঁদের যেন এই মনের —বিশেষ করে, কিশোরী আর তরুণী-মনের—কোনো কিছুই জানতে বাকী নেই! (আমার এ-বক্তব্যের ভিত্তি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। বিভ্রান্তি পর্বের কোনো এক সময় আমি পর পর দু'মাস ঢাকার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির বিষয় লক্ষ্য করি। আমার সংগৃহীত পরিসংখ্যানের রায়, সে-সময়কার শতকরা প্রায় তিরাশিটি গল্পের লক্ষ্য ছিলো তরুণী-মনের রহস্যের বিশ্লেষণ।)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মানসলোকের কাহিনীগুলির যাঁরা প্রধান পরিবেশক, গল্পীকুলে তাঁদের পরিচয় তরুণ নামে। মানুষ সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার পুঁজি স্বাভাবিক কারণেই অল্প। কিন্তু কাহিনীগুলিকে শুধুমাত্র ভাবপ্রবণ তরুণ-মনের কল্পনাবিলাস ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবেন, এমন ভাগ্য বোধ হয় এদেশের কোনো পাঠকই নিয়ে আসেননি। কেননা, তরুণ লেখকগোষ্ঠীর পাশে প্রবীণ সতীর্থেরও অভাব নেই। জানতে ইচ্ছে হয়, যে-সমাজে শিক্ষা আর আধুনিকতা অতি দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করলেও নারী-পুরুষের জন্যে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার অবকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল আপন আপন পরিবারের চৌহদ্দিতে সীমায়িত, সেখানে আমাদের গল্পীরা নারীমানসের সকল রহস্যের সমাধান এতো সহজে খুঁজে পেলেন কোন্ যাদু বলে?

কিন্তু শুধু প্রশ্নই নয়। গল্পগুলি পড়তে বসলে পাঠকের মনে প্রশ্নের সাথে সাথে জেগে ওঠে একটা দুঃখের অনুভূতি। অনেক গল্পেই দেখা যায়, লেখকের ভাষা এক অপরূপ রঙে উজ্জ্বল, কলাকৌশল অভিনবত্বে মনোহর। ভাষা আর কলাকৌশলের নতুনত্ব গল্পে যে প্রসাদগুণ এনে দেয়, তার আবেদন পাঠকজনের কাছে নিঃসন্দেহে দুর্বার। কিন্তু রচনার এই সব শিল্পগত গুণ যেখানে শুধুমাত্র তার বহিরঙ্গের ভূষণ, সেখানে এগুলির অন্তরের বাণী আশা করা বৃথা। বহিরঙ্গের আবরণ সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলে বুঝতে বাকী থাকে না, তার আদর কেবল সযত্নে লালিত এক বাস্তববিমুখ চেতনাকে বাঁচাবার আয়োজনে।

এই আয়োজন আরো বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে, যখন দেখি, তার সাথে হাত মিলিয়েছে উদ্ভট ঘটনার সুনিপুণ বিন্যাস এবং লেখক

হিসেবে যাঁরা যথারীতি স্বীকৃত, তাঁরাও এ-হেন ঘটকালির লোভ সংবরণে অপারগ (আলাউদ্দিন আল আজাদ : 'জরীপ', আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : 'ইতিহাস')। এসবের সাথে প্রগতিশীলতার ভিয়েন দেওয়ার চেষ্টাও কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু এ-ধরনের ভিয়েনে লাভ কি? এতে দুর্বল ঘটকালিকে শক্ত ভিত দেওয়ার চেষ্টায় (শওকত ওসমান : 'উভসঙ্গী') বা আশাভঙ্গের কিলঘুষি চুরি করে প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার প্রয়াসে (শওকত আলী : 'অনির্বাণ') কারুকাজ যতোই থাক, জনমনের সামনে তার মুখে কখনো কথা ফোটে না। বহিরঙ্গের ভূষণটাই যেখানে বড়ো, সেখানে শতো বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ব্যর্থতা তাই অবধারিত। নিটোল অবয়ব আর নয়নাভিরাম রঙ দিয়ে মাকাল ফল তার অভ্যন্তরের অসারতা কোনো দিন ঢেকে রাখতে পেরেছে, এমন তথ্য মানবসমাজে আজও অজ্ঞাত।

প্রসঙ্গতঃ আরো দুই-একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। ওপরে যে বিষয়বিলাস এবং ভাষা আর কলাকৌশলের উল্লেখ করেছি, সেগুলিকে যদি সব ক্ষেত্রেই দেশজ বলে মেনে নেয়া যেত, তাহলে হয়তো পাঠকদের সান্ত্বনার তেমন অভাব হত না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার সমকালীন গল্পধারার সাথে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন, বিভ্রান্তি পর্বের আপারা (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবী) আসলে বিমল মিত্র বা বিমল করের মতো গল্পকারদের দিদি আর বৌদিদিদেরই এদেশী সংস্করণ। আরো লক্ষণীয়, ওই দিদি আর বৌদিদিরা এদেশে তশরিফ এনেছেন স্বগৃহের তামসিক প্রবণতাকে সারা জীবনের পুঁজি হিসেবে পেঁটরায় পুরে সঙ্গে নিয়ে। আবার ভিন্নতরো পরিবেশের মেয়েরা এদেশে এসে স্বদেশের রক্ষাকবচও কিছু কম পাননি। তার একটি প্রমাণ এদেশের গল্পে ওদেশের সন্তোষ ঘোষ প্রমুখ লেখকের ফুটনোটের ফুটকি আর বন্ধনীর বাঁধনের ছায়াপাত। এমনকি, ভাব আর বিষয়ও যে আমদানি করা সম্ভব (অবশ্যি, কিছুটা ভোল ফিরিয়ে, নইলে চোরাকারবারের দায়ে মামলায় পড়বার ভয় থাকে), তাও কোনো কোনো গল্পে দেখেছি এবং এই গল্পগুলি লিখেছেন এখানকার কয়েকজন খ্যাতনামা গল্পকার। অনুকরণের এ-জাতীয় জোয়ারে ভাটার টান কবে আসবে?

কিন্তু পরিস্থিতি যতোই তমসাময় থাক, আশার আলো তখন কোথাও ছিলো না, এমন কথা মানতে আমি কিছুতেই রাজী নই। সত্যের সন্ধান মানুষের চিরকালের লক্ষ্য এবং সে-লক্ষ্য দুর্মর। সমকালীন ছোটো গল্পের অভ্যুদয় পর্বে দেশজ অভিজ্ঞতার যে রূপায়ণ শুরু হয়, তা তাই থেমে যেতে পারেনি। হয়তো তার ধারা ছিলো ক্ষীণ। হয়তো বা তার মধ্যে থেকে যায় কিছুটা আন্দাজী অভিজ্ঞতার মিশেল বা ঘটনার অতিরঞ্জন (আলাউদ্দিন আল আজাদ: 'সমতল,' স্রষ্টা', শাহেদ আলী: 'পুতুল')। কিন্তু তার শক্তিকে অস্বীকার করবার উপায় ছিলো না। বরং দেখা যায়, বিভ্রান্তির মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধের কিছু উপনদী তাকে জলের যোগান দিয়ে ভরে তুলতে চেয়েছে (আনিসুল হক: 'বাঁচবার জন্যে', মীর আবুল হোসেন: 'কাণ্ডারী')।

আশার অবস্থি এইখানেই শেষ নয়। এর পরেও আমরা আশার দ্যুতি দেখেছি এবং ক্রমে তা বলবতীও হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, তার বল সঞ্চারে ক্ষীণধার উপনদীসমূহের ভূমিকা অনুপেক্ষ্য। কেননা, কালক্রমে তারাও চড়া ভাঙতে শিখেছে। এবং তার চেয়েও বড়ো ঘটনা নবতরো আশার উন্মেষ। যার সূচনা বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়াসে, পুরোণো ভিটেয় নতুন ইমারত তোলবার চেষ্টায়। এক ঘরে মানুষ আজীবন বাস করে কেবল গত্যন্তরের অভাবে। মন চার দেয়ালে ঘেরা থাকে কদাচিৎ। সে চায় কেবলই নতুনের স্বাদ, পুরোণো ভিটেয়—অন্ততঃপক্ষে পুরাতনের পাশে—নতুন ভবন গড়ে তুলতে।

বিভ্রান্তি পর্বের পর আমাদের ছোটো গল্পে যেসব প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, সেগুলির মধ্যে এই নতুন ইমারত নির্মাণের প্রবণতাই সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সবচেয়ে প্রবল। উপসর্গের বুনিয়াদে এ-পর্বের নাম দিতে পারি তাই নবনির্মাণ পর্ব। কালের হিসেবে এই পর্বের বয়েস এখনো এক দশকও পার হয়নি। যদিচ এর কিছু কিছু লক্ষণ সপ্তম দশকের গোড়ার দিকেই উঁকি দিয়েছে। পর্বটির চরিত্রলক্ষণ নির্ভুলভাবে স্পষ্ট হয় ওই দশকের মাঝামাঝি সময়ে। এবং আজও তারই জের চলেছে।

আমার পরবর্তী বক্তব্যগুলির নিরাপত্তার খাতিরে পূর্বাহ্লেই একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিয়ে রাখা প্রয়োজন। প্রশ্নটির অনুমিত রূপ ঃ নবনির্মাণ মাত্রেই কি গ্রহণীয়? এই ঢাকা শহরেই তো স্থাপত্যের এমন বহু নিদর্শন আছে, যেগুলি খ্যাতনামা স্থপতির পরিকল্পনার ফল হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহারিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক উভয় আদর্শের বিচারেই কেবল বিবমিষার জনক। এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি পর্বের পথভ্রষ্ট লেখকেরা কি মনে মনেও কখনো এমন দাবী করেননি যে, তাঁদের সৃষ্টিও নবনির্মাণ? অথচ তাঁদের রচনাবলীকে তো পাঠকরা অকুণ্ঠিত চিত্তে কাছে টেনে নিতে পারেনি। কোন. নবনির্মাণকে তাহলে গ্রহণীয় বলে জানবো?

এ-প্রশ্নের উত্তরে সহজেই বলা যেতে পারে, সেই নবনির্মাণই গ্রহণীয়, যা সত্যিই নতুন, সেই সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং অবশ্যই আমাদের সৌন্দর্যপিপাসা মেটাতেও। শিল্পের খাতিরে শিল্পের দিন আর নেই। এবং শুধুমাত্র নতুন বলেও কোনো কিছু মানবসমাজের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না। অন্য দিকে, নব-নির্মাণ মাত্রেই উৎরোবে, এমন গ্যারান্টিই কি আছে? নবনির্মাণের পেছনে তো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও থাকে, কেবল নির্ভুল পরিকল্পনাই তার প্রেরণার উৎস নয়। অন্য কথা বাদই দিলাম,—পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভুল-ভ্রান্তিও কি ঘটে না? আবার, একথাও তো সত্যি যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে বা সুযোগ নিয়ে অনেকে অনাসৃষ্টিতেও মেতে উঠেছেন (আবু কায়সার ঃ 'গুহা')। তাই, নির্মাণ যতোক্ষণ না চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়,—আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যাদের জন্যে নির্মাণ, তাদের আন্তরিক এবং প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিক বিচারের ফলাফল যতোক্ষণ না পাওয়া যায়, ততোক্ষণ কিছুতেই আমরা তার সার্থকতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। তবে, আমাদের জন্যে ভরসার কথা এই যে, নবনির্মাণ পর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা সৃষ্টির সাধনার শুরু কার্যতঃ প্রতিবাদী চেতনা আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

মুক্তি লাভের চেষ্টার কথা একটু আগেই বলেছি। সেটা কার্য। তার কারণ ছিলো প্রতিবাদী চেতনা। সরল হিসেবে মনে হবে, এই

চেতনা প্রত্যক্ষতঃ বিভ্রান্তিতে বিরক্তির ফল। এ-হিসেব একেবারে ভুল নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আসলে প্রতিবাদী চেতনার মূল নিহিত ছিলো আরো গভীরে, সমাজের মাটিতে। মনে রাখা ভালো, ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলা আমাদের জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত একনায়কত্ব যে নিপীড়ন শুরু করে, তাতে অতিষ্ঠ হয়ে সপ্তম দশকের গোড়ার দিকেই সমাজের অবশিষ্ট বিবেক প্রতিবাদী চেতনার রূপে দানা বাঁধতে থাকে। তারপর এই প্রতিবাদী চেতনা তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন, সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির বেড়া ঠেলে এবং ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে এসে এক সময় প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে। ইতিহাসের নিয়মে এই-ই ছিলো স্বাভাবিক।

অস্থিরতা তথা ভাঙাগড়ার এই পর্বটির দৈর্ঘ্য, আগেই বলেছি, এখনো এক দশকের সীমা পেরোয়নি। এতো হ্রস্ব যে সময়, তার সৃষ্টির বিস্তারিত বা চুলচেরা হিসেব নিতে বসবার বিপদ তাই অনেক। বিশেষ করে, যখন দেখি, এ-পর্বের ঘটনাবলীর সঠিক তাৎপর্য এখনো আমাদের অনেকের মনেই থিতোনোর অবকাশ পায়নি। এবং একথা সর্বজনজ্ঞাত যে, কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে না জানা অবধি তার সম্পর্কে নির্ভুল রায় দেওয়া সম্ভব নয়। তবু, নবনির্মাণ পর্বে আমরা সৃষ্টির যে প্রবল তাগিদ দেখেছি, তার চরিত্র বুঝতে আমাদের তেমন কোনো কষ্টই হয় না। এ-চরিত্র প্রায় সর্বগ্রাসী। নবীন-প্রবীণ কাউকেই সে রেহাই দিতে চায়নি।

কিন্তু নবনির্মাণের সূচনা, সৃষ্টিলোকের স্বাভাবিক নিয়মেই, নবীনদের হাতে। এবং এই নবীনদের অধিকাংশেরই লেখক-জীবনের শুরু প্রকৃত-পক্ষে সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে। প্রথম প্রয়াসের কালে তাঁদের সবাই যে পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তা নয়। পাবেনই বা কেমন করে? নতুন তো কখনো আগে থেকেই কাঙ্ক্ষিত রূপ নিয়ে পরিচিত বা নির্দিষ্ট কোনো পথপ্রান্তে বসে থাকে না। তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয়। আর, এই গড়ে তোলবার কাজে কলাকৌশলের এমন কিছু দিক আছে, যার প্রয়োগই প্রথম প্রয়াসে সর্বদা সম্ভব নয়।

তার ওপর, নবনির্মাণের সূচনার অতীতকে অস্বীকার করতে গিয়ে কোনো কোনো নবীন লেখক নিজেদের একেবারে ছিন্নমূল ভেবে বসেন। ঠিক যেমনটি দেখা যায় আমেরিকার 'লস্ট জেনারেশন'-এর লেখকদের ক্ষেত্রে। এ-ভাবনা যে সমাজকে গড়ে তোলবার প্রয়াসে সমাজকে অস্বীকার করা, তা ওই নবীন লেখকরা বোঝেননি। তাই, তাঁরা হয় কেবল ভাঙনের বা হারানোর ছবি দেখেছেন, (আবদুল মান্নান সৈয়দ : 'সত্যের মত বদমাশ' 'চাবি'), নয়তো নিজেদের কল্পিত এক নিঃসঙ্গ, আপনাতে আপনি বন্দী রূপ (আখতার উজ্জ্বীন ইলিয়াস : 'চিলেকোঠায়')। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, যার মন সমাজে সংস্থিত, তার কখনো কেবল হারানোর ভয় থাকে না এবং নিঃসঙ্গতারও। কেননা, সমাজে কেউই কখনো অনন্য নয়। কিংবা অনন্যনির্ভর। একজন না একজন সহমর্মী যে কেউ খুঁজে পেতে পারে।

এরই সঙ্গে আরো দেখি, সৎ সৃষ্টিতে আন্তরিক তাগিদ অনুভব করা সত্ত্বেও, নবনির্মাণের অতি উগ্র উৎসাহে ক্লিশ্যমান কিছু লেখক ইমারতের এমন সব কাঠামো গড়ে তুলেছেন, যা নয়নাভিরাম অবশ্যই, কিন্তু গণপ্রবেশের একান্তই অনুপযোগী (হুমায়ুন চৌধুরী : 'নশ্বর স্রোত')। নবনির্মাণের ধারা পর্যবেক্ষণে যাঁরা স্থিরদৃষ্টি, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, এই দুর্বোধ্যতার তথা ক্লিষ্ট অতিবুদ্ধিবাদের মূল কোথায়। এদেশে জয়েস-কাপোট-কেরুয়াকের সাম্প্রতিক ছায়া তো এতো অস্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, ওই লেখকদের অনেকেই যখন স্বদেশেও অতিক্রান্ত, অবহেলিত কিংবা প্রায় বিস্মৃত, তখন অনন্য আবিষ্কারের মতো করে তাঁদের লুফে নেয়ার মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? এ-প্রশ্ন তোলবার বিশেষ একটি দুঃখজনক কারণও আছে। আমাদের নবীন গল্পকারদের কেউ কেউ উক্ত লেখকদের রচনাবলীর কেবল বহিরঙ্গের রূপের নতুনত্বেই মুগ্ধ হয়েছেন, তার নির্মোক ভেঙে অভ্যন্তরের ভাবলোকে বা জীবনচেতনার গভীরে প্রবেশ করেছেন কদাচিৎ। যখন দেখি, চৈতন্যপ্রবাহের মতো বাসি জিনিষ,—যা কেবল পশ্চিম বাংলার সাহিত্যেই নয়, এখানকার সাহিত্যেও পঞ্চম দশকের শেষ দিকেই পৌঁছে গিয়েছিলো,- তাকেও কেউ কেউ একান্ত নতুন আবিষ্কার ভেবে 'ইউরেকা, উরেকা' বলে গলা ফাটিয়ে মরছেন, তখন হাসি চাপতে আমরা সত্যিই বেগ পাই।

কিন্তু সুখের বিষয়, এ-জাতীয় লেখকদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য এবং তাঁদের এমন লীলাকালও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কোনো কোনো লেখক মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাচারী লীলার গণ্ডী থেকে বেরিয়েও এসেছেন (আবদুল মান্নান সৈয়দঃ 'মাংস')। আবার, উক্ত দলের লেখকরা যখন রীতিমতো সক্রিয়,—এমনকি, তাঁদের কেউ কেউ যখন নবনির্মাণ আন্দোলনের নেতা বা পুরোধা বলে ব্যাপকভাবে নন্দিত,—তখন, তাঁদের পাশে থেকেই, আর এক দল নবীন লেখক এগিয়ে আসেন সৃষ্টির সুস্থ, অর্থবহ সাধনায়। বয়েসে তাঁদের অনেকেই অতি-তরুণ, সুতরাং লেখকরূপে আত্মপ্রকাশে তখনও প্রাথমিক ভীরু কাশি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অপিচ, তাঁরাও যে সব ক্ষেত্রেই তাঁদের সৃষ্টিকে পাঠকজনের হাতে সর্বতোভাবে গ্রহণীয় রূপে তুলে দিয়েছেন, তাও বলা চলে না। তবু একটি কথা নিঃসঙ্কোচেই স্বীকার্য। তাঁদের সৃষ্টির প্রয়াস সত্যিই অকপট এবং জীবনমুখী। তাই, আঙ্গিকের কারুকার্যে মগ্নচেতন হয়েও নবনির্মাণে তাঁরা সমাজের কাছে তাঁদের দায়িত্বের কথা ভুলে যাননি। সেই দায়িত্বের তাগিদে তাঁরা কখনো মানবতাবিরোধী দুষ্কৃতির প্রতিবাদে (হায়াৎ মামুদঃ 'অবিনাশের মৃত্যু'), কখনো জীবনচেতনার প্রেরণায় (শাহজাহান হাফিজঃ 'অসুখে একজন'), কখনো বা দরদী জীবনবাদে (আবুবকর সিদ্দিকঃ 'চাঁদের কাছাকাছি') নিজেদের রচনাকে সম্পন্ন করে তুলেছেন।

সবচেয়ে বড়ো আনন্দের কথা, নবনির্মাণের উৎসাহ আমাদের প্রবীণ এবং পূর্বপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। এ-দলে যাঁরা জীবনপ্রেমী, সমাজের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, তাঁরাও অনুভব করেন, আমাদের ছোটো গল্পকে এবার নতুন পথে চালানো প্রয়োজন। বুঝতে পারেন পুরাণো পোশাকে, পুরাণো বক্তব্যে আর তাকে গতিশীল, অগ্রসরমান সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের প্রাথমিক প্রয়াস অবশ্যি কেবল সুস্থ চেতনায় সংস্থিত বক্তব্যকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে (হাসান হাফিজুর রহমানঃ 'অভিশপ্ত পিতা', সিকান্দার আবু জাফরঃ 'অক্ষম চেতনা')। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরাও নবনির্মাণকলার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন (মুর্তজা বশীরঃ 'পোকা',

হাসান হাফিজুর রহমান : 'পাখি')। তাঁরা নবনির্মাণের যে অম্বিষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছান, তার অনেকাংশেই আঙ্গিকের নবরূপায়ণ লক্ষণীয়। আবার, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতীকের নির্মোকে পাবৃত। কিন্তু, সুখের বিষয়, বহিরঙ্গ বা নির্মোক কোথাও অতিবুদ্ধিবাদের প্রলেপে দুর্ভেদ্য নয়, বরং স্বচ্ছ, মনোরম এবং জনগ্রাহ্য।

সমকালীন ছোটো গল্পের গতিপ্রকৃতি আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ আর তাই পাঠকজনের মনে কোনো সন্দেহ বা অনিশ্চয়তার অনুভূতি নেই। নবীন-প্রবীণের মিলিত প্রয়াসে যার নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছে, তার জয় অনিবার্য। জীবনবিমুখ বা উচ্ছৃঙ্খল উপধারাগুলি এখন আর তেমন প্রবল নয়। তাদের ক্ষীয়মাণতার লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা তাই স্বচ্ছন্দেই আশা করতে পারি, ওই ক্ষীণ ধারা-গুলির অচিরেই বিলুপ্তি ঘটবে এবং আমাদের আন্তরিকতা আর সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ অদূর ভবিষ্যতেই নবনির্মাণের আপাততঃক্ষীণ ধারাটিকে জোয়ারে জোয়ারে উদ্দামতায় ভরে তুলবে।

[১৯৬৩/১৯৭১]

অনুবাদসাহিত্য : প্রবণতা ও সমস্যা

অনুবাদ, কার্যতঃ যা সাহিত্যের ভাষান্তরে প্রবাসন, এক বিচিত্র সম্প্রসার। যার মাধ্যমে সাহিত্য স্বাদেশিক সীমার বাইরে অধিষ্ঠিত হয়, স্বদেশে আর স্বভাষার সমাজে বসবাসকারী থেকেও। এ যেন এক অবিভাজিত সত্তার দুটি বা ততোধিক অবিচ্ছেন্ত রূপ, বিভিন্ন মুকুরে বিম্বিত।

সাহিত্যে এহেন প্রবাসন তার ইতিহাসে বহুকালাবধি জ্ঞাত, প্রায় ইতিহাসের সমবয়েসী। এবং বহু-আচরিত, কখনো তার স্বদেশী বা স্বভাষীর প্রয়োজনে, কখনো বা অন্যের। বয়েসের কথা এখানে অনালোচ্য। কিন্তু প্রয়োজনের প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, অনুবাদ-প্রয়োজন মূলতঃ যারই হোক না কেন, তার দ্বারা সাহিত্যের স্বদেশ-বিদেশ, স্বসমাজ বিসমাজ, উভয়েই উপকৃত হয়, মানুষের অন্তরজাত ভাবাবলীর কিছু বিনিময় চলে। যার ফল মানুষ থেকে মানুষের দূরত্বের অন্ততঃপক্ষে আংশিক অবসান, সেই সঙ্গে এক পক্ষের কিছু অভাব পূরণ। বিশেষ করে, বিনিময়ের মূলে যখন কোমল কোনো অনুভূতি থাকে। কিংবা রসভোগের তাগিদসহ অজানাকে জানবার আগ্রহ অথবা অগ্রগতি সাধনের উৎসাহ। বলা বাহুল্য, এগুলিও মানুষের অন্তরজাত, তার চরিত্রে মেশানো এবং এ-কারণে রসলোভী তথা সংস্কৃতিসেবী মানুষের কাছে অতি প্রিয় এবং অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয়।

বাংলাভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও এত ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং দেখা যায়, বাংলা সাহিত্য শৈশবাবধিই অনুবাকদমে' অভ্যস্ত। মধ্য যুগে আমরা সোৎসাহে ধর্মীয় আর পৌরাণিক কাহিনী অনুবাদ করেছি এবং ধমের্ত'র বস্তুর পটে মানবিক উপকরণের কাহিনীকাব্যও পেয়েছি অনুবাদের মাধ্যমে। সে-যুগেও আমরা বাংলায় মহাভারত পড়তাম, মৃগাবতী আর পদ্মাবতীর উপাখ্যানও। কবি পরাগল অনুবাদক ছিলেন, মহাকবি আলাওলও তাই।

আজ সেকালের সব অনুবাদ, সব আনুবাদক সগৌরবে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গীভূত। যেমন তার পরের কালের অনুবাদ আর অনুবাদকরাও, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, যার বহু অংশ এমনকি অনুবাদকের সমকালীন বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ। প্রথম বড়ো উদাহরণ উনবিংশ শতকের অনুবাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী।

তবু বাংলাদেশে কিছু ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। কেন, তা দুর্বোধ্য। আমি তার কথা পরে বলবো। আপাততঃ উল্লেখ্য শুধু কিভাবে ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং কতো দূর।

আমাদের পরিসংখ্যান অসমাপ্ত। অনুদিত রচনা বা গ্রন্থাদির সঠিক সংখ্যা জানা তাই আমাদের পক্ষে এখনো সম্ভব নয়। কিন্তু টুকরো তথ্যাবলীর সম্মিলিত সাক্ষ্য, বাংলাদেশে বিভাগোত্তর কালে, ছাব্বিশ বছরে অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় আটশোখানি। যেগুলির অর্ধেকেরও বেশী গুরুগম্ভীর রচনার, ধর্ম ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির। বাকী গ্রন্থগুলির শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ শিশুতোষ, পঁচিশ ভাগ উপন্যাস এবং অবশিষ্ট ভাগ সংখ্যাগত অনুক্রমে কবিতা, নাটক আর গল্পের। মিলিত সংখ্যায় এই অনুদিত গ্রন্থাবলী এদেশে প্রকাশিত মোট গ্রন্থাবলীর এক দশমাংশও নয় এবং এমনিতেও হতাশার নামান্তর। অনুবাদের বিষয়গত ব্যাপকতা অবশ্যই আছে,—যদিচ অসম্পূর্ণ,—অনুবাদে সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষেত্রই আমরা বাদ দিইনি, তবু, আমাদের মন ভরে তাকে সাজাবার কোনো অবকাশই নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যের কেবল কৃশতাই মনকে অতৃপ্ত রাখে না, আমাদের অতৃপ্তির অন্তবিধ কারণও আছে। আর, সে-কারণ বিস্মাপক, অপিচ পীড়াদায়ক। গোড়াতেই আমি আভাস দিয়েছি, অনুবাদ রসলোভী তথা সংস্কৃতিসেবী মানুষের কাছে অতি প্রিয়। বিশেষতঃ, যখন তা রসাশ্রয়ী, হৃদয়ের কোনো কোমল অনুভূতির সুতোয় বাঁধা। কিন্তু অনুবাদসাহিত্য এমনভাবে প্রিয় হয় কেবল অনুবাদক পক্ষের আগ্রহী নির্বাচনে, তারই রসলোভী উৎসাহে। যার অর্থ, অনুবাদনের স্বাভাবিকতা অনুবাদকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যে, রসাস্বাদনের এক স্বাধীন, অবারণ লোভের কাছে আত্মসমর্পণ। আর, নির্বাচন মাত্রেই আপন

প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী, গুণনির্ভর বিচারক এবং অবশ্যই বিশ্লেষক। তার পায়ে যদি অপরের ইচ্ছার বেড়ি পড়ে কিংবা অপরের প্রয়োজনের, অতএব প্রলোভনের, তাহলে অনুবাদ হয় আমদানির পরিবর্তে জোর করা রফতানি। অন্য কথায়, অনুপ্রবেশ আর সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক প্রচার।

স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়, বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। নির্বাচনের লক্ষ্য থাকে মুখ্যতঃ ব্যাপকভাবে নন্দিত, গভীর কোনো ভাবে বা তাৎপর্যে অন্বিত অথবা অলঙ্কারে সজ্জিত রচনাবলীর ভাষান্তরণ। সে-রচনাবলী নিজ গুণে চিরায়ত যেমন হতে পারে, তেমনি অন্ততঃপক্ষে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত সমকালীন। (এবং ক্বচিৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনের, যখন আমরা সংশ্লিষ্ট রচনাকে সাহিত্য নামে অভিহিত করতেই অনিচ্ছুক।) কিন্তু আমাদের দেশে অনুবাদের মাধ্যমে যা আমদানি হয়েছে, তার মুখ্য ভাগই এসব হিসেবের বাইরে। যদিচ তাদেরও কিছু তাৎপর্য ছিলো। আমাদের বিচারে না হোক. অপর পক্ষের বিচারে অবশ্যই। (বাংলা একাডেমীকে অশেষ ধন্যবাদ, তাঁরা এর এক বিরাট ব্যতিক্রম।) আর, তার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন বিদেশী রচনাও দুঃখিনী বাংলা ভাষার বুক ভারী করেছে, যার নাম—এবং যার রচয়িতার নামও—আমরা আগে কখনো শুনিনি, শোনার প্রয়োজনও আমাদের ছিলো না। আরো পরিতাপের বিষয়, সে সব গ্রন্থের অনুবাদের জন্যে যে-পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হয়, তার সিকি পরিমাণ ব্যয়েই হয়তো সমমানের মূল গ্রন্থ আমাদের দেশের লেখকদের হাত থেকে পাওয়া যেত, কেবল যদি সেই ব্যয়ের পেছনে অনুপ্রবেশ আর প্রচারের পরিবর্তে থাকতো কিছু স্বার্থহীন সদভিপ্রায়।

আমার এসব কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখানে আমি শুধু কিছু তথ্য পরিবেশন করবো।

গত ছাব্বিশ বছরে বাংলাদেশে যেসব অনুবাদকর্ম সাধিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশেরই মূলে ছিলো অনুবাদ করবার প্রয়োজন নয়, করাবার প্রয়োজন। আর সে-প্রয়োজনেরও বেশীর ভাগই বিদেশের—স্পষ্টতরো ভাষায়, বিদেশী প্রচার সংস্থার। বলা বাহুল্য, বিদেশগুলির মধ্যে সেকালের পাকিস্তানের পশ্চিম ভাগও ছিলো। আরো বলা বাহুল্য, দোষী কেবল বিদেশীরাই নন,—তাঁরা বরং এক হিসেবে নির্দোষ, নিজেদের প্রয়োজনের

দিকে চোখ রাখাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। দোষ আমাদের অনেক অনুবাদকেরও ছিলো। যাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছেন সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্যে নয়, নির্ভেজাল আর্থিক আকর্ষণে,– কখনো নিজেদের সাহিত্যসাধনা মুলতুবি রেখে, কখনো বা একেবারে বন্ধ। আবার, তাঁদের দলে এমন কিছু অনুবাদকও ছিলেন, যাঁরা বিশুদ্ধ আর্থিক প্রয়োজনের অনুবাদ ছাড়া আর কোনো কর্মই করেননি,—না সাহিত্যচর্চা, না তার তাগিদ অনুভব। অনুবাদকদের নিজস্ব উদ্যোগে যে-অনুবাদকর্মগুলি সাধিত হয়েছে, সেগুলির সংখ্যা আমি অনুল্লিখিতই রাখবো। কেননা, সে-সংখ্যার উল্লেখের থেকে শূন্যের উল্লেখ অধিকতরো সম্মানজনক।

কিন্তু উপরি-উক্ত সংখ্যাটি যতো ছোটোই হোক, আমাদের অনুবাদকদের নিজস্ব উদ্যোগে অনূদিত গ্রন্থগুলি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কারণ, সেইগুলিই আমাদের অনুবাদের ক্ষেত্রে নিখাদ সাহিত্যসেবার ফল। যে-সাহিত্য-সেবা আপন রসগ্রাহিতায় বিভোর। অপিচ, এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়, এজাতীয় সাহিত্যসেবা দিয়েই আমাদের অনুবাদসাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিলো, আজ থেকে প্রায় চব্বিশ বছর আগে, যখন বিদেশী প্রচার সংস্থার অনুবাদ-প্রয়োজন ছিলো ক্ষীণ এবং আমাদের সমগ্র সাহিত্যই কৃশদেহ। বর্তমান আলোচনায় আমাদের অনুবাদকদের নিজস্ব, প্রত্যাশাহীন উদ্যোগে কৃত অনুবাদ-গ্রন্থগুলির কথা স্মরণ করা তাই একান্ত প্রয়োজন।

নিজস্ব উদ্যোগের সূচনা, এই মাত্র আভাস দিয়েছি, পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে এবং যতো দূর জানি, আবদুল হাফিজের এক অনুবাদকর্মে। মূল গ্রন্থখানি ছিলো পার্ল বাকের 'মাদার'। আবদুল হাফিজ ধারাবাহিকভাবে তার অনুবাদ প্রকাশ করেন সেকালের খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকা 'ইমরোজ'-এ। অপরের প্ররোচনা আর প্রলোভন থেকে মুক্ত, 'মাদার' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'মা' নামে, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তার আত্মপ্রকাশের অনতিকাল পরই, ১৯৫৪ সালে, এক বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে। 'মা' বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যের কেবল প্রথম গ্রন্থই নয়, প্রথম বিশিষ্ট এবং সার্থক গ্রন্থও বটে। আবদুল হাফিজ পরবর্তী কালে আরো বেশ কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, যেগুলির অধিকাংশই উপন্যাস এবং মূলতঃ মার্কিন দেশের। কিন্তু অনুবাদকর্মের নিজস্ব উদ্যোগ

তিনি অল্প দিনেই হারিয়ে ফেলেন আর তারপর বেমালুম ভিড়ে যান প্রলুব্ধ অনুবাদকদের দলে—অথবা তাঁকে ভিড়িয়ে নেয়া হয়, হয়তো এ-কারণে যে, তিনি একজন ভালো অনুবাদক।

আবদুল হাফিজের পর ষষ্ঠ দশকের অনুবাদক্ষেত্রে সুপরিচিত নেয়ামাল বাসির আর মোহাম্মদ আজিজুল হক। বিভিন্ন ভাষার বহু ছোটো গল্পের অনুবাদক, কিন্তু দুর্ভাগা কর্মী, আজিজুল হক বছরের পর বছর অনুবাদকর্মে লেগে থেকেছেন, তবু কোনো গ্রন্থ প্রকাশনের সুযোগ পাননি। গোড়ায় নেয়ামাল বাসিরও ছিলেন মুখ্যতঃ ছোটো গল্পের অনুবাদে উৎসাহী, যদিচ পরবর্তী কালে তাঁর ব্যাপকতরো পরিচয় উপন্যাসের অনুবাদক হিসেবে, যে, পরিচয়ের সূচনা সাজ্জাদ জহীরের 'লণ্ডনে এক রাত' (১৯৫৮) দিয়ে। তাঁর অনুবাদ-উৎস এক ভাষা, কেবল উর্দূ এবং তিনিই এদেশে উর্দূ সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদক, যদিও অনুবাদক-জীবনের প্রথম দিকে শওকত ওসমানও কিছু উর্দূ গল্পের সার্থক অনুবাদ করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে এদেশে অনুবাদকর্ম বৃদ্ধি পেতে লেগেছে আর অনুবাদ-উৎস হয়েছে মুখ্যতঃ উর্দূ এবং ইংরেজী। এই সঙ্গে আরো স্মরণীয়, অনুবাদকর্ম আর আমাদের তেমন কোনো সাহিত্যগত লক্ষ্য সাধন করেনি। কেননা, তা ক্রমশঃ প্রচারের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে, ইংরেজী থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি পরদেশের দুটি প্রচার সংস্থার কল্যাণে, উর্দূর ক্ষেত্রে সেকালের পাকিস্তান সরকারের তথাকথিত জাতীয় সংহতির চালবাজিতে। উল্লেখ্য, তখন উর্দূ থেকে অনুবাদের প্রধান বস্তু ছিলো ইকবালের কবিতা এবং পাকিস্তান সরকার তাঁর বেশ কয়েকখানি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

আমাদের অনুবাদসাহিত্যে অনুবাদকের নিজস্ব উদ্যোগের এই অপমৃত্যুর সূচনাকালেই জন্ম নেয় বাংলা একাডেমী। যে-প্রতিষ্ঠান ক্রমে ক্রমে অনুবাদকদের আপন উদ্যম হারাবার গ্লানি থেকে আংশিক মুক্তি দিয়েছে, জাতীয় রসভোগ আর প্রয়োজনের মুখ চাওয়া অনুবাদ-আয়োজনের মাধ্যমে। এ-সময়ে বিদেশী প্রচার সংস্থাগুলির অনুবাদ-আয়োজনও ধীরে ধীরে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরো হয়, যেমন বাংলা একাডেমীরও।

আর, বাংলা একাডেমীর প্রয়োজনের ফলে আমরা বিদেশী সাহিত্য থেকে এমন কিছু গ্রন্থ পাই, যেগুলি সাহিত্যের বিচারে চিরায়ত কিংবা তথ্য বা রসের কারণে মূল্যবান। যেমন, ইবসেনের কিছু নাটকের আবদুল হক-কৃত বাংলা রূপ, এ্যাপুলিয়াস-প্রণীত এবং আবদুল গণি হাজারী কর্তৃক অনূদিত 'স্বর্ণ গর্দভ' (১৯৬৪), এফ, বি, ব্র্যাডলী-বার্টের একখানি গ্রন্থের রহীমউদ্দীন সিদ্দিকী-কৃত অনুবাদ 'প্রাচ্যের রহস্য-নগরী' (১৯৬৫), শওকত ওসমানের 'স্পেনের ছোট গল্প', গান্ধীর 'সত্যের সন্ধান'-এর আনিস চৌধরী-কৃত অনুবাদ (১৯৬৩), হান্টারের 'পল্লী বাংলার ইতিহাস' (১৯৬৯), প্রাচীন ইউরোপের কয়েকজন চিন্তাবিদের রচনার ভাষান্তর ইত্যাদি। এ-সময়ে বাংলা একাডেমী যদি অনুবাদনে উদ্যোগী না হত, আমাদের অনুবাদ-সাহিত্য কেবল প্রচারবাদী রচনায় ভরে যেত।

তার কারণ, ষাটের দশকে পৌঁছে অনুবাদকদের নিজস্ব উদ্যোগ প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। যদিও আমাদের শক্তিমান অনুবাদকদের সংখ্যা তখন অনেক, তাঁদের অনুবাদকর্মও। কিন্তু তাঁদের শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োজিত কেবল বিদেশী তোষণে,—কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো প্রলোভনে। সে-সময়ে অনুবাদকদের স্বাধীন সত্তা যাঁরা অন্ততঃ কিছুটা বজায় রেখেছিলেন, তাঁদের শিরোমণি আবদুস সাত্তার আর মুনীর চৌধুরী। আমাদের অনুবাদসাহিত্যে আবদুস সাত্তারই একমাত্র অনুবাদক, যিনি আরবী ভাষা থেকে ধর্মেতর বিষয় টেনে এনেছেন। আর, মুনীর চৌধুরীর অনুবাদ-উৎস ছিলো ইংরেজী। তিনি আপন মনেরই তাগিদে একাধিক বিদেশী নাটিকার অনুবাদ করেছেন। সেই সঙ্গে শেক্সপীয়ারের দুখানি নাটকের,—'মুখরা রমণী বশীকরণ' আর 'কেউ কিছু বলতে পারে না' (১৯৬৭) এবং গল্স্‌ওয়ার্দির একখানি-গ্রন্থের,—'রূপার কৌটা' (১৯৬৯)। তিনি ছিলেন নাটকগতপ্রাণ, সুদক্ষ অনুবাদক, যদিও তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থগুলির প্রকাশনের ভার নিতে বাংলা একাডেমী ছাড়া আর কোনো প্রকাশক এগিয়ে আসেননি।

এইখানে আমাদের অনুবাদসাহিত্যের আর এক সমস্যার কথা নিজস্ব উদ্যোগের সূচনায় বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানই এগিয়ে এসেছিলো

আবদুল হাফিজ-কৃত অনুবাদ গ্রন্থ 'মা' আর নেয়ামাল বাসির-অনূদিত 'লণ্ডনে এক রাত' প্রকাশনে। কিন্তু তারপর তারাও তলিয়ে গেছে বিদেশী প্রচার সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুবাদের বন্যায়, স্বেচ্ছায় নিজস্ব উদ্যোগের প্রতি শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়ে। এর কারণ কি?

আমি প্রশ্নটির একাধিক উত্তর পেয়েছি। যার কোনোটি যুক্তিগ্রাহী, সুতরাং সহজবোধ্য, কোনোটি জোড়াতালি, অতএব দুর্বোধ্য।

যাঁরা এদেশে অনুবাদে উৎসাহী, তাঁদের কথা,—অনুবাদ-গ্রন্থের প্রকাশক জোটে না, তাঁরা তাই নিজস্ব অনুবাদকর্মে নিরুৎসাহ। কিন্তু ফরমাসী অনুবাদে তাঁদের আপত্তি নেই, বরং উৎসাহ কিছু বেশী আছে,—কেননা, তাতে প্রাপ্তিযোগ সুনিশ্চিত, ভালোও এবং অবশ্যই গ্রন্থপ্রকাশ অবধারিত। এসব কথার সত্যতাসীমা সর্বজনজ্ঞাত। যে-দেশে মৌলিক রচনারই প্রকাশক মেলা ভার, সেখানে অনুবাদ-গ্রন্থের কথা কে ভাবে? বিশেষতঃ, অনুবাদের পাঠক যখন প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী মহলের, যাঁরা বিদেশী সাহিত্যের খবর রাখেন এবং সে-সাহিত্য পাঠে উৎসাহী, কিছুটা মূল ভাষাতেই পড়ে ফেলেন? সীমিত সংখ্যার পাঠকের জিনিষ বিদেশী রচনা কাটে তাই ধীরে ধীরে, ব্যবসায়ের জন্যে যা উৎসাহদায়ী নয়। সত্যের খাতিরে মানতেও হয়, ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসাই বড়ো,—এমনকি, যখন সাহিত্যের, তখনও। আর, আপন প্রাণ বাঁচানো তাঁদের প্রথম কাজ, তারপর সাহিত্যের প্রাণ বাঁচাবার কথা। শুধু প্রশ্ন থেকে যায়, সাহিত্য দিয়ে যাঁরা প্রাণ বাঁচান, আপন প্রাণ বাঁচাবার পর তাঁরা সেই সাহিত্যের প্রাণ কতোটুকু বাঁচান?

প্রকাশকরা অবশ্যি প্রায়ই বলে থাকেন, অনুবাদ-গ্রন্থের বাজার খারাপ, তবু তাঁরা ফরমাসী অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু কেবল বিশেষ কারণে। প্রচার সংস্থাগুলি অনুবাদ প্রকাশনে সাহায্য দেয়। কখনো সরাসরি অর্থের আকারে, কখনো বা কাগজের কিংবা অন্য কিছুর। আর, তারপর বেশ কিছু কপি কিনে নেয়। যার ফলে প্রকাশনাব্যয় পুষিয়ে যায়, অল্প দিনে বেশী লাভ মেলে। বাকী কপিগুলি সের দরে ফুটপাথে ছেড়ে দিলেও ক্ষতি নেই। অনুবাদ প্রকাশনের এই কারবার ফেলে নিছক সাহিত্যসেবায় অনুবাদ প্রকাশনে কে যাবে?

প্রকাশকদের এই সব যুক্তিও আমরা বুঝি এবং মানি, এগুলির কিছু প্রমাণও আমরা পেয়েছি। কিন্তু এর পরই কিছু কথা আমাদের সব বোধ গুলিয়ে দেয়। বিশেষতঃ, যখন শুনি, এদেশে অনুবাদ ভালো হয় না এবং অনুবাদগ্রন্থ পাঠে আমাদের পাঠকরা সাধারণভাবেই অনীহ। আমি বিশ্বাস করিনে, আমাদের সব অনুবাদই ভালো বা খারাপ। কিংবা এদেশে ভালো অনুবাদক আদৌ নেই। অথবা ফরমাসী অনুবাদ মাত্রেই ভালো, বাকীগুলি বাজে বা এর উল্টোটি সত্যি। ভালো অনুবাদক এদেশে অবশ্যই আছেন, যাঁদের কিছু নাম আমি আগেই বলেছি। আর, অনুবাদের ভালোমন্দ দুই-ই থাকে, যেমন মৌলিক রচনারও। শুধু, ভালোটুকু বেছে নিতে হয়, নেয়ার ক্ষমতা চাই, তার সাথে সদিচ্ছা। এবং ভালো অনুবাদও কেবল পোকায় কাটে, একথা সত্যের ধৃষ্ট অপলাপ। এটা যদি সত্যি হত, তাহলে আবদুল হাফিজের অনুবাদ গ্রন্থ 'মা' ফুরিয়ে যেত না বা নেয়ামাল বাসিরের 'লণ্ডনে এক রাত' কিংবা মুনীর চৌধুরীর 'কেউ কিছু বলতে পারে না' অথবা রণেশ দাশগুপ্তের 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা' (১৯৬৯), আবদুস সাত্তারের 'আরবী কবিতা' (১৯৬৫) আর মনিরউদ্দীন ইউসুফের 'ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন' (১৯৬০)। আর, ফরমাসী অনুবাদ মাত্রেই যে অপকৃষ্ট, তাও তো নয়। বাংলা একাডেমীর ফরমাসী অনুবাদ-গ্রন্থ 'সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' (১৯৬২),—যার অনুবাদক বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক,—কার্যতঃ অপাঠ্য, মূল গ্রন্থের অপরিমেয় মূল্য থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু হাবীবুর রহমানের অনুবাদ-গ্রন্থ 'পাল তুলে দাও' (১৯৫৮) মৌলিকপ্রতিম, যদিচ মূল গ্রন্থ অখ্যাত, বিষয়ের মূল্যে কেবল তার স্বদেশে আদর পাওয়ার যোগ্য। এবং অনায়াসপাঠ্য শামসুর রাহমানের 'ফ্রস্টের কবিতা' (১৯৬৫), 'মার্কোমিলিয়ানস' (১৯৬৭) আর 'খাজা ফরিদের কবিতা' (১৯৬৯), সৈয়দ আলী আহসানের 'হুইটম্যানের কবিতা', (১৯৬৫) এবং কবীর চৌধুরী-কৃত অনুবাদগ্রন্থ 'আহ্বান' (১৯৫৬), 'সেই নিরালা প্রান্তর' (১৯৬৬), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৭০) এবং আরো কয়েকখানি গল্প-সংকলন, উপন্যাস, নাটক আর প্রবন্ধ-গ্রন্থ। তাঁদের সব অনুবাদই

তো ফরমাসী। আর, প্রসঙ্গতঃ, কবীর চৌধুরীর অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো,—এতো অনুবাদ-গ্রন্থ এদেশের আর কোনো অনুবাদকের আছে কিনা সন্দেহ। ক্ষমতা ছাড়া এমন ভূরি অনুবাদ কি কখনো সম্ভব? হ্যাঁ, অনুবাদক্ষমতা পৃথক ক্ষমতা। এবং—আবার বলি,—সে-ক্ষমতা চিনে নিতে হয়, যেমন মৌলিক রচনার ক্ষমতাও।

কিন্তু অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠে আমাদের পাঠকরা সাধারণভাবেই অনীহ,—একথার জবাব কি? ওপরে আমি বলেছি, বাংলাদেশের অনুবাদ পাঠকরা প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী সমাজের। যাঁরা বিদেশী গ্রন্থ সাধারণতঃ মূল ভাষাতেই পড়ে থাকেন। তবে, এদেশে বিদেশী ভাষার চর্চা খুব বেশী নয় এবং আমাদের বিদেশী ভাষাজ্ঞান তথা অনুবাদ-উৎস মাত্র কয়েকটি ভাষায় সীমিত,—ইংরেজী, উর্দু, আরবী, ফারসী, হিন্দী আর জার্মানে। অন্য দিকে, যেহেতু ইংরেজী ভাষা অনুবাদে ঋদ্ধ আর ভাষাটি আমাদের কাছে পরিচিত, সে-কারণে ইংরেজী অনুবাদ পাঠের অভ্যেস আমাদের পুরোণো। তা—ইংরেজী অনুবাদ পাঠে যখন আমাদের অনীহা নেই, তখন বাংলা অনুবাদ পাঠে অনীহা কেন, যদি তেমন কিছু আদৌ থাকে?

প্রশ্নটি আমাদের দুটি বস্তুর সম্মুখীন করে। প্রথমতঃ, বাংলা অনুবাদের সাফল্য কেবল ভাষার ওপর নয়, মূল রচনার বিষয়, বক্তব্য আর উৎকর্ষের বিচার তথা নির্বাচনের ক্ষমতার ওপরও নির্ভর করে। এমন ক্ষমতা যে আমাদের অনুবাদসাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত নয়, তা আমি আভাসে আগেই বলেছি, অনুবাদ-গ্রন্থের সংখ্যার উল্লেখের সাথে বিষয়ের উল্লেখে এবং অনুবাদক্ষমতার প্রসঙ্গে। এখানে তার পুনরালোচনা বা বিস্তারিত টীকা দান নিষ্প্রয়োজন। অনীহার প্রশ্নে আমরা অন্য যে-বস্তুটির সম্মুখীন হই, সেটি তার সত্যতাসীমা। অনুবাদ পাঠে অনীহা কি সত্যিই আছে? এবং থাকলে, কতোখানি? এক্ষেত্রে জরীপ অজ্ঞাত। এবং এই সঙ্গে আমি আরো বলবো, অনুবাদ প্রকাশনে কারো কোনো পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্য থাক বা না থাক, এদেশে সব অনুবাদ-গ্রন্থই শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যায়।

তবে, আমাদের অনুবাদসাহিত্যের অন্যতরো কিছু সমস্যা আছে। যেগুলি বাহ্যতঃ সাধারণ, কিন্তু অনুপেক্ষ্য এবং যেগুলি পাঠক পাওয়ার

সমস্যা নয়। কিংবা প্রকাশনের,—এমনকি, অনুবাদন ক্ষমতারও। যেমন, পরিভাষার সমস্যা এবং পরিকল্পিত অনুবাদের। পরিভাষার সমস্যা আমাদের সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয় প্রবন্ধ জাতীয় রচনার অনুবাদে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখায়ই আমাদের পরিভাষা আজও সম্পূর্ণ নয় কিংবা সুনির্ণীত। প্রবন্ধের অনুবাদক তাই পদে পদে ঠেকে যান। নয়তো দ্বিধায় পড়েন। এমনকি, বিতর্কেও। আমি একখানি অনুবাদগ্রন্থে দেখেছি, তার অনুবাদক আর সম্পাদক এমনি এক বিতর্কের দরুন নিজের নিজের পরিভাষা পরিশিষ্টে জুড়ে দিয়েছেন। পরিভাষা যেখানে অসমাপ্ত এবং নিজেই দ্বিধান্বিত, সেখানে এসবের জন্যে কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে যাওয়া বৃথা। আমরা বরং আশা করবো, চর্চায় অভ্যেসে এই সমস্যার সমাধান হবে।

অভ্যেসে সমাধান সম্ভব উপরি-উক্ত দ্বিতীয় সমস্যারও। আমাদের দেশে এমন অনেক অনুবাদক আছেন, যাঁদের অনুবাদকর্ম এলোমেলো, সব কাজই খুচরো। তাঁরা বিশেষ কোনো বিষয়ের রচনার অনুবাদে আগ্রহী নন, বিশেষ কোনো লেখক, দর্শন বা কালের কিংবা দেশ বা ভাষার রচনারও। তাঁরা আজ কোনো দর্শন বিষয়ক প্রাচীন প্রবন্ধের অনুবাদ করলেন, কাল করবেন মধ্য যুগের কোনো শিশুতোষ রচনার, পরশু অতি আধুনিক কোনো নাটিকার। এসবের ব্যষ্টিগত মূল্য যা-ই থাক, সমষ্টিগত মূল্য কিছুই নেই। এগুলির অনুবাদকরা যদি প্রকাশক না পান, তাহলে প্রকাশকদের দোষ দেওয়া যাবে না।

সমস্যা আরো একটি আছে। এবং সে-সমস্যাও অনুপেক্ষ্য। সেটি হল অনুবাদকর্মে কেবল অনীহা নয়, তার প্রতি প্রবল ঘৃণাও। আমাদের বহু সৃজনশীল লেখক অনুবাদকর্মে উৎসাহী এবং তাঁদের উৎসাহ সক্রিয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক অনুবাদ-প্রয়াসে আর ছোটোখাটো রচনার অনুবাদে, কখনো কখনো বড়ো রচনার বাংলা রূপান্তরণে। বিস্ময়ের কথা, তাঁদের পাশেই আবার এমন সৃজনশীল খ্যাতিমান লেখকও আছেন, যাঁরা বলেন, অনুবাদ বৃথা কাজ, কেবল মাটি কাটা। কিংবা বাণী দেন, কোনো সৃজনশীল লেখকেরই অনুবাদ-কর্মে হাত দেওয়া উচিত নয়। এসব কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি এবং

ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথ তাহলে এলিয়টের অনুবাদ করলেন কেন, বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের এবং নজরুল ইসলাম হাফিজ আর খৈয়ামের, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাজিম হিকমতের? অপিচ, অনুবাদকর্ম যদি অবাঞ্ছিতই হয়, তাহলে আমরা বিদেশী সাহিত্য পড়বো কি উপায়ে? পৃথিবীর সব ভাষা শিখে ফেলে? বাস্তবিক, বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যের দুঃখ অনেক।

কিন্তু থাক তার অনেক দুঃখ। তা নিয়ে আমাদের দুঃখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, আমরা জানি, বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্য একেবারে ফেলনা নয়, স্থবির বা স্থাবরও এবং অবশ্যই অস্পৃশ্যও। তারও কিছু কদর আছে। আর, স্বাধীনতার আলোকে সে-কদর বাড়বে, বাড়তে বাধ্য। আমাদের চাই শুধু গুটিকয়েক জিনিষ। অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশনে প্রকাশকদের উদাসীনতার অবসান, অনুবাদকদের আরো কিছু পরিশ্রম আর পরিকল্পনাপ্রীতি এবং পাঠকদের অনুসন্ধিৎসা। এগুলি যদি আমরা পাই, তাহলে একদিন পৃথিবীর চিরায়ত সাহিত্যের সাথে আমাদের পরিচয় ব্যাপক আর ঘনিষ্ঠ হবে, বিভিন্ন সাহিত্যের রসভোগের সুযোগও এবং সেই সঙ্গে নানা দেশের নানা মানুষের চিন্তার ফল-ভোগের আর হৃদয়ের উত্তাপ অনুভবের। এ-প্রসঙ্গে শেষ কথা, সাহিত্যে এই বস্তুগুলি ব্যাপক করে দিতে পারে অনুবাদই, কেবল অনুবাদ।

বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস

(১৯৪৭—১৯৭১)

আমাদের দেশে কোন্ শ্রেণীর সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা এবং বিকিকিনি সবচেয়ে বেশী,—এ-প্রশ্নের উত্তরে প্রায় নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে, উপন্যাস। একেবারে নির্ভুল কোনো পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, বিভাগোত্তর কালে এ-দেশে অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনায় উপন্যাস প্রকাশিতও হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

উপন্যাসের এই সংখ্যাগত পুষ্টি আমাদের কাছে আশাজনক, সন্দেহ নেই। এর থেকে কেউ কেউ হয়তো আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের মানসিক তথা শিল্পগত পুষ্টির সম্পর্কেও একটি আশাজনক ধারণা পোষণে উৎসাহিত হবেন। কিন্তু এখানে একটু সতর্কতার প্রয়োজন আছে। সংখ্যাগত পুষ্টির কবোষ্ণ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সাহিত্যের এই শাখাটির সৃষ্টির প্রকৃত পরিমাণ, উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সীমা এবং চাহিদার বাস্তব নিবৃত্তির সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো রায় দেওয়া বস্তুতঃ আদৌ নিরাপদ নয়।

এর কারণ একাধিক। আমাদের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'লাল শালু' থেকে শুরু করে তার কনিষ্ঠতমো অনুজ অবধি সৃষ্টির যে ধারা প্রবাহিত, তা হয়তো অনতিবিচিত্র, কিন্তু কেবল বিশ্লেষণের আলোকেই সুবোধ্য। এবং এই বিশ্লেষণও, আত্মরক্ষার জন্যে, এক পটভূমির ওপর নির্ভরশীল। কেননা, তার বিষয়টি দেশবিভাগের কালে অকস্মাৎ গজিয়ে ওঠেনি। আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের যাত্রা শুরু যদিচ নতুন পরিবেশে এবং নতুন লক্ষ্য নিয়ে, তার অস্তিত্বের মূল নিহিত বিভাগপূর্বকালীন

বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের বয়ঃপ্রবীণ জমিনে। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই উপন্যাসেরও রচনার পরিমাণ স্থানীয় পটভূমির মুখাপেক্ষী। আমাদের উপন্যাস-সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনাতেই তাই পূর্বভাষণ হিসেবে বিভাগপূর্বকালীন পটভূমি এবং বিভাগোত্তর কালের স্থানীয় পটভূমির কিছুটা আলোচনা অপরিহার্য।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম পদধ্বনি শোনা গিয়েছিলো উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক জীবনের এক বিবর্তনের মুহূর্তে। ইংরেজের শাসন আর পৃষ্ঠপোষণ এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে কিছুসংখ্যক বাঙালীর মন তখন নতুন জ্ঞানে, নতুন চেতনায় আর নতুন অনুভূতিতে চঞ্চল। এবং মানসিক চাঞ্চল্যে তাঁরা কখনো ঝুঁকে পড়েছেন বহিরাগত ভাবধারার দিকে, কখনো বা খুঁজে ফিরেছেন দেশজ ঐতিহ্যের প্রবীণ স্নেহ। নতুন বাঙালী সমাজের তাঁরাই ছিলেন নায়ক, তাঁদেরই হাতে তখনকার নতুন শিল্প-সাহিত্যের জন্ম এবং লালন। তাই, তাঁদের মনের আদল নিয়েই গড়ে উঠেছে সেকালের বাংলা উপন্যাসের মনের কাঠামো এবং এই কারণেই সূচনা পর্বের উপন্যাসগুলির মুখ্য ভাগে ভিড় করেছে বিদেশী ভাবছায়ার সাথে সাথে দেশজ রোমান্টিক লোককাহিনী, লোকপ্রিয় পৌরাণিক বা আধা-পৌরাণিক উপাখ্যান এবং ইতিহাসের ঘটনাবলী। সমকালীন জীবনচিত্র তখন নিতান্তই গৌণ। দেশী খৃষ্টানের কন্যা মিসেস হানা মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস সে-সময়ে রচিত হয়নি।

বাংলা উপন্যাসের সেই সূচনা পর্বে শেষ পর্যন্ত অবশ্যি জয় হয়েছে বহিরাগত প্রভাবেরই, যদিও দেশীয় ঐতিহ্যের টান সেই জয়ের ফলে বা তার সাথে সাথে একেবারে মেটে যায়নি। সমাজচিত্রণ ছিলো বিদেশী প্রভাবের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল। কিন্তু 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর তেরো বৎসর পরে, ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে সেই প্রভাবের দরুন বাংলা উপন্যাসের মিশ্রিত ধারা অকস্মাৎ হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ ইতিহাসের অনুরাগী।

সে-ঘটনার কারণ অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। বর্তমান আলোচনায় শুধু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষ অবধি ইতিহাস-আশ্রয়ী উক্ত ধারাই ছিলো বাংলার প্রথম সার্থক-তমো উপন্যাসগুলির স্রষ্টা। অন্য উপন্যাসকারদের কথা বাদ দিয়ে কেবল বঙ্কিম, রমেশ, মোশাররফের কথাই বলি। তাঁদের ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতেই যে বাংলা উপন্যাস তার রচনাগত কলাকৌশল এবং শিল্পসৌষ্ঠবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো, এ-সত্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

এ-কথার অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের সেই জয়যাত্রার দিনে সামাজিক উপন্যাস আত্মপ্রতিষ্ঠার বা শিল্পের স্বাদ গ্রহণের কোনো চেষ্টাই করেনি। বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের—এবং তার ইতিহাসের—পাঠক মাত্রেই জানেন, সামাজিক উপন্যাসও ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধেই নিজেকে মোটামুটি হিসেবে গড়ে নিয়েছে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের নিরাবরণ চিত্র। তারকনাথ-রচিত এবং ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'স্বর্ণলতা' ছিলো নিটোল অবয়ব নির্মাণে অপটু এবং অনভিজ্ঞ, কিন্তু বাংলার 'চিরপীড়িত ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর' প্রথম বাস্তব কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) আর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) এবং রমেশচন্দ্রের 'সংসার' (১৮৮৬) আর 'সমাজ' (১৮৯৪) মধ্যবিত্ত সমাজের শিল্পাশ্রয়ী চিত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পল্লীপ্রকৃতিতে সমর্পিতপ্রাণ 'শক্তিকানন' (১৮৮৭), 'ফুলজানি' (১৮৯৪) ইত্যাদি উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-র অবিস্মরণীয় 'পূর্বপুরুষ'।

কালক্রমে, বর্তমান শতকের গোড়া থেকে, ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের প্রতাপে ভাটা পড়তে লেগেছে, সমাজচিত্র তথা সাধারণ মানুষের কাহিনীর জনপ্রিয়তা হয়ে উঠেছে প্রবলতরো। বলা নিষ্প্রয়োজন, সে-জনপ্রিয়তা তখন আর শুধুমাত্র বিস্ময়নির্ভর থাকেনি। বিকচ সৌন্দর্যে অনতিকাল পরেই বাংলা উপন্যাস হয়ে গেছে তন্ময়। সেই সঙ্গে আঙ্গিকের বিচিত্রপন্থী নিরীক্ষায়, আদর্শের ক্রান্তিকালীন রূপ দর্শনে

এবং জীবনের বহুবিধ রহস্য উদ্‌ঘাটনেও তৎপর। কখনো স্থানকালের স্থির পটে দাঁড়িয়ে, কখনো সমাজতত্ত্বের আলোকে সমাজের দর্পণে মুখ রেখে, কখনো বা চেতনার স্বরূপ সন্ধানে মনের অন্ধকারে ডুব দিয়ে।

এই সময়ে বাংলাদেশে প্রতীচীর শিক্ষা তথা ভাবধারার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, পশ্চিমের শিল্পবিপ্লবও এখানকার সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে সূচিত করেছে এক নতুন বিবর্তন। শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ক্রম-বর্ধমান জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রাম উক্ত দুটি ধারার সাথে মিলে বাংলার জীবনে যে ছায়া ফেলে, তা রীতিমতো জটিল। এক কথায় বলা চলে,—অবশ্যি, অতি সংক্ষেপনের ঝুঁকিসহ,—সব মিলিয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালীর চিন্তা আর অনুভূতি যেন যুক্তিবাদ, আত্মচেতনা, মনোবিদ্যা আর সমাজদর্শনের আশু এবং বিলম্বিত ফলশ্রুতির যোগফল। তার কারুকর্মে সমকালীন বাংলা উপন্যাস বর্ণিল। এই কারুকর্ম নিভু্ল অবয়বে দেখা দিতে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এবং পুষ্টিমান হয়ে ওঠে যথেষ্ট দ্রুত গতিতে, গুটি দুয়েক দশকের মধ্যেই।

স্বল্পরেখ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, এই পুষ্টির প্রধান ধারা চারটি। প্রথম—এবং প্রধানতমো ধারা—সাধারণ জীবন অর্থাৎ সীমায়িত পরি-মণ্ডলে আবর্তিত গার্হস্থ্য আর সামাজিক অনুভূতির চিত্রণের। এ-ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, মনোজ বসু প্রমুখ উপন্যাসকার। দ্বিতীয় ধারা নরনারীর দৈহিক-মানসিক সম্পর্কের রহস্য উন্মোচন আর মহিমা কীর্তনের। এর শুরু রবীন্দ্রনাথের আজন্ম সমসাময়িক উপন্যাসকার নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী-তে (১৯০০)। এই উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যে যৌন সম্পর্কের প্রথম বাস্তব চিত্র। পরবর্তী কালে উক্ত বিষয়টির সম্বন্ধে নানা-মুখী জিজ্ঞাসার বিকাশ, ব্যাপ্তি আর প্রাখর্য দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'-তে, নরেশ সেনগুপ্তের অগ্নি-সংস্কার'-এ, দিলীপ রায়ের 'দোলা'-য় আর শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' ইত্যাদিতে এবং বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ বহু উপন্যাসকারের রচনায়। তৃতীয় ধারা, চরিত্রে আদর্শবাদী, কখনো

পরিপুষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দীপনায় (যেমন, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' আর মনোজ বসুর 'ভুলি নাই'-তে), কখনো সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিশ্লেষণে (যেমন, গোপাল হালদারের 'ভাঙ্গন', 'স্রোতের দীপ' আর 'উজান গঙ্গা'-য় এবং তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'-তে) কখনো বা গণজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে (যেমন, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' আর গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ', 'উনপঞ্চাশী' এবং 'তেরশ পঞ্চাশ'-এ)। বিভাগপূর্বকালীন বাংলা উপন্যাসের চতুর্থ প্রধান ধারার নাম দিতে পারি নিরাদর্শ—বা ক্ষীণাদর্শ—রোমান্টিক। এ-ধারার অগ্রগতি মুখ্যতঃ মনের কাঁধে হাত রেখে। এই পন্থায় মানবচরিত্রের রহস্য উন্মোচনে তৎপর রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন' ইত্যাদি এবং আরো অনেক উপন্যাসকারের রচনা।

বর্তমান আলোচনায় বিভাগপূর্বকালীন উপন্যাসসাহিত্যের সম্পর্কে সব শেষে উল্লেখ্য, উপরি-উক্ত চারটি ধারাতেই এমন বেশ কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, যেগুলিকে নিতান্তই নিজেদের ভাষার সৃষ্টি বলে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমো উপন্যাসগুলির পাশে ঠাঁই দিতে কুণ্ঠিত। বস্তুতঃ, বিশেষভাবে এই সৃষ্টিগুলি এবং সাধারণভাবে উক্ত চার ধারার সমগ্র ফসল বাংলা উপন্যাসকে উৎকর্ষের যে কোনো বিচারে পৃথিবীর সেরা উপন্যাস-সাহিত্যের অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। প্রসঙ্গতঃ আরো স্মরণীয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার এবং বস্তুগত উপকরণের ক্রমবর্ধমান সুলভ্যতা বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসের যে সংখ্যাগত প্রাচুর্য এনেছে, তা অভাবনীয় না হলেও আনন্দজনক অবশ্যই।

এবার বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের স্থানীয় পটভূমির কথা একটু-খানি ভেবে দেখি।

সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সভ্য মানুষের মন জীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে কৌতূহলী হইয়া না উঠে ততদিন উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকে না।...যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল—অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক

বিশ্বাস ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আম্বীক্ষিক জ্ঞানে লব্ধ আধিভৌতিক কার্যকারণের উপর আস্থাবান হইল—তখনই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহার কৌতূহলের উদ্রেক হইল। তদনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিও নূতন রূপ লইল, নভেলে।' বাংলা দেশে উপন্যাসপ্রসূ এই পরিবেশের জন্যে আরো প্রয়োজন ছিলো গদ্যের 'পরিণত রসবাহী রূপ'-এর। এসব প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই, ইংরেজী সাহিত্যের সাথে বঙ্গবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে। তারপর, আমরা একটু আগেই দেখেছি, একশো বছরের মধ্যেই বাংলা উপন্যাস নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সুপরিস্ফুট অবয়বে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের জন্ম যখন এই অবয়বকে পেছনে নিয়ে, তখন তার স্নেহ সে কতোটুকু পেয়েছে?

এ-প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান আলোচনার গোড়াতেই আমরা বলেছি, বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয় নতুন পরিবেশে, নতুন লক্ষ্য নিয়ে। অতি সংক্ষিপ্ত এই কথাটির ব্যাখ্যার মাধ্যমেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি।

আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রথমে লক্ষ্যের কথাই বলা যাক।

ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিধাবিভক্তি তথা তার পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে নতুন এক রাষ্ট্রের জন্ম এই উপমহাদেশের কিছু মুসলিমের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ থেকে। অন্য কথায়, জন্মলগ্নে এ-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শন ছিলো দ্বিজাতি তত্ত্বের দ্বারা লালিত। যে-তত্ত্বের মূল বক্তব্যঃ উপমহাদেশের মুসলিম জনসমাজ নিজস্ব এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনদর্শনের অধিকারী, তার প্রতিটি মানুষ উক্ত অনন্যনির্ভর দর্শনের ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ এবং উপমহাদেশীয় সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রতিবেশী অমুসলিম জনসমাজের সাথে অবস্থানে তাদের সেই জীবনদর্শনের রূপায়ণ—এমনকি, তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাও—সম্ভব নয়। তাদের ব্যষ্টিগত, শ্রেণীগত, এবং সমষ্টিগত জীবনের সকল সম্ভাবনা বাস্তব রূপ নিতে পারে কেবল পৃথক এবং স্বাধীন এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আশ্রয় পেলে। যে-কাঠামোতে তাদের সর্ববিধ প্রয়োজন আর ক্ষমতার তারাই হবে উৎস এবং নিয়ন্তা।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই দর্শনের দাবী-দাওয়ার সাথে সাথে, সরাসরিই হোক বা ঘোরা পথেই হোক, আরো কিছু দাবী-দাওয়ার আবির্ভাব ঘটেছে। সেসব দাবী-দাওয়া আধুনিক বিশ্বের জাতি-সমাজের প্রতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিককুলের দায়িত্বের। যদিচ নানান জাতি-নামে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সত্তায় পরিচিত, পৃথিবীর জনগোষ্ঠীগুলির কোনোটিই কি আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অনন্যনির্ভর? বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিধার বিক্ষুব্ধ শিবিরে বিভক্ত এবং সাধারণ মানুষের জাগরণ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আলোড়িত আধুনিক দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুই এখন আর শুধুমাত্র বিশেষ একটি রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সে-সীমা অতিক্রম করে দূরদূরান্তেও ছায়া ফেলে। জাতীয় পরিমণ্ডলে জীবনদর্শনের রূপ এবং আদর্শ যা-ই থাক না কেন, তা তাই আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের শিকার হতে বাধ্য।

শিকার হয়েছে বিভাগোত্তর কালে বাংলার পূর্ব খণ্ডের উপন্যাসও। কেবল এই দ্বিবিধ-দ্বিমুখী আদর্শের অনুবর্তনের তাগিদেই নয়। তার কাছে প্রত্যাশিত ছিলো পূর্বজ সৃষ্টিগুলির স্বীকৃত শিল্পশৈলীর প্রতি আনুগত্যও। টান যেখানে সরল কোনো প্রবণতার কারণ বা সূচক নয়, বস্তুতঃ রূঢ়, জটিল টানাটানি, সেখানে সাহিত্যে অভীষ্ট পথটি সহজে বেছে নিতে পারেন কেবল বহুদর্শী লেখকজন। যাঁদের বহুদর্শিতা, নামান্তরে বাস্তবজ্ঞান. ব্যাপক ঐতিহ্যে পরিণত এবং সৃষ্টিতে পুরুষানুক্রমে তৎপর। 'স্বাভাবিক ক্ষমতা' কথাটি সাহিত্যের আলোচনায় বহুব্যবহৃত। কিন্তু তার কাছে অন্যজ অভিজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা একেবারেই অচেনা, এমন কথা জোর গলায় বলবার অবকাশ কই?

দুঃখের বিষয়, দেশবিভাগের সময় এই বহুদর্শিতা বাংলার পূর্ব-খণ্ডের জনসমাজের ছিলো না। এখানকার উপন্যাসসাহিত্যের স্রষ্টাদলে সম্প্রদায়গতভাবে যাঁরা সংখ্যাগুরু, তাঁদের সগোত্র পূর্বসূরীরা বাংলা উপন্যাসের মূল জমিন থেকে কখনো নির্বাসিত বা বিচ্ছিন্ন হয়তো হননি। কিন্তু, প্রতিবেশী সমাজের অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও. সম্প্রদায় হিসেবে কয়েক দশক আগেও তাঁরা ছিলেন উপন্যাসজাতীয় রচনায় অনভিজ্ঞ। এর কারণ, যে-জিনিষটির প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশে

উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে, সেই ইংরেজী সাহিত্যের সাথে তাঁদের বিলম্বিত পরিচয়। ভারতীয় উপমহাদেশে যে মুসলিম ভদ্রলোক প্রথম গ্র্যাজুয়েট, তিনি বি, এ, পাশ করেন ১৮৬৫ সালে। তারপর বাইশ বছরে মুসলিম গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ছেচল্লিশে। নিম্নতরো পর্যায়েও ইংরেজী জানা মুসলিমের সংখ্যা-এর থেকে খুব বেশী আনন্দ-দায়ক ছিলো না। স্মরণ রাখা ভালো, বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধেও এ-অবস্থার কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি এবং মুসলিম-সমাজে আধুনিক বাংলা ভাষার চর্চা তখনো কোনো চমকপ্রদগতিতে এগোয়নি।

এর ফলে, কেবল আধুনিক অর্থনীতিতেই নয়, আধুনিক শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁদের আবির্ভাব বিলম্বিত, সুতরাং অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও। 'বিষাদসিন্ধু'-র কথা অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। কিন্তু তার বিভাগ-পূর্বকালীন অনুজগুলি—এমনকি, যেগুলি এখন ভূরি প্রশংসায় ধন্য, সেই 'আনোয়ারা', 'আবদুল্লাহ' ইত্যাদি উপন্যাসও কি শিল্পের বিচারে আদৌ উপন্যাস নামের যোগ্য? অস্বীকার করে লাভ নেই, মুসলিম লেখকজনের তৎকালীন এই অনভিজ্ঞতায় বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের সূচনা এবং বিকাশ অনেকখানি প্রভাবিত। দেশবিভাগের অব্যবহিত আগে এবং পরবর্তী চল্লিশ বছরে বাংলার পূর্ব খণ্ডে আধুনিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষার এহেন প্রসার এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি আর ঐতিহ্য বা আধুনিক জীবনবোধের বিকাশ কখনো সমগতি নয়। তাই, এখানকার উপন্যাসপাঠকের সংখ্যা অন্যান্য শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা থেকে যতো বেশীই হোক না কেন, শিক্ষিত এবং যথার্থই সংস্কৃতিমান আর সাহিত্যরসিক দেশগুলির উপন্যাসপাঠকের সংখ্যার তুলনায় তা কার্যতঃ তুচ্ছ। এবং এই উপন্যাসপাঠকদের মধ্যে সত্যিকার রুচিশীল, পাঠনিষ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যা, বলা বাহুল্য, তুচ্ছতরো। বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসসাহিত্যের শিল্পগত এবং ব্যবসায়িক অগ্রগতি ও এর দ্বারা যে কতোখানি ব্যাহত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের অগ্রগতি অবশ্যি আরো একাধিক কারণে বিঘ্নিত হয়েছে। সব কারণের উল্লেখের স্থান এখানে নেই। শুধু দুটি গুরুতর বিঘ্নের উল্লেখ করেই স্থানীয় পটভূমির আলোচনায় যতি টানি।

বিঘ্ন দুটির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় আমাদের পাঠকজনের বিশেষ একটি প্রবণতার কথা। যে-প্রবণতার নামান্তর পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের প্রতি কিছুসংখ্যক পাঠকের পূর্ণ এবং সকল পাঠকের আংশিক মোহ। রঙিল সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণবোধ নিশ্চয়ই দূষণীয় নয়। কিন্তু যখন দেখি, পশ্চিম বাংলার অখ্যাত কোনো লেখকের অসার্থক রচনাও এখানে সাদরে গৃহীত, অথচ এখানকার খ্যাতনামা বা প্রতিষ্ঠিত লেখকের সার্থক রচনা সযত্নে পিত, তখন সংশ্লিষ্ট পাঠককুলের রুচি এবং বিচার ক্ষমতাকে কিছুতেই সুস্থ বলা চলে না। উক্ত পাঠকজনের নিকারণ প্রবণতাটির সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর জাতিভ্র প্রকাশক পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাবলীর স্থানীয় পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যের যে সর্বনাশ করেছে এবং এখনো করছে, তা সর্বজনজ্ঞাত। বলা নিষ্প্রয়োজন, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর প্রায় সবই উপন্যাস এবং এগুলি এখানে পুনর্মুদ্রিত না হলে আমাদের উপন্যাসকার আর সৎ প্রকাশকরা উপন্যাসের রচনা-প্রকাশনায় এখানকার তুলনায় বেশী উৎসাহ পেতেন।

আমাদের উপন্যাস তথা সমগ্র সাহিত্যেরই অগ্রগতির পথে বস্তুগত উপকরণের অভাবও কম বিঘ্নের সৃষ্টি করেনি। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরের কটি বছর আমাদের সাহিত্যে ছিলো কার্যত বন্ধ্যাত্বের যুগ। এ-সময়ে এখান থেকে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির সংখ্যা কারো মনে কখনো পুলকের সঞ্চার করে না, করে অপমানবোধের সঞ্চার। এবং এই অপমানজনক সংখ্যার জন্যে অনেকখানিই দায়ী বস্তুগত উপকরণের ভয়াবহ অভাব। কাগজ, টাইপ, ব্লক ইত্যাদির জন্যে একদা আমরা যে দুর্দশা ভোগ করেছি, তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত আজও দুঃস্বপ্নের মতো দুর্বিষহ। অন্য দিকে, একথাও স্বীকার্য, উপকরণের অভাব যদিচ এখন বহুলাংশে দূরীভূত, তবু কিছুসংখ্যক স্বার্থবাদীর কূট চাল আর কাগজের মতো দুই-একটি উপকরণের দুর্মূল্যতা পরিস্থিতিকে ভিন্ন পথে জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

এহেন পটভূমিতে যে উপন্যাসসাহিত্যের জন্ম এবং লালন, তার বিকাশের ধারাও বিচিত্র। অভিজ্ঞতার অভাবে দ্বিধান্বিত এবং সাংস্কৃতিক

চেতনায় অনাশ্বস্ত, আমাদের উপন্যাসকাররা তাঁদের রচনার পটভূমি, বিষয়, বক্তব্য আর কলাকৌশল নিয়ে যে রূপে পাঠকজনের সম্মুখে উপস্থিত, এই সেদিনও তা ছিলো বড়ো বেশী ক্ষীণরেখ। এবং অবশ্যই ব্যাপ্তিহীন। যদিচ অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত, শক্তিমান (এবং বিভাগপূর্ব কাল থেকেই সাহিত্যকর্মে রত) উপন্যাসকাররাও স্বাধীনতার পর বেশ কিছু দিন বিভাগপূর্বকালীন বাংলা উপন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা থেকে অপসৃত রয়ে গেছেন।

এর প্রথম প্রমাণ সে-পর্বের উপন্যাসগুলির কাহিনীর পটভূমি। স্মরণীয়, তখন আমাদের যে কয়খানি উপন্যাস পাঠকজনের ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে, তাদের সবগুলির কাহিনীই কার্যত একই পটভূমিতে স্থাপিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লাল সালু', শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' আর আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী'-র কাহিনীর স্থানিকতায় অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্তু সে-পার্থক্য কেবল ভৌগোলিক দূরত্বের। বিষয় আর বক্তব্যে এই উপন্যাসগুলি অবশ্যি যথার্থই পৃথক পৃথক পরিমণ্ডলে স্থাপিত। কিন্তু শুধু তিনখানি উপন্যাস দিয়ে নিশ্চয়ই পরিস্থিতির চূড়ান্ত বিচার করা সম্ভব নয়। সে-বিচার চলে কেবল সমকালীন উপন্যাসগুলির প্রধান প্রধান প্রবণতার আলোকে। পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো, স্থানগত পটভূমি, বিষয় আর বক্তব্যের বৈচিত্র্যায়ণে আমাদের উপন্যাসকাররা প্রায় এক দশক অবধি ছিলেন নিস্পৃহ।

বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা বস্তুত ষষ্ঠ দশকের শেষ ভাগে, যখন তরুণ লেখকদের পর্যায়ক্রমিক সংখ্যাগত বৃদ্ধিতে উপন্যাসের সংখ্যারও দ্রুত ক্রমবৃদ্ধি সূচিত। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইতিমধ্যে প্রবীণ উপন্যাসকাররাও নিরীক্ষার সাহসী কর্মে অগ্রসর হয়েছেন। এবং সুখের বিষয়, নবীন-প্রবীণের মিলিত উদ্যোগ নিরীক্ষাকে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেনি। তার পরিধিতে পটভূমি, বিষয়, বক্তব্য, আঙ্গিক,—সবই বিধৃত হয়েছে। ফলাফল যথাস্থানে বিচার্য। কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের উপন্যাসকে অল্প কালের মধ্যেই বৈচিত্র্যে সুবর্ণিল করে দেয়।

এই বৈচিত্র্যের নিখুঁত বর্গীকরণ যে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মেই সম্ভব নয়, তা তর্কাতীত। এবং—একটু আগেই বলেছি,—আমাদের উপন্যাসে বৈচিত্র্যের সূচনা অল্প কাল পূর্বেকার ঘটনা। তার বর্গীকরণে এখানকার উপন্যাস-সাহিত্যের সম্পূর্ণ সৃষ্টিকালের ছায়া দেখবার আশা দুরাশারই নামান্তর। আলোচনার সুবিধার জন্যে তাই আমাদের উপন্যাসকে বিষয়গত আলোকেই দেখে নেয়া যাক। এই আলোকে বিভাগোত্তরকালের উপন্যাস প্রধানত চার বর্গে বিভক্ত,—ইতিহাস-আশ্রয়ী, সামাজিক, আদর্শবাদী এবং মনস্তাত্ত্বিক। চতুর্বর্গের আশ্রয় যেসব উপন্যাসের কাছে অগ্রহণীয়, সেগুলির আলোচনা স্বতন্ত্র। কিন্তু আলোচনা বর্গাশ্রয়ীই হোক আর স্বতন্ত্রই হোক, ১৯৬৮ সালের পরবর্তী তিন বৎসরের উপন্যাসের নাম তাতে বড়ো একটা পাওয়া যাবে না। এই দুটি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আমরা এমন এক অবস্থায় কাটিয়েছি, যা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ কোনো অবকাশ আমাদের দেয়নি।

আমাদের বিভাগোত্তর যুগের সাহিত্যে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের আবির্ভাব অনেকটা সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। বস্তুত, প্রায় সর্বাংশেই ষাটের দশকের। এবং অধিকাংশ ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসই একজন লেখকের রচনা। তবু, আমাদের উপন্যাসের আলোচনায় তার প্রসঙ্গ সকলের আগে মনে পড়ে একটি স্বাভাবিক কারণে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম জয়যাত্রা ইতিহাসের রোমান্স চোখে নিয়ে। আমরা আরো দেখেছি, সেই জয়যাত্রার দিনে বাংলা উপন্যাস তার দেহে যৌবনের যে সুরভি মেখেছিলো, তার উপকরণ নিটোল কান্তিমতী কাহিনী এবং শিল্পের অভিরাম লাবণ্য। সে-যুগের ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস এক উন্মেষশীল জাতীয়তাবোধের রোমান্টিকতায় স্বপ্নিল। ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ বা বিশ্লেষণে তাই সে ছিলো বেশ কিছুটা অনীহ। তা সত্ত্বেও কাহিনীর নিটোলতা আর শিল্পের লাবণ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসে যে আকর্ষণ এনে দেয়, তারই কথা ভেবে আমরা বিভাগোত্তরকালে আমাদের সাহিত্যে এ-জাতীয় উপন্যাসের আবির্ভাবে সচকিত হয়ে উঠেছি।

অবশ্যি, আমাদের স্বল্পফসল সাহিত্যে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের সংখ্যা আজও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যান্য শ্রেণীর উপন্যাসের

তুলনায় সে-সংখ্যা কার্যত নগণ্য। ১৯৬২ সাল থেকে আজ অবধি প্রকাশিত ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস গুনতিতে এক হাতের আঙুলের সীমাও অতিক্রম করে না। তবু, এ-জাতীয় উপন্যাসগুলিতে উপভোগ্য রচনা যে-অনুপাতে পাওয়া যায়, অন্যান্য শ্রেণীতে আমরা তা সে-অনুপাতে পাইনে।

বিভাগোত্তরকালের সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড়' (১৯৬২)। এ-গ্রন্থের কাহিনী নির্মিত হয়েছে মজনু শাহের ফকিরদল আর তাঁদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ঘটনাবলী নিয়ে। বিষয়ের প্রসাদে কাহিনীতে জাতীয় চেতনায় লালিত একটি আদর্শও সংস্থিত। কিন্তু যে কলাজ্ঞান ঘটনাবলীকে উপন্যাসের মণিহারে পরিণত করে, তার অকরুণ বিমুখতায় 'মস্তানগড়'-এর সারা দেহ নিরক্ত। আরো দুঃখের বিষয়, তার দুর্দশার শেষ এইখানেই নয়। রাশি রাশি পাদটীকা তার নিরক্ত দেহকেও বার বার ছিন্নভিন্ন করেছে।

ফকির-আন্দোলনের একটি অংশ নিয়ে পরবর্তী কালে উপন্যাস লিখেছেন প্রবীণ লেখক খালেকদাদ চৌধুরীও। তাঁর উপন্যাসখানির নাম 'রক্তাক্ত অধ্যায়' (১৯৬৬), ঘটনাভূমি ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর পরগণা এবং প্রধান চরিত্র মজনু শাহের ভ্রাতা আর সেনাপতি মাজু শাহ, মাজু শাহের পত্নী শঙ্করী আর পুত্র টিপু শাহ। উপন্যাসনির্মাণে শিল্পবোধের অভাব 'রক্তাক্ত অধ্যায়'-কেও আঁতুড়ঘরেই হত্যা করেছে। খালেকদাদ চৌধুরী অবশ্যি তাঁর উপন্যাসে পাদটীকা দেননি। কিন্তু 'রক্তাক্ত অধ্যায়'-এ তার পরিবর্তে আছে ঘটনার রিপোর্টপ্রতিম উপস্থাপন। অপিচ, আমরা জানি, টিপুর পিতা ঐতিহাসিক পুরুষ করম শাহ, অথচ উপন্যাস-খানিতে তাঁর জনকরূপে প্রতিষ্ঠিত মাজু শাহ। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলছেন টিপু শাহ ছিলেন 'সুসঙ্গ পরগণার লোটাকান্দা গ্রামের এক প্রভাবশালী ফকিরের সন্তান।' এই 'প্রভাবশালী ফকির' যে করম শাহ নন, মাজু শাহ,—এ-তথ্য উপন্যাসকার কোথায় পেয়েছেন, জানিনে। করম শাহ এবং মাজু শাহ আসলে একই ব্যক্তি, এমন ইঙ্গিতও কোনো ইতিহাস-গ্রন্থ বা কিংবদন্তীতে আমাদের চোখে পড়েনি। ইতিহাস-

আশ্রয়ী উপন্যাসে লেখকের কল্পনাচারণের অবকাশ এবং অধিকার অবশ্যই থাকে। কিন্তু স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্য প্রত্যাখ্যান করবার অধিকার কারোই নেই।

মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ'-ও (১৯৬৩) ইতিহাসের আশ্রয়ে লালিত। কিন্তু রোমান্টিকতার নিকারণ স্থূল প্রলেপ এবং কাহিনীর অতি-ফেনিলতায় এই উপন্যাসও পথভ্রষ্ট। উপরন্তু, 'পূর্বদেশ'-এ ইতিহাস সঙ্কীর্ণ পরিসরে বন্দী। 'মন্তানগড়' এবং 'রক্তাক্ত অধ্যায়'-এর কাহিনীও স্থানিকতায় আবদ্ধ। তবু তাদের ব্যাপ্তি ইতিহাসের বিস্তৃততরো পটভূমি থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু মেসবাহুল হক তাঁর কাহিনীকে কোথাও কিংবদন্তীর ঊর্ধ্বে' নিয়ে যেতে পারেননি। তার ফলে, ঐতিহাসিক পুরুষ শমসের গাজীও পরিণত হয়েছেন কল্পনালোকের নায়কে। ঠিক এমনি পরিণতি দেখি ইব্‌নে রুশীদের পারিবারিক ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস 'ফাগুন করা'-রও (১৯৫৮)। ইতিহাসক্রুত একাধিক ব্যক্তি এবং প্রসঙ্গের উল্লেখ সত্ত্বেও এ-উপন্যাস পারিবারিক স্মৃতিচারণের বেশী আর কিছুই হতে পারেনি।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩) এবং সরদার জয়েনউদ্দীনের 'নীল রং রক্ত' (১৯৬৫) এসব দোষত্রুটি থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত। এই দুখানি গ্রন্থ কেবল ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির মধ্যেই নয়, আমাদের সমগ্র উপন্যাসসাহিত্যেই বিশিষ্ট সৃষ্টি। এগুলি বিভাগোত্তর কালের সাহিত্যকে এক দিকে দিয়েছে শিল্পের ঋদ্ধি, অন্য দিকে বিষয়ের বৈচিত্র্য। এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই চিন্তার কিছুটা ব্যাপকতাও।

'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান'-এর কাল এবং বিষয় ইতিহাস-আশ্রয়ী, কিন্তু কুশীলব কল্পিত। উপন্যাসখানির কাহিনীর প্রাণপুরুষ চুরুলিয়ার সাধক গুলাম নবী, ওয়াহাবী নেতৃত্বের এক ভাবপ্রতীক। যিনি ঘোষণা করেছিলেন, ইংরেজের হাত থেকে ভারতের 'আজাদী অর্জন নয়ত জীবন দান এই পণ।' তাঁর এ-মন্ত্রের সাধনে এগিয়ে এসেছেন সাধারণ-অসাধারণ বহু মুজাহিদ। চুরুলিয়ার সাধকের এই দেশগতপ্রাণ সহকর্মীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামই 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান'-এর মূল কথা। কিন্তু সব

কথা কখনো নয়। এর কাহিনী-সংস্থাপনে লেখক তৎকালীন রাজনীতির বহু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, ভাওয়ালের শালঘেরির আস্তানার কাহিনী সুচতুর কৌশলে সমগ্র উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনীর সাথে গ্রথিত। অন্য দিকে, মুজাহিদদের প্রতিপক্ষের সাম্রাজ্যবাদী কূটকলা, ভেদনীতিপ্রধান শাসন, নীল চাষের সঙ্কট, ফারসীর ভাগ্যবিপর্যয় ইত্যাদি বিষয়ের রেশাভাস উপন্যাসখানির পটভূমিকে যে বিস্তৃতি এবং তার কাহিনীকে যে গভীরতা আর নিটোল অবয়ব দান করেছে, আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে তা খুব সুলভ নয়। তবু, 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান' উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কেবল এক অতীতপ্রেমী ধারার চিত্রণ। যে-ধারার কাছে ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের শিক্ষাও উপেক্ষিত। কিন্তু উপন্যাসের আঙ্গিকগত সাফল্য এবং উক্ত অতীতপ্রেমী ধারার দেশপ্রীতির আন্তরিকতার কথা বিবেচনা করে আমরা কাহিনীর একদেশদর্শী বক্তব্যকে বেশ কিছুটা ক্ষমার চোখে দেখতে পারি। দ্বিতীয়ত, এ-উপন্যাস বৃহত্তরো এক রচনা-প্রকল্পের প্রথমাংশের রূপায়ণ। আশা করতে তাই বাধা নেই, কাহিনীর ভবিষ্যৎ বিস্তার এ-খণ্ডের বক্তব্যকে নতুন অর্থে তুলে ধরবে।

'নীল রং রক্ত'-এর কাহিনীও ঊনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসে আশ্রিত। এবং 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান'-এর চরিত্রগুলির মতো এর চরিত্রগুলিও কাল্পনিক। যদিচ এ-উপন্যাসে বিষয়সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি ইতিহাসশ্রুত চরিত্রেরও আবির্ভাব ঘটেছে। মীর নিজামুদ্দীন ওরফে তোতা মীরের নেতৃত্বে এবং ভৈরব রায়, কালীতারা, রফিক মণ্ডল, মেঘাই সরদার প্রমুখ সহকর্মীর সহযোগিতায় সংঘটিত দক্ষিণ পাবনার একটি নীলচাষী বিদ্রোহ এই উপন্যাসের উপজীব্য। কুশীলব যেমনি হোক, মূল কাহিনী যথার্থই ইতিহাসের অনুসারী। এবং এ-কাহিনীকে বাস্তবানুগ করবার জন্যে লেখক তার সমকালীন জীবনধারা নিষ্ঠার সাথেই পটভূমিতে তুলে ধরেছেন। কাহিনীর দ্বিতীয় বড়ো গুণ, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর নীলচাষীর যে সংগ্রামী ঐক্য নীল বিদ্রোহকে দেশব্যাপ্ত গণবিদ্রোহের রূপ দেয়, উপন্যাসে তা যথাযথভাবেই চিত্রিত। এমনকি, নীল বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের চোখে এই বিদ্রোহ যে দেশের মূল স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সংগ্রাম

ছিলো না, ফরাজীদের সঙ্গে তোতা মীরের যোগাযোগ স্থাপনের চিন্তার মাধ্যমে লেখক তাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি স্মরণীয় নীল বিদ্রোহের সাময়িক ব্যর্থতার পর তোতা মীরের মাধ্যমে লেখকের একটি আশাবাদী উক্তি,—'মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে একদিন জিতবেই।' এই সত্যিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত এবং সংগ্রামী চেতনার রূপায়ণই 'নীল রং রক্ত'-এর সাফল্যের প্রধান কারণ। কিন্তু দুঃখের কথা, বিষয় আর বক্তব্যের গুণে এমন ঋদ্ধ উপন্যাসখানির কাহিনী সুসংবদ্ধ নয়। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের সর্বজনজ্ঞাত ঘটনাবলীর পাম্পর্য ক্ষুণ্ণ করে লেখক ঐতিহাসিক ঘটনার পুনর্বিন্যাসে উপন্যাসকারের স্বাধীনতার সুযোগ বড়ো বেশী নিয়ে ফেলেছেন। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক শব্দের অবাধ প্রয়োগে তাঁর ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋত্যপরা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমার্জিত এবং বিরক্তিকর বাড়াবাড়িতে পরিণত। অপিচ, হরিদাসীর মতো দুই-একটি চরিত্রে এক পূর্বসূরী উপন্যাসের কোনো চরিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান' আর 'নীল রং রক্ত'-এর পর যে সমস্ত ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সত্যেন সেনের কয়েকখানি গ্রন্থ,—'অভিশপ্ত নগরী', 'আলবেরুণী'- 'পাপের সন্তান', 'কুমারজীব', 'পুরুষমেধ' এবং 'বিদ্রোহী কৈবর্ত''। প্রথম উপন্যাসখানি ১৯৬৭ সালে এবং অন্যগুলি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আমাদের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির অধিকাংশই সত্যেন সেনের রচনা এবং এক্ষেত্রে তাঁর একক প্রচেষ্টার ফসল অন্য যে কোনো ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস-লেখকের রচনার থেকে বেশী।

'অভিশপ্ত নগরী' সামন্ততঃই ইতিহাস-আশ্রয়ী এবং বিষয়ের বিচিত্র স্বাদে বাংলা সাহিত্যে, যতো দূর জানি, সম্পূর্ণরূপেই নতুন। এ-উপন্যাসের কালগত পটভূমি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম আর ষষ্ঠ শতক, স্থান জেরুসালেম এবং কাহিনী বাইবেলের পুরাতন সংহিতার 'জেরেমিয়া' খণ্ডের নববিন্যাস। চরিত্রগুলিরও প্রায় সবই বাইবেলের উক্ত খণ্ড থেকে গৃহীত এবং তারই আলোকে উপন্যাসে চিত্রিত। বিদেশী উপন্যাসসাহিত্যে বাইবেলভিত্তিক

রচনা অনেক আছে। কিন্তু বাংলায় এমন রচনা আমরা 'অভিশপ্ত নগরী'-র আগে দেখিনি। 'অভিশপ্ত নগরী' সংলাপপ্রধান উপন্যাস। এজন্যে, ঘটনার বিশ্লেষণজাত ব্যঞ্জনা এতে কমই পাওয়া যাবে। এবং সংলাপের যে-শ্রেণীর নাটকীয়তা সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির মানসদ্বন্দ্বের সূচনা হয়ে থাকে, তার আংশিক অভাবে এর চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি অগভীর। ব্যতিক্রম কেবল জেরেমিয়া আর জিলা। 'অভিশপ্ত নগরী'-র ভাষায়ও উপন্যাস-প্রত্যাশিত কারুকর্ম নির্দয়ভাবে উপেক্ষিত। তবু, সমাজের উচ্চচূড়াবাসী শাসক আর ধর্মনেতাদের পারস্পরিক সন্দেহ-বিদ্বেষ এবং সেই সঙ্গেই জনসাধারণের প্রতি বিরোধিতায় ঐক্য, সামাজিক আর ধর্মীয় অনাচার-অত্যাচার-ভণ্ডামি, ব্যাবিলন আর মিশরকে কেন্দ্র করে জেরুসালেমবাসীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর দাস-সমাজের বিদ্রোহ দিয়ে 'অভিশপ্ত নগরী'-র যে কাহিনী নির্মিত হয়েছে, তা স্থানকালের গণ্ডী পেরিয়ে চোখের সম্মুখে ইতিহাসের এক বিশাল, বিস্ময়কর চিত্রপট তুলে ধরে। এই চিত্রপটের যা মূল কথা,—জেরুসালেমের তিনজন রাজা এবং একজন গভর্নরের সমসাময়িক নবি জেরেমিয়ার সত্যবাক, মানবকল্যাণকামী সংগ্রাম,—তা অবশ্যি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায়ই অবসিত। জেরেমিয়া মানসচক্ষে পাপবিদ্ধ জেরুসালেমের কেবল দুর্দশাই দেখেছিলেন। তার যে রূপটি আকাঙ্ক্ষিত, সেটির সম্পর্কে তিনি কার্যত কিছুই ভাবেননি। এক্ষেত্রে তিনি নৈরাশ্য-বাদী। তবে, পরবর্তী কালে বিধ্বস্ত জেরুসালেম তাঁর মনে যে আক্ষেপ এনেছে, তাতে তিনি এবং তাঁর সাথে সাথে ঐশী বিধানও প্রশ্নের সম্মুখীন। এবং সে-প্রশ্নের মাধ্যমে ধর্মে যুক্তি আর সন্দেহের বীজ উপ্ত। বাইবেলে বিধাতার কাছে জেরেমিয়ার অনুযোগমিশ্রিত প্রত্যাশা ছিলো, 'সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে তুমি আমাদের কাছে টেনে নেবে, কিন্তু আসলে তুমি জেরুসালেমবাসীকে প্রত্যাখ্যান করেছো'। এ-অনুযোগ মানবাত্মার চিরন্তন জীবন জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি। 'অভিশপ্ত নগরী'-র নায়ক তাই সরাসরি বিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেও দ্বিধান্বিত নয়।

'আলবেরুনী' সত্যেন সেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু রায়হান আলবেরুনীর বিচিত্র জীবনকথা অবলম্বনে লিখিত এই গ্রন্থখানি তাঁর রচনায় সাধারণ কয়েকটি ত্রুটি থেকে প্রায়

সর্বাংশেই মুক্ত। এ-গ্রন্থে চরিত্রগুলি যথেষ্ট মিতবাক, তথ্যের সমাবেশে লেখক সংযত, ভাষা যতো দূর সম্ভব মার্জিত এবং ঘটনার বিন্যাস যৌক্তিক। চরিত্রচিত্রণেরও 'আলবেরুণী'-তে সত্যেন সেন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলবেরুণী ছাড়া আর কোনো চরিত্রই উপন্যাসে তেমন দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু অদীর্ঘ আবির্ভাবেও অনেক পার্শ্বচরিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষত, আবু সহল, আহমদ, রায়হানা, আজাহার, সুলতান মাহমুদ এবং বিনায়ক।

'পাপের সন্তান'-এ সত্যেন সেন 'অভিশপ্ত নগরী'-র কাহিনীরই জের টেনেছেন। কিন্তু কালগত পটভূমি, ঘটনাবলী, চরিত্র, বক্তব্য,—সব দিক থেকেই উপন্যাস দুখানি পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমনকি, স্থানগত পটভূমিও সর্বাংশে এক নয়। 'পাপের সন্তান'-এর কাহিনীর কাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্য ভাগ এবং উৎস প্রধানত বাইবেলের পুরাতন সংহিতার 'ক্রনিক্‌ল্‌, দ্বিতীয় খণ্ড', 'এজরা' আর 'নেহেমিয়া।' এর উপজীব্য ব্যাবিলোনিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত জেরুসালেম থেকে নির্বাসিত ইহুদীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, নগরীর প্রাচীরের নবনির্মাণ এবং পরজাতীয়দের প্রচণ্ড বিরোধিতার সময়েও সর্বনাশা আত্মকলহ। এই কাহিনী নির্মাণে উপন্যাসকার যথেষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কিছুটা পুনর্বিন্যস্ত করেছেন। অপিচ, নানাবিধ তথ্যের সমাবেশে 'পাপের সন্তান' এক প্রামাণ্য গ্রন্থে পরিণত। সত্যেন সেনের সংলাপপ্রীতি এ-গ্রন্থে অনেকখানি সংযত এবং এখানে তিনি কাহিনীর বুনট, বিশ্লেষণ আর প্রসাধন এবং চরিত্রাবলীর নিটোলতার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী। এসবের ফলে গোটা কাহিনী এবং প্রত্যেকটি চরিত্র বাস্তবপ্রতিম হয়ে উঠেছে।

'কুমারজীব'-এর স্থানগত পটভূমি মুখ্যত মধ্য এশিয়া এবং অংশত উত্তর-পশ্চিম ভারত তথা কাশ্মীর আর চীন। এবং কালগত পটভূমি বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের যুগ। এ-উপন্যাসের কাহিনীর মূল ধারা প্রবাহিত দুজন বৌদ্ধ পণ্ডিত—কুমারায়ন আর কুমারজীবের ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টার পথ ধরে। লেখক অশেষ যত্ন সহকারে বৌদ্ধ ধর্মের তৎকালীন বিকৃতি আর অন্তর্দ্বন্দ্ব, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের ধর্মীয় পরিস্থিতি ইত্যাদির তথ্যবহুল চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। কাহিনী ঘটনাবৈচিত্র্যে মোটামুটি হিসেবে সচ্ছল। কিন্তু তথ্যের

প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং সংলাপের ওপর অতিনির্ভরতা তাকে কোথাও প্রাণরসে সিক্তিত হতে দেয়নি। চারুব্রত, জীবা এবং কুমারায়ন অনেকাংশে রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু বাকী সমস্ত চরিত্রই যান্ত্রিক, কেবল লেখকের তথ্য উপস্থাপনের সহায়ক।

এই ত্রুটি তাঁর পঞ্চম ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস 'পুরুষমেধ'-এও আছে। অপিচ এ-উপন্যাসের কাহিনী তেমন সুবিন্যস্ত নয়। তবে, একটি নরবলিকে উপজীব্য করে লিখিত 'পুরুষমেধ'-এর চরিত্রগুলি 'কুমারজীব'-এর চরিত্রাবলীর তুলনায় অনেক বেশী জীবন্ত। এ-প্রসঙ্গে রানী সুদক্ষিণা, সাত্যকি এবং সুদামের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই উপন্যাস-খানিতেও সত্যেন সেন নানাবিধ প্রামাণিক তথ্যের সমাবেশ করেছেন।

পাল রাজবংশের আমলের গৌড় আর বরেন্দ্রকে পটভূমি করে লিখিত 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'-এর কাহিনী বক্তব্যের দিক থেকে 'পুরুষমেধ'-এর কাহিনীর সগোত্র। তবে, 'পুরুষমেধ'-এ লেখক নিপীড়িত শূদ্র সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দেখিয়েই কাহিনীতে যতি টেনেছেন। কিন্তু 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'-এ কৈবর্তদের বিদ্রোহের সফল পরিণতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। কাহিনী আর ঘটনার মূল পরিকল্পনায় এবং চরিত্রাবলীর চিত্রণে এ-গ্রন্থেও সত্যেন সেন প্রশস্ত চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনার বিন্যাস 'পুরুষমেধ'-এর মতো 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'-এও শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত। উপন্যাসখানির কাহিনীর মুখ্য বিষয় গৌড়ের রাজপুরুষদের দ্বারা বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তদের ওপর অত্যাচার এবং তার ফলে কৈবর্ত জাতির বিদ্রোহ। কিন্তু গ্রন্থে কাহিনীর সূত্রপাত উক্ত রাজপুরুষদের আত্মকলহের বহু বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। বৌদ্ধ বিহারগুলির অধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের কথাও অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ। এবং রাজমাতা শংখ আর রাজবৈদ্য হরিগুপ্তের প্রেমকাহিনী তার আকস্মিক আবির্ভাবে আর অকারণ দীর্ঘতায় রীতিমতো পীড়াদায়ক।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা 'অপরাজেয়' (১৯৭০) সত্যেন সেনের শেষ ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। এ-উপন্যাসের নায়ক শাহজাদা ফিরোজ শাহ। যাঁর [illegible]র্কে কোনো ইতিহাসকার মন্তব্য করেছেন, তাঁর কালের একশো বছর [illegible] জন্ম নিলে তিনি ভারতের সম্রাট

হতে পারতেন, একশো বছর পরে জন্ম নিলে প্রধানমন্ত্রী। কাহিনীতে তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয়, দৃঢ়চেতা রূপ স্পষ্টরেখ। তাঁর পাশে বিদ্রোহের অন্য নেতাদের রূপও বেশ কিছুটা। ছোটো চরিত্রের মধ্যে জওয়ায়ের শাহজাদা আবদুস সাত্তার, মান্দিসোরের মনওয়ার, সরাইমালিক ওয়ালী খাঁ এবং ফিরোজ শাহের সহধর্মিণী সুফিয়া অবিস্মরণীয়। কিন্তু মূল কাহিনীর ঘটনাবলী ঠিক সুগ্রথিত নয়। বিশেষ করে, প্রথমার্ধে। মনে হয়, বিদ্রোহের স্মরণীয় ঘটনাবলীর সংখ্যার বিপুলতায় লেখক দিশেহারা। এবং তাঁর ঘটনাতিগ কিছু মন্তব্য সেই দিশেহারা ভাবকে জটিল করেছে, উপন্যাসকারকে ইতিহাসকারের টেবিলে টেনে নিয়ে গিয়ে।

ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য স্বল্পপ্রসূ, কিন্তু সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে ভূরিপ্রসূ। বস্তুত, সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ফসলের যে আনুপাতিক প্রাচুর্য দেখি, অন্যত্র তা আজও অকল্প্য। এবং আনন্দের কথা, সামাজিক উপন্যাসের এহেন প্রাচুর্য শুধুমাত্র সংখ্যাগত পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়ের বৈচিত্র্য, বক্তব্যের বিভিন্নতা আর শিল্পের বর্ণালীতেও আমাদের সৃষ্টির এই ক্ষেত্রটি সম্পন্ন। যদিচ বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের মজ্জাগত কিছু দোষত্রুটি এ-ক্ষেত্রের রচনাবলীতেও স্পষ্ট।

কিন্তু আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের এই অংশের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে একটি নিকা-বাণী উচ্চারণ করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। 'সামাজিক' অভিধায় উপন্যাসের বর্গীকরণের লক্ষ্য এখানে আমাদের জনসমাজের সমগ্র বা অখণ্ড কোনো চিত্রের প্রতি ইঙ্গিত নয়। স্বীকার করা ভালো, সমাজের সমগ্র রূপের অন্ততঃপক্ষে কিছুটা আভাস দিতে সক্ষম, প্রমাণ সাইজের এমন কোনো দর্পণও আমাদের সামাজিক উপন্যাসে আজ অবধি নির্মিত হয়নি। কিন্তু কেবল পূর্ণাঙ্গ দর্পণের চিত্রেরই নয়, কাচের মোজেইক-প্রতিম বিন্যাসেও যেসব চিত্রের প্রতিফলন ঘটে, সেগুলিরও কিছু মূল্য আছে। এবং তাদের যোগফলও আমাদের একেবারে নিরাশ্বাস করে না। সত্যতঃ, সমাজজীবনের আঞ্চলিক আর সম্প্র ত কিংবা আংশিক সাধারণ চিত্রণে, তার সমস্যাদির রূপায়ণে আর দ্বন্দ্ব াত-সংগ্রামের বর্ণনে বিভাগোত্তর

কালের যে রূপ আভাসিত, তা আর যা-ই হোক, অলক্ষণীয় কখনো নয়। আমাদের উপন্যাসকারদের বিষয়সন্ধী দৃষ্টি তাই স্বাভাবিক কারণেই এর সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণে আর ব্যবহারে ক্রমশঃ অধিকতরো উৎসাহ প্রকাশ করছে। এবং সে-দৃষ্টি মাঝে মাঝে, পুনরপি স্বাভাবিক কারণে, আহৃত বিষয়ের বিশ্লেষণেও তৎপর। যার প্রধান ফল সামাজিক বিবর্তনের ধারানুসরণ।

সামাজিক উপন্যাসের এই বিষয়গত উপবর্গীকরণের প্রধান অবলম্বন, একটু আগেই বলেছি, সমাজজীবনের আঞ্চলিক আর সম্প্রদায়গত রূপের চিত্রণ। এ-চিত্রণে বর্ণিল দেশজ জীবনধারার আঞ্চলিক লাবণিতে মুগ্ধ তাসাদ্দুক হোসেন তাঁর 'মহুয়ার দেশে' উপন্যাসে (১৯৫৯), আলাউদ্দিন আল আজাদ 'কর্ণফুলী'-তে (১৯৬২), বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ 'কাজলদীঘির উপকথা'-য় (১৯৬২) এবং আলাউদ্দিন খান 'অববাহিকার উপকথা'-তে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-জাতীয় কোনো উপন্যাসেই আঞ্চলিক জীবনের বিশ্বস্ত রূপ অন্বেষিত নয়। তাসাদ্দুক হোসেন, বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ আর আলাউদ্দিন খান অঞ্চলকে হয়তো দেখেছেন। কিন্তু যে বাতাবরণ অঞ্চলের মানসরূপের ধারক, তা তাঁদের রচনায় অনতিস্ফুট। মহুয়ার দেশ, কাজলদীঘি বা অববাহিকার উপাখ্যান তাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘায়ু কোনো প্রতিভাস দেয় না। অপিচ, শিল্পবোধের যে গাঢ়তা রচনাকে স্বাস্থ্যবতী আর লাবণ্যময়ী করে, তার অভাবে তাসাদ্দুক হোসেন, বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ আর আলাউদ্দিন খানের উপন্যাস তিনখানি দরিদ্র।

আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলী'-তে অবশ্যি আঞ্চলিক জীবনচিত্রের ঈষৎ ব্যাপ্তি আছে। এবং কিছুটা গভীরতাও। নায়ক-ইসমাইলের চোখে কর্ণফুলীর তীরবর্তী অঞ্চলের যে উন্নয়ন-প্রয়াস আর আধুনিক জীবনধারার যে সূচনা ধরা পড়েছে, তাতে স্থানিক জীবনের ভাঙাগড়ার ইঙ্গিতময় ইতিহাস রেখায়িত। তার জীবনসংগ্রামও স্বাভাবিক। কিন্তু এসবের থেকেও বড়ো কথা, সে এ্যাডভেঞ্চারের এক অন্তর্গূঢ় নেশায় চঞ্চল। কর্ণফুলীতীরের খণ্ডজাতিজীবনের যে পরিচয় উপন্যাসে বিধৃত, তা যেন এই নেশারই উসকানির ফল। সন্দেহ হয়, আঞ্চলিক পরিবেশ আর চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণের স্বাভাবিক সাধ নয়, বিষয়গত বৈচিত্র্যের অনভিজ্ঞ লোভই আলাউদ্দিন আল আজাদকে টেনে নিয়ে গেছে 'কর্ণফুলী' রচনার কাজে।

'কর্ণফুলী', 'মহুয়ার দেশে', 'অববাহিকার উপকথা' ইত্যাদি উপন্যাসে যা এককভাবে বৈষয়িক উপাদান বদরুদ্দীন আহমদের 'অরণ্য মিথুন'-এ (১৯৬৩), রাবেয়া খাতুনের মধুমতী-তে (১৯৬৩) আর শামসুল হকের 'নদীর নাম তিস্‌তা'-য় (১৯৬৬) তা সম্প্রদায়গত জীবনের সাথে অভিন্ন বৃত্তে পরিবেশিত। তিনজন উপন্যাসকারই চেয়েছেন বিশেষ সম্প্রদায় বা সমাজ আর তাদের আঞ্চলিক পরিবেশকে একই দূরবীণে দেখতে। কিন্তু তিস্তাতীরের মৎস্যজীবী সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী 'নদীর নাম তিস্‌তা'-য় আর বিক্রমপুরের মুসলিম তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী 'মধুমতী'-তে আঞ্চলিক রঙ গৌণ। 'অরণ্য মিথুন'-এর কুশীলব মগ খণ্ডজাতির কয়েকটি মানুষ। পার্বত্য পরিবেশ আর অনতিশ্রুত ইতি-হাসের চিত্রপটে স্থাপিত, এই মানুষগুলি স্বসমাজের বিভিন্ন মানসপ্রবণতার এবং তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অগ্রগতির শরিক। বদরুদ্দীন আহমদ মগদের জীবন চিত্রণে সামন্ততঃ বিশ্বস্ত নন। হয়তো অভিজ্ঞতার অভাবে, নয়তো কল্পনার তাড়নায়। কিন্তু তাঁর বিষয়টি নতুন। এর আগে সাঁওতাল আর ডোম-বাগদী ছাড়া আর কোনো খণ্ডজাতি বাংলা উপন্যাসে স্থান পায়নি। রচনার দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'অরণ্য মিথুন' তাই উপন্যাস হিসেবে বিশিষ্ট।

বিষয় কিছুটা নতুন 'মধুমতী'-রও। বৃটেনের শিল্পবিপ্লবের প্রবাসী ক্ষুধা আর সাম্রাজ্যবাদের অশুভ মিলনের ফলে দেশদেশনন্দিত ঋদ্ধিমান যে মসলিনশিল্পী-সমাজ নির্জিত, নিন্দিত এবং কায়ক্লেশে দিন যাপনে বাধ্য এক সাধারণ শ্রমজীবী সমাজে পরিণত, রাবেয়া খাতুন তাদেরই তথাকথিত আপজাতোর কাহিনী বিবৃত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। এই কাহিনীর কাঠামোতেই আরো পাই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের কৃতি-অকৃতির কথা আর প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের উন্মেষলক্ষণ। বিষয়ের সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের বলে লেখিকা তাঁর নায়িকা মিনারা আর তার মামাতো বোন কাজলীর অভিজ্ঞতার বুনিয়াদে যে কাহিনী নির্মাণ করেছেন, তা তীক্ষ্ণ সামাজিক প্রশ্নাবলীতে মুখর। কিন্তু কাজলীর জীবনকথা মূল প্লটের সাথে গ্রথিত এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী এবং সে-কাহিনীর অতিবিস্তার উপন্যাসের মূল কাঠা-মোতে বেমানান। দারোগার মা, চন্দবান ইত্যাদি চরিত্রের কাহিনীগুলিও কেমন যেন এক স্বতন্ত্র ধারায় অনুসৃত। অন্য দিকে, অভিজ্ঞতার বাইরের

প্রসঙ্গে (যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন চিত্রণে) লেখিকা বার বার ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। সব মিলিয়ে 'মধুমতী' তাই এমন কিছু খণ্ডচিত্রের সমষ্টি, যা মণ্টাজের প্রক্রিয়ায় একটি সম্প্রদায়ের জীবনকে প্রচুর আলোক সহযোগে তুলে ধরে, কিন্তু তার অখণ্ড, নিখুঁত রূপ অনচ্ছ রাখে।

পরবর্তী কালে রাবেয়া খাতুন নার্স-সমাজের জীবন নিয়েও একখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'মন এক শ্বেত কপোতী' (১৯৬৮) নামক এই উপন্যাসখানির কাহিনীর বুনট 'মধুমতী'-র বুনটের তুলনায় ঘনতরো। কিন্তু 'মধুমতী'-তে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে গাঢ় রস সঞ্চারিত হয়েছে, এ-উপন্যাসে তার অভাব স্পষ্ট। 'মন এক শ্বেত কপোতী' তাই শুধুমাত্র এক বৈচিত্র্যলোভী রচনায় পর্যবসিত।

সম্প্রদায়-জীবনের কাহিনী আমাদের আরো কয়েকখানি উপন্যাসে পাওয়া যায়। যেমন, সরদার জয়েনউদ্দীনের 'পান্না মোতি' (১৯৬৪) গ্রামাঞ্চলের এক লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায় দাইদের কাহিনী। এর সঙ্গে অবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের কিছু কলঙ্কজনক প্রবণতা আর নারীবিলাসের কথাও বর্ণিত হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদার জয়গান এ-উপন্যাসে স্পষ্ট। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে 'পান্না মোতি' রোমান্টিক। ঠিক যে রূপে সম্প্রদায়-জীবন চিত্রিত শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা'-য় (১৯৫৪) আর 'কাঞ্চনমালা'-য় (১৯৬১) এবং জসীমউদ্দীনের 'বোবা কাহিনী'-তে (১৯৬৪)। যদিচ এই তিনখানি উপন্যাস নির্ভুলভাবে সম্প্রদায়ভিত্তিক কোথাও নয়।

দক্ষিণ বাংলার আঞ্চলিক গ্রামীণ পরিবেশে বিন্যস্ত 'কাশবনের কন্যা'-র অবলম্বন দুটি সমান্তর কাহিনী। এই কাহিনী দুটির নায়ক-নায়িকারা এক দিকে যেমন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ অন্য দিকে তেমনি আশপাশের সমশ্রেণীর মানুষদের প্রতি মমতায় সিক্ত। কিন্তু লোকসঙ্গীতের বহমান সুরে আপ্লুত এবং লোকশিল্পীর মানসলোকের সন্ধানী 'কাশবনের কন্যা'-র সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ সিকদার আর জোবেদার হৃদয়ের সঙ্গীত। উপন্যাসের উপসংহারে মনসুরের মুখে জোবেদাকে হারানোর মর্মান্তিক সংবাদ শোনার পর সিকদারের মনের যে বেদনাগভীর রূপটি ফুটে উঠেছে, তা এক মহৎ প্রেমিক-শিল্পীর চারিত্রের অপরূপ প্রতিভাস। হোসেনের প্রতি সিকদারের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুগভীর

সহানুভূতিতে সেই প্রতিভাস কনকপ্রতিম। শিল্পের গৌরবে এমন মধুবাক চরিত্র আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে আর দেখিনে। নদীবহুল, শ্যামল বরিশালের সিকদার তারাশঙ্করের 'কবি'-র নিতাইয়ের সুযোগ্য দোসর এবং মানবপ্রেমে তার থেকেও মহৎ। অবশ্যি, প্রতিভার বিদ্যুদ্‌বিভায় ভাস্বর 'কাশবনের কন্যা'-র সব অঙ্গে শিল্পের ঐশ্বর্য সুলভ নয়। পরিবেশের অতি সজল শ্যামলতা কাহিনীতে মাঝে মাঝে আদ্র' উচ্ছ্বাস এনে দিয়েছে। এবং কাহিনীর দ্বিধারা উপসংহারে এসেও সুসমন্বিত হয়ে উঠতে পারেনি। তবু, এই সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও, আঞ্চলিক বর্ণের বিভবে এবং লোকগীতির স্বর-সপ্তকের উদ্‌বর্তনে প্রাণময় 'কাশবনের কন্যা' আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের দ্বিতীয় সম্প্রদায়জীবী উপন্যাস 'কাঞ্চন-মালা' যাযাবর আর স্থিতনিবাস বেদে সম্প্রদায়ের প্রেম-সংঘাতের কাহিনী। এ-উপন্যাসেও লেখকের মূল লক্ষ্য বেদে সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রণ নয়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের যে সমাজসচেতন হৃদয়ের সন্ধান আমরা তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে পাই, 'কাঞ্চনমালা'-য় তা অনে-কাংশেই অনুপস্থিত এবং কিছু অংশে বা নিছক রোমান্টিকতায় নিমজ্জিত।

জসীমউদ্দীনের 'বোবা কাহিনী-'তে সম্প্রদায়গত ভাবনা নিতান্তই গৌণ। এর প্রধান উপজীব্য কালানুক্রমিক জীবনধারার রোমান্টিক বীক্ষণ। লোকসাহিত্যের ধারায় লালিত এই উপন্যাসখানিতে গদ্যকারের পোশাকে লোক-ঐতিহ্যের কবি জসীমউদ্‌দীনই আবির্ভূত। তার অনিবার্য ফল, তাঁর কাব্যিক ভাষার আংশিক বিচূর্ণনের মাধ্যমেই ছন্দলোভী এক গদ্যের ব্যবহার।

একটু আগেই বলেছি, 'কাশবনের কন্যা' আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের এক স্মরণীয় সৃষ্টি। বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের সামাজিক বর্গের আলোচনায় উপন্যাসখানির এই সাফল্যের কথা একটি কারণে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য। 'কাশবনের কন্যা' আমাদের অন্যতমো আদি সার্থক সৃষ্টি, অথচ তার সফলকাম অনুজের সংখ্যা এ-বর্গে খুব বেশী নয়। এবং সমাজচিত্রের যে কটি উপবর্গ আমরা পেয়েছি, সেগুলির মধ্যে সাধারণ সমাজ-জীবনের উপন্যাসেই সে-সংখ্যা সবচেয়ে ক্ষীণ। সমাজের খণ্ডিত পটে দেশজ কিছু টাইপস্বরূপ বিষয়ের পরিবেশন আমাদের

উপন্যাসে অনেক আগেই শুরু হয়। এ জাতীয় প্রয়াসের প্রথম উল্লেখ-যোগ্য ফল ইসহাক চাখারীর উপন্যাস, দেশবিভাগের অনতিকাল পরে প্রকাশিত 'মায়ের কলঙ্ক।' বাংলার নারী-জীবনের এক বহুজ্ঞাত সমস্যার কাহিনী 'মায়ের কলঙ্ক' অবশ্যি শরৎচন্দ্রের সমাজ-ভাবনায় প্রভাবিত। ইসহাক চাখারীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পরাজয়' (১৯৫৪) ঘরোয়া জীবনের সুখ-দুঃখের এক টিপিক্যাল বিবরণী। হাসান ফেরদৌসীর 'অচেনা দিগন্ত' (১৯৬০) এরই সগোত্র, কিন্তু স্নিগ্ধ বিভাবনে এবং শিল্পের স্পর্শে রচনা হিসেবে উন্নততরো। খালেকদাদ চৌধুরীর 'একটি আত্মার অপমৃত্যু'-র সামাজিক পটভূমি দূরবিস্তৃত। সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রাম, গ্রামীণ সমাজের কলহ-কোন্দল, অবক্ষীয়মাণ সামন্তবাদের মানব-মৃগয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণায় এ-উপন্যাসের কাহিনী বিচিত্র। কিন্তু শিল্পবোধের অভাবে রচনা হিসেবে প্রবীণ লেখকের এই গ্রন্থখানি নিকৃষ্ট।

সাধারণ সামাজিক জীবনের চিত্রণে সাফল্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য আভাস পরিস্ফুট জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে। ক্ষীণকায় এই উপন্যাসখানির ঘটনাবলী ট্র্যাডিশনে আবর্তিত, ছোট্টো একখানি গ্রামের একান্নবর্তীপ্রায় আট ঘর মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবন নিয়ে বোনা। এ-উপন্যাসকে অনেকেই আঞ্চলিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'হাজার বছর ধরে'-র পটভূমি আঞ্চলিক রঙে রঙীন হলেও বস্তুত আমাদের দেশের শত-সহস্র গ্রামের প্রতিনিধি। যার স্বরূপ অবলোকনে জহির রায়হান এদেশের সমাজ-জীবনের জড়তায় বন্দী। অথচ উপন্যাসখানির নায়িকা টুনির চরিত্রেই যে গতিশীলতা লক্ষণীয়, মনুর আততায়িতায় তা নিহত হয়েও অনশ্বর।

জহির রায়হান, ইসহাক চাখারী প্রমুখ উপন্যাসকার উপরি-উক্ত রচনাগুলিতে পুরাতন গ্রামীণ পটে এদেশের সমাজের যে ছবি এঁকেছেন, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬১) আর 'নাম না জানা ভোর'-এ (১৯৬২), রাবেয়া খাতুনের 'অনন্ত অন্বেষা'-য় (১৯৬৭) এবং কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের 'অন্তঃশীলা'-তে (১৯৬৭) আধুনিক পটে তারই অনুলিপি পাই। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এবং রাবেয়া খাতুন আধুনিক জীবনের আহ্নিক রূপ দেখেছেন। এবং কিছুটা বা তার

মানসলোকের দ্বন্দ্বও। কিন্তু দ্বন্দ্বের মূল সমাজ-জীবনের যে গভীরে নিহিত, তা আজও তাঁদের চোখে পরিচয়হীন এক তাল অন্ধকারের নামান্তর। তাই, তাঁদের রচনাগুলিতে খণ্ডচিত্রও অসম্পূর্ণ থাকে, বাঞ্ছিত রেখাগুলি কাছে এসেও বার বার দূরে সরে যায়। যদিচ শিল্পীর তুলির রঙ দুজনের কারো রচনায়ই একেবারে অজ্ঞাতও নয়।

শিল্পের বর্ণালী কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের উপন্যাসেও অস্ফুট। এবং তাঁর কাহিনী অতিমাত্রায় সরল। এমনকি, শেষাংশে জমিদারপুত্র আমিনুলের আবির্ভাবে আবুল-জমিলার রোমান্টিক প্রীতি যখন অনিবার্য ট্র্যাজেডির সম্মুখীন, 'অন্তঃশীলা'-র কাহিনীর অজাতদ্বন্দ্ব চরিত্র তখনও সযত্নে রক্ষিত। 'অন্তঃশীলা'-র আগে কাজী মোহাম্মদ ইদরিস চীনের দুটি লৌকিক প্রেমকাহিনীর কাঠামোতে 'নটীর প্রেম' আর 'পীত নদীর বাঁকে' নামে দুখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। দেশজ মৌলে সমাজের প্রকৃত রূপ দর্শনের প্রয়াস তাঁর তৃতীয় দশকের শহুরে মুসলিম সমাজ নিয়ে লেখা 'অন্তঃশীলা'-তেই প্রথম। বয়েসে প্রবীণ কিন্তু মৌলিক উপন্যাসের লেখক হিসেবে নবীন, কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের এই রচনায় তাই ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভুলত্রুটির ক্ষতি তিনি পূরণ করে দিয়েছেন কাহিনী নির্মাণের এক অভিনব কৌশলে। তাঁর চরিত্রগুলি কাহিনীর মূল ধারায় বিলয়িত এক-একটি উপনদীর মতো। যারা প্রবলতরো স্রোতে এসে মেশে আপন আপন অববাহিকার সব পরিচয় স্পষ্ট রেখে। চরিত্রের এহেন প্রবর্তন আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে সর্বতোভাবেই নতুন।

ক্ষীণ সমাজচেতনার কিছু রেখা এম মহিউদদীনের 'মরা গাঙ পোড়া ফসল'-এও (১৯৬৯) আছে। এর মূল কাহিনী রোমান্টিক,— নায়ক হাশমত আর নায়িকা মাজুর প্রেমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তারই প্রসঙ্গে এসেছে মাজুর অত্যাচারী, শোষক এবং নারীলোভী পিতা বড় মিঞার কাহিনী এবং তার লোভ আর নির্যাতনের শিকার, হাশমতের মা নছিরণের ইতিহাস। কাহিনীতে তেমন কোনো প্রতিবাদী চেতনা নেই। তার উপসংহারও স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিন্তু লেখক এসব ত্রুটিজাত ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছেন গ্রামীণ জীবন আর প্রকৃতি থেকে আহরিত অসংখ্য অপরূপ উপমার উপহারে। এ-জাতীয় উপমা আমি বাংলাদেশের

আর কোনো উপন্যাসে দেখিনি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, লেখক আসলে একজন চিত্রী।

সামাজিক উপন্যাসের তৃতীয় উপবর্গ সমাজ-জীবনের নানাবিধ সমস্যায় স্পৃষ্ট, কিন্তু কদাচিৎ বিচলিত। এ-জাতীয় উপন্যাসের আদি-তমো সার্থক প্রতিনিধি 'লাল সালু'-র বিষয় ছিলো গ্রামীণ সমাজ থেকে আহরিত। বাহ্যতঃ মানবসমাজের কল্যাণকামী কিন্তু কার্যতঃ শোষণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত কিছু ধর্মাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের প্রথম প্রতিবাদ 'লাল সালু'। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর এই উপন্যাসখানির প্রধান পুরুষ মাজার-ব্যবসায়ী প্রতারক মৌলভী মজিদের ক্রিয়াকলাপ যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তাতে জ্বালা হয়তো আছে, তার তাড়নায় ক্ষোভের প্রকাশও, কিন্তু প্রতিকারের ইঙ্গিত কোথাও নেই। অন্য কথায়, উপন্যাসকারের যে-দৃষ্টি সমাজের বিশেষ কোনো ঘটনা, প্রবণতা বা বক্তব্যকে সুচতুর ইঙ্গিতে সমগ্র সমাজের সঙ্গে গ্রথিত করে, দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে-সবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিচারেও প্রবৃত্ত হয়, 'লাল সালু'-তে তা একেবারে অনুপস্থিত নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু নিরীহ এবং অনেকাংশেই অস্পষ্ট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এক সময় কোনো কোনো মহলের ধারণা ছিলো, সংলাপে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রতি সফল আনুগত্যই উপন্যাসখানির সাফল্যের বুনিয়াদ। কিন্তু আঙ্গিক, ভাষা আর কাহিনী পরিকল্পনার যে-উৎকর্ষ সামস্ততঃ 'লাল সালু'-র সাফল্যের সহায়ক, তা আজ আর কারো কাছেই দুনিরীক্ষ্য নয়।

'লাল সালু'-র আট বৎসর পরে, ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত, ইসহাক চাখারীর 'মেঘবরণ কেশ'-এর কাহিনী গ্রাম এবং নগর উভয় সমাজেই প্রসারিত। এ-উপন্যাসে লেখকের কাম্য নগর-জীবনের অভিজ্ঞতা আর জীবনবোধের সাথে গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতার মিলনের মাধ্যমে নতুন সমাজের আবির্ভাব। কিন্তু গতানুগতিক বর্ণনাভঙ্গির কারণে এবং ইতিহাস-ভিত্তিক সমাজচেতনার অভাবে তাঁর কাহিনী রোমান্টিকতার ঘোর কাটিয়ে খুব বেশী সহজ হয়ে উঠতে পারেনি। আমিনুল হকের যার ভাগ্যে যা ছিল' (১৯৫৫), 'তারা যা ভাবে', টাইগার হিল ইত্যাদি উপন্যাসে এবং মেসবাহুল হকের 'আরেক পৃথিবী'-তে (১৯৬০) জীবন-

চেতনা প্রখরতরো। কিন্তু আমিনুল হকের রচনাবলী বিষয়ে এবং বক্তব্যে স্বধর্মনিষ্ঠ হয়েও স্থায়ী স্বাদ দিতে অক্ষম। এবং মেসবাহুল হকের উপন্যাস ভাবালুতায় বিপরিণত। অথচ 'আরেক পৃথিবী'-র নায়িকা, নারীবিলাসের খেয়ালের শিকার সরস্বতী, সুরমা বৌদি ইত্যাদি চরিত্রের ভাগ্যবিড়ম্বনার মূল কারণ লেখকের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য ছিলো না।

রোমান্টিক ভাবালুতায় নিজেদের অজানতে বিপন্ন হয়েছেন এই উপবর্গের আরো কয়েকখানি উপন্যাসের লেখক। যেমন, শওকত আলী তাঁর 'পিঙ্গল আকাশ'-এ (১৯৬৩), আনিস চৌধুরী 'সরোবর'-এ (১৯৬৮) এবং মীর আবুল হোসেন 'বিপণী মন'-এ (১৯৬৮)। 'পিঙ্গল আকাশ' নগর-জীবনের ক্লেদাক্ত দিকের প্রতিচ্ছবি। এ-প্রতিচ্ছবি আমাদের নির্মম-ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়, আধুনিক নগর-সমাজের একাংশে সুস্থ জীবনকামনা আজ কতকগুলি অশুভ শক্তির আক্রমণে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত। নায়িকা মঞ্জুর রোজনামচার ঘটনাবলীতে এ-অংশের যে আর্তি বিধৃত, তা যে-কোনো পাঠকেরই অন্তর স্পর্শ করবে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এর মূল অনুসন্ধানে লেখক অনীহ এবং মঞ্জুর দুর্দশার ইতিহাস তাঁর হাতে আপাত-রসাল যৌনমৃগয়ার অনিচ্ছুক শিকারের সরল ইতিহাসে পরিণত। 'সরোবর'-এর নায়ক শাহানশা চরিত্র হিসেবে বিচিত্র এবং অবশ্যই বলিষ্ঠ। কিন্তু সেও সমাজ-জীবনের এক ট্র্যাজেডির প্রতীক। সমাজ-জীবনের নানা পথের অপরিহার্য পথিক শাহানশার মন স্নেহের জন্যে লালায়িত। অথচ হৃদয়কে অনাবৃত করতে সে নিরতিশয় কুণ্ঠিত। তাই, তার রিক্ততার জন্যে সে নিজেই হয়তো দায়ী। তবু, সমাজের অন্ধ স্বার্থবাদ কি একেবারেই নিরপরাধ? শাহানশা চরিত্রের রূপায়ণে এই দুটি একলক্ষ্য বিষয়ের ভূমিকার যে সম্ভাবনা ছিলো, 'সরোবর'-এ তার যথাযথ ব্যবহার অবশ্যি কমই লক্ষণীয়।

মিজানুর রহমান শেলীর 'পাতালে শর্বরী'-র (১৯৬৫) সমস্যা স্বতন্ত্র। এ-উপন্যাসের স্থানগত পটভূমি, 'মেঘবরণ কেশ'-এর পটভূমির মতোই, গ্রাম-নগর উভয় দিকেই প্রসারিত, কিন্তু সমাজজ্ঞানে আর শিল্পবোধে তার উপবর্গে 'লাল সালু' ছাড়া অন্য যে কোনো উপন্যাসের তুলনায়

ঋদ্ধতরো। নিজস্ব, অতি আধুনিক ভাষায় এবং চেতনাপ্রবাহের ক্বচিৎ-অনুসৃত আঙ্গিকে লিখিত 'পাতালে শর্বরী'-তে লেখক অবশ্যি গ্রামীণ সমাজের বিচার করেছেন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার আলো ফেলে। এবং সে-বিচারও সংক্ষিপ্ত। কেননা, গ্রামীণ প্রসঙ্গই এ-গ্রন্থে গৌণ। 'পাতালে শর্বরী'-র মুখ্য ভাগ নগরের তথাকথিত অভিজাত সমাজের কুৎসিত রূপের দর্পণ। এ-সমাজে নিরক্ষর, নিম্নবিত্ত গ্রাম্য পরিবারের সন্তান জাভেদ চৌধুরীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সমস্যাই গল্পের প্রধান উপজীব্য। কেরিয়ারিস্ট তসলিম, স্বকৃত মেহনতে সফলজীবন উকিল আজীজুদ্দীন, তাঁর লীলাবিলাসিনী কন্যা নাসিমা, রোমান্টিক বিভাবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা আধুনিকা নাসরিন, মুখোসধারী অভিজাত নাগরিক রশীদ ইত্যাদি চরিত্রের প্রভাব উক্ত সমস্যায় যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে, তা শুধুমাত্র নীরস জটিলতা নয়, নানাবিধ বর্ণের সমাবেশে মনোরম। বস্তুতঃ, বিষয়ের সাথে এমন সচেতন দর্শকসুলভ অন্তরঙ্গতা এবং তার এমন সরস, যদিও অসম্পূর্ণ, বিশ্লেষণ আমাদের উপন্যাসে বিরল।

সামাজিক উপন্যাসের আলোচনায় আমাদের পরবর্তী উত্তরণের ক্ষেত্রে জীবনের সমস্যা আর সংগ্রামের আবির্ভাব এজমালি পরিসরে। যেখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী', (১৯৬২), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'আদিগন্ত' (১৯৬০), শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬১), শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২), এবং হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' (১৯৬৫)। এই সঙ্গে অনতিখ্যাত কিন্তু বিষয়ের আর রচনার ঐশ্বর্যে মোটামুটি হিসেবে শ্রদ্ধেয় আরো দুই-একখানি উপন্যাসের কথাও এ-উপবর্গে স্মরণীয়। যেমন, জহির রায়হানের 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), দিলআরা হাশেমের 'ঘর মন জানালা' (১৯৬৫) এবং শহীদ আখন্দের 'পান্না হলো সবুজ' (১৯৬৫)। 'সূর্যদীঘল বাড়ী' আর 'আদিগন্ত' সমাজের কতকগুলি নিঃস্ব এবং নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে লিখিত। এই মানুষগুলির দুঃখ-দুর্দশার মূল যে অশুভ শক্তি, উপন্যাস দুখানিতে তার আবির্ভাব সংস্কার আর লোভ-লালসার মূর্তি ধরে এবং সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতির বিযদৃষ্ট ছায়ার সাথে হাত মিলিয়ে। এতোগুলি শক্তির যৌথ আক্রমণে সমাজের নিম্নতমো স্তরের মানুষের

অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখা শক্ত। কিন্তু তাদের জীবনবোধও দুর্বল নয়। বরং দেখতে পাই, সহজ সত্যনিষ্ঠা আর কমনীয় হৃদয়বৃত্তির সাথে যুক্ত হয়ে এই জীবনবোধ 'আদিগন্ত'-এর একাধিক চরিত্রে এবং 'সূর্যদীঘল বাড়ী'-র নায়িকা জয়গুনের মনে যে দুর্মর সংগ্রামী চেতনা এনে দিয়েছে, তার জন্যে তারা সব আশ্রয় হারানোর পারও নতি স্বীকার করে না।

'জননী'-র রচনা বিভাগপূর্ব কালে, পটভূমি পশ্চিম বাংলার কোনো গ্রাম এবং কাহিনী এক সন্তানস্নেহাতুরা নারীর চরম আত্মনিগ্রহের। উপন্যাসে নায়িকার আবির্ভাব কোনো নিম্নবিত্ত পরিবারে, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী রূপে। এই সংসারে তার জীবন আর্থিক সমস্যায় বিড়ম্বিত। কিন্তু তার জীবনে অভিজ্ঞতার উৎস প্রথম স্বামীর ঔরসজাত একটি সন্তানের প্রতি তার সবভোলা স্নেহে। যে-স্নেহ এক বন্ধ্যা প্রতিবেশিনীর সন্তান কামনার তীব্রতায় সমর্থিত। এই স্নেহই তাকে নানান স্খলন-বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেয়। এবং সে লক্ষ্য করেছে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এসবের থেকে নিজেকে বাঁচানোর সাধ্য তার নেই। তবু, সন্তানের কল্যাণ আর উন্নতির কামনায় বিক্রীতদেহ এবং সন্তানের চোখে ধিকৃত নারী, তার সমস্ত দোষত্রুটি নিয়েই, মহান মাতৃত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তার এই মর্যাদা যে কোনো পাঠককে অভিভূত করবে।

'সারেং বৌ' শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাস আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার লেখককে উপন্যাসকার রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এ-গ্রন্থ প্রোষিতভর্তৃকা এক সারেং-গৃহিণীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর বিপন্ন কিন্তু সূর্যমুখীর মতো একনিষ্ঠ স্বামীপ্রেমের কাহিনী। এই কাহিনী বর্ণনা করতে বসে লেখক প্রবাসী সারেংদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির যে ছবি এঁকেছেন, আমাদের বিভাগোত্তর কালের কথা-সাহিত্যে তা সম্পূর্ণতঃই নতুন।

আধুনিক মানসপ্রবণতার লেখক হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ'-এর নায়িকা ফরিদা বানু আধুনিক সমাজের ঘটনাবর্তের শিকার। স্নেহশীল পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান, লাবণ্যবতী এবং শ্রীময়ী ফরিদা বানু প্রথম জীবনে আর দশটি মেয়ের মতোই এক সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলো। কিন্তু যে-ঘটনাবর্ত নিম্নবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে

মারে, কবীরের মতো নারীহৃদয়বিলাসী ধনিক তরুণের জন্ম দেয়, আনোয়ারের মতো কপট, স্বার্থপর যুবককে একই সঙ্গে একাধিক কুমারীর সাথে প্রেমের অভিনয়ে উৎসাহিত করে এবং ফারুকের মতো কামুককে যত্রতত্র হাত বাড়াতে সাহস যোগায়, ফরিদা বানু প্রথম স্বপ্নের দিন থেকেই তার কবলে পতিত। কালক্রমে তার অভিজ্ঞান লাভ,—এই সংসারের কোনো ঘটনাই বুঝি আর নতুন নয়। তবু, প্রায়-দুর্মর এক মনোবলের অধিকারিণী ফরিদা বানু জীবনের পতন-অভ্যুত্থানের পথকে যতো দূর এবং যতো দিন সম্ভব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে চেয়েছে। এই মেনে নেয়ার মধ্যে তার যে সহিষ্ণুতা এবং সংগ্রামী মনোভাব পরিস্ফুট, তা আমাদের নতুন নগর-সমাজের ট্র্যাজেডির পাশে আশাবাদী মনোভাবের প্রতীক। এবং তারই ঔজ্জ্বল্যে নিটোল, রসঘন উপন্যাস 'নির্জন মেঘ' আমাদের সামাজিক উপন্যাসসাহিত্যে বিশিষ্ট।

জহির রায়হানের 'শেষ বিকেলের মেয়ে', দিলআরা হাশেমের 'ঘর মন জানালা' এবং শহীদ আখন্দের 'পান্না হলো সবুজ'-এও নিম্নবিত্ত মানুষের কথাই বিবৃত হয়েছে। 'শেষ বিকেলের মেয়ে'-র পরিবেশ আর চরিত্রগুলি অনেকাংশেই অবাস্তব এবং অতিমাত্রায় রোমান্টিক। তবু, এই সবের মাধ্যমেই, জহির রায়হান আধুনিক জীবনের একটি রূঢ় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন: ইচ্ছে মাফিক সুখী সংসার গড়ে তোলবার প্রয়াস আমাদের সমাজে পদে পদে বিঘ্নিত হয়। 'ঘর মন জানালা'-র নায়ক চিত্রী, নায়িকা কর্মজীবিনী এবং পরিণতি ট্র্যাজিক। সুলিখিত এই উপন্যাসখানিতে আধুনিক মানুষের শঠতার পাশাপাশি ত্যাগ আর মহত্ত্বের একটি দ্যুতিময় আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। তবে, 'ঘর মন জানালা'-র নায়কের অজ্ঞাতবাসের কাহিনীটুকু বড়ো বেশী কল্পনানির্ভর। 'পান্না হল সবুজ' জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্তপ্রায় কিন্তু অপরাজেয়-মন একটি উদারচেতা মানুষের বিরসদোসর কাহিনী। যদিও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কিছু অভাব এ-গ্রন্থেও আছে।

সামাজিক উপন্যাসের শেষ উপবর্গ বিভাগোত্তর কালের স্থানীয় সমাজের দৈহিক-মানসিক বিবর্তনের রেখাবলীতে চিহ্নিত। বলা বাহুল্য, এই বিবর্তন সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট সমাজতত্ত্বে বা ইতিহাসচেতনায় নিরীক্ষিত

নয়। প্রবীণ কথাশিল্পী আবুল ফজলের 'রাঙ্গা প্রভাত' (১৯৫৭) এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমাগ্রগতির প্রতিরূপ। এই প্রতিরূপ মূলতঃ রোমান্টিক, যদিও তার বক্তব্য বাস্তবানুগ এবং সমাজের কাঠামোতে কিছুটা ব্যাপকভাবেই প্রতিষ্ঠিত। 'রাঙ্গা প্রভাত'-এর অন্যতমো বৈশিষ্ট্য, এ-উপন্যাস দেশবিভাগের অব্যবহতি পূর্ব এবং পরবর্তী কালের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার-চিত্রী। এবং নায়কের আকৈশোর জীবনে মুসলিম সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধের সুস্থ অংশের সাথে একালের উদার মানবতাবোধ সমন্বিত।

স্বল্পখ্যাত লেখক আতহার আহমদের 'পিপাসা'-য়ও (১৯৫৮) সমাজমানসের পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ বিধৃত হয়েছে। (এ-উপন্যাসে অবশ্যি প্রাচীন-অর্বাচীনের সমন্বয় ঘটেনি।) 'পিপাসা'-র জীবনচেতনা সুখী এবং স্বচ্ছন্দ জীবনভোগের বাসনার নামান্তর। উক্ত বাসনার নিবৃত্তির পথে যেসব বাধাবিঘ্ন বর্তমান, সেগুলির সম্পর্কে লেখক মোটামুটি হিসেবে সচেতন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি ষষ্ঠ দশকের প্রথম দিকের ঢাকার মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধি এবং তারুণ্যের স্বপ্নে আর চাঞ্চল্যে আপাদ-মস্তক আবৃত। তা সত্ত্বেও আতহার আহমদের জীবনচেতনা সাময়িকতার গণ্ডীতে নিবদ্ধ। তারুণ্যের বিহ্বলতাকে সমাজ-জীবনের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার প্রয়াসের জন্যে যুগচেতনার যে গভীরতার প্রয়োজন ছিলো, 'পিপাসা'-য় তাও নেই। এসবের ফলে উপন্যাসখানি ষষ্ঠ দশকের প্রথমার্ধের ঢাকার প্রগতিশীল তরুণ সমাজের একটি অস্পষ্ট চিত্রের বেশী আর কিছুই হতে পারেনি।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এও যুগচেতনার অগভীরতা লক্ষণীয়। সুখপাঠ্য এই উপন্যাসখানির উপজীব্য (লেখকের মতে) আধুনিক জগতের আওতাবহির্ভূত কোনো দ্বীপের এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারের সাথে এক বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী পরিবারের দ্বন্দ্ব। এ-দ্বন্দ্বের শেষ পর্যায়ে উভয় পক্ষই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। তাদের চেতনাটুকু অবশ্যি ক্ষণিকের। তা সক্রিয় হয়ে ওঠবার আগেই লেখক কাহিনীতে যতি টেনেছেন। তবু, শেষ মুহূর্তে এই চেতনার মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নিপীড়িত মানবমনের এক আর্তি ধ্বনিত হয়।

'রাঙ্গা প্রভাত' আর 'পিপাসা'-য় যা অননুসৃত এবং 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এ ক্ষণদীপ্তিতেই অবসিত, শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'আলমনগরের উপকথা'-য় (১৯৫৫) তা-ই মুখ্য। এ-উপন্যাসের কাহিনী অংশতঃ লৌকিক (অন্ততঃপক্ষে লেখকের মতে), পটভূমি গ্রামীণ সমাজ এবং জীবনচেতনা সম্পূর্ণতঃই ইতিহাসনির্ভর। পীরবংশজ এক অবক্ষীয়মাণ সামন্ত পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এর প্রধান উপজীব্য। তবু, নটী গহরবাইয়ের সামাজিক মর্যাদা লাভের প্রয়াস, কুসীদজীবী ব্যবসায়ী মীর খাঁর আভিজাত্যাভিলাস, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট চৌধুরী সাহেবের অর্থলোভ, আলমনগরের সাধারণ মানুষগুলির ধর্মীয় সংস্কার-কুসংস্কার আর জীবনসংগ্রাম এবং সর্বাধুনিক সমাজদর্শনে বিশ্বাসী জমিদারপুত্র আলমগীরের বিপ্লবী মনোভাব আর গহরবাইয়ের কন্যা রোশনবাইয়ের সাথে তার প্রেম 'আলমনগরের উপকথা'-কে সুবিস্তৃত পটভূমিতে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে। তার ফলে, এ-উপন্যাস একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র আর ধর্মবোধের পারস্পরিক এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এক বর্ণময় চিত্র তুলে ধরে। যে-চিত্রের মূল রঙ শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার রেখায়নে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবালুতায় নিমজ্জিত। কিন্তু উপন্যাসখানির দুর্বার আশাবাদিতা আর শিল্পসুষমার পাশে সে-ভাবালুতা তুচ্ছ। বস্তুতঃ, কিছু দোষত্রুটি সত্ত্বেও, প্রথম সংস্করণে 'দুই মহল' নামে প্রকাশিত এবং উপন্যাস হিসেবে আজও অনতিশ্রুতনাম, 'আলমনগরের উপকথা' নিঃসন্দেহে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের—এবং আমাদের সমগ্র উপন্যাসসাহিত্যেরও—এক অতি বিশিষ্ট রচনা।

ওপরে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, আমাদের সামাজিক উপন্যাসসাহিত্যের বেশ কটি উল্লেখযোগ্য রচনা রোমান্টিকতায় আপ্লুত এবং তার ফলে সেগুলির আবেদন অনেকখানি নিষ্প্রভ। রোমান্টিসিজম যেখানে জীবন তথা দেশ-কালের সাথে সম্পৃক্ত, সেখানে তার সার্থকতা অনিবার্য। কিন্তু সে যখন শুধুমাত্র একটি রীতি, ধারা বা প্রবণতায় পর্যবসিত হয়, তখন তার একমাত্র পরিণতি দাঁড়ায় ব্যর্থতা। কেননা, সে-ক্ষেত্রে সে লেখকের নাকে দড়ি বেঁধে তাঁকে নিয়ে কেবল নিজের পথেই

বিচরণ করে এবং তাঁকে সব জিনিষই দেখায় রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে। সুখের বিষয়, বিভাগোত্তর কালের সামাজিক উপন্যাসে এমন শিকার বেশী নেই। এবং আমাদের কিছুসংখ্যক উপন্যাসে রোমান্টিসিজম ব্যাপকতরো আর সুগভীর জীবনবোধের উদ্দীপনেও সহায়ক। তার ফলে, এই উপন্যাস-গুলি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রবল জীবনমুখী আদর্শবাদে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণচেতনায়ও পরিপ্লুত।

এ-জাতীয় উপন্যাসের আদিতমো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবুল মনসুর আহমদের 'জীবনক্ষুধা' (১৯৫৫)। এ-উপন্যাসের ঘটনাকাল বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চম দশক এবং অবলম্বন তৎকালীন মুসলিম-সমাজ, তার জীবন-সংগ্রাম, ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি আর অভিজ্ঞান। সেকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর কাহিনীকে বিস্তৃত করেছেন জনবহুল পটভূমিতে। তাঁর দৃষ্টিও রত্নসন্ধানীর মতো সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং ক্ষেত্রে বিশ্লেষকের অনুভাবে প্রসারিত। তার ফলে, সমাজ-মানসের বহুবিচিত্র রূপ আর প্রবণতা তাঁর উপন্যাসে ধরা দিয়েছে। দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্ব কালের ঘটনাসঙ্কুল কটি বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সন্ধানের সঞ্চয় যে অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেয়, তার ব্যাপকতা আর গভীরতা দুই-ই বিস্ময়কর। আবুল মনসুর আহমদের সিদ্ধান্ত বা প্রতিপাদ্য বিষয় হয়তো সব ক্ষেত্রে বা সর্বাংশে জনগ্রাহ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাঁর জীবন-বীক্ষা অজ্ঞাতপূর্ব বস্তুর মতোই প্রবলভাবে পাঠককে আকর্ষণ করে। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত সুবৃহৎ উপন্যাস 'আবে হায়াত'-এও আবুল মনসুর আহমদের এই জীবনবীক্ষা স্পষ্ট। কিন্তু এ-উপন্যাসে তিনি সত্যের সন্ধানে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর গল্প-গ্রন্থ 'আয়না'-র ব্যঙ্গকাররূপে পুনরাবির্ভূত।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'শতাব্দীর ডাক'-এ মেসবাহুল হক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু 'জীবনক্ষুধা' আর তার অনুজদলের অন্যান্য উপন্যাসে জীবনবীক্ষার যে গভীরতা লক্ষণীয়, মেসবাহুল হকের রচনায় তা অনুপস্থিত। তাই, বর্তমান সমাজব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিতে অস্থির, যন্ত্রণাদিগ্ধ লেখক শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে

হিন্দুর ছদ্মবেশে মুসলিমের যোগদান, আজন্ম সহোদর ভ্রাতা রূপে জ্ঞাত কিন্তু ঘটনাচক্রে অনাত্মীয় পুরুষ রূপে পরিচিত নায়কের প্রতি নায়িকার অকস্মাৎ অনুরাগের সঞ্চার ইত্যাদির মতো ঘটনা-পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তববিবিক্ত রোমান্টিসিজমের দ্বারা বড়ো বেশী প্রভাবিত হয়েছেন।

'জীবনক্ষুধা'-র অনুজদলে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আলাউদ্দিন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬১)। 'শতাব্দীর ডাক'-এর মতো এ-উপন্যাসও জনবিরল এবং এর পটভূমিও অবিস্তীর্ণ'। কিন্তু জীবনবোধের গভীরতা আর শিল্পের প্রমিতিতে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে বিশিষ্ট। এই উপন্যাসখানিতে রোমান্টি-সিজম আর আদর্শবাদ যেন একাত্ম। তার নায়ক সুস্থ শিল্পাদর্শে বিশ্বাসী চিত্রী। এবং তার কাছে এই শিল্পাদর্শের প্রতিষ্ঠা সুখী আর শান্তিময় জীবনের প্রতিষ্ঠারই নামান্তর। তার মন দাম্পত্য প্রেম তথা পারিবারিক জীবনের সাফল্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমান সামাজিক পরিবেশ তার মানসিক সুখ লাভে আর আদর্শের রূপায়ণে অনুসরণে শুধু প্রতিকূলতারই সৃষ্টি করে। পরিবেশের সাথে তার সংগ্রাম তাই অনিবার্য। আলাউদ্দিন আল আজাদের চিত্রী এই সংগ্রামে জয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে একদা অমানিতা এক নারীকে (পরে যে-নারী তার স্ত্রী) স্নেহে প্রেমে আপ্লুত করে তার অবৈধ মাতৃত্বকে মর্যাদার উত্তুঙ্গ শিখরে বসিয়ে। পথ-সন্ধানের সময় সে চায় সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। সে তাই আধুনিক চিত্রী-সমাজের একাংশের উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দুক এবং ভিক্ষে দিয়ে ভিক্ষের বৃত্তি জীইয়ে রাখতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তার এই আদর্শ কেবল উক্তিতেই সীমাবদ্ধ। তার সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনো ঘটনাই উপন্যাসে নেই। অন্য দিকে, যে সুখী এবং মহৎ মাতৃত্বের সম্মাননা কাহিনীর প্রাণ, তার সঙ্গে জড়িত চরিত্রটিকে স্বগৃহের বাইরে অবিচ্ছেদ্যভাবে সমাজের অঙ্গীভূত বা টাইপ চরিত্র হিসেবে দেখাবার উপযোগী পরিবেশ বা ঘটনাও লেখক সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর চিত্রীর তৈলচিত্র তাই 'মাস্টার পীস' হয় না, হয় শুধু 'ভেরি নিয়ার টু মাস্টারপীস।'

আলাউদ্দিন আল আজাদের দ্বিতীয় আদর্শবাদী উপন্যাস 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪) শিল্পগুণে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'-এর তুলনায় দরিদ্র, কিন্তু সমাজের পটে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত। যাকে বলা চলে গণ-জীবনের উপন্যাস, আমাদের সাহিত্যে তার প্রথম প্রকৃত নিদর্শন 'ক্ষুধা ও আশা'। উপন্যাসখানির কাহিনী পঞ্চম দশকের প্রথমাংশের যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের ছায়াতলে বিস্তৃত। এই কাহিনীর সূচনা দুর্ভিক্ষে পীড়িত চাষী হানিফ, তার স্ত্রী ফাতেমা, কন্যা জহু আর পুত্র জোহার বাস্তুত্যাগে এবং সমাপ্তি হানিফের মৃত্যু, ফাতেমার দাসীত্ব, জহুর অনিচ্ছুক দেহব্যবসায় আর জোহার আশাবাদী জীবনসংগ্রামে। কাহিনীর এহেন পরিসরে লেখক যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের নানাবিধ ফল, তৎকালীন রাজনীতির সুস্থ-অসুস্থ বিভিন্ন ধারা-উপধারা, নগর-সমাজের সঙ্কট, হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্ক ইত্যাদি বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কাহিনী তৎকালীন সমাজের পূর্ণাঙ্গ কোনো চিত্র তুলে ধরে না। এর প্রধান কারণ, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যাপকতা আর তীব্রতা তাঁর দৃষ্টিপটে অনুপস্থিত। বুদ্ধিজীবী মহলের যে পরিচয় কাহিনীর পূর্ণতা বিধানের জন্যে বিবৃত হয়েছে, তাও মূল কাহিনীতে সুগ্রথিত নয়। সর্বোপরি, আলাউদ্দিন আল আজাদের নায়ক জোহা তার বয়েসের এবং অভিজ্ঞতার তুলনায় বড়ো বেশী সমাজসচেতন। সাদা কথায়, এঁচড়ে পাকা। এবং উপসংহারে গোর্কির বিখ্যাত গল্প 'একটি মানুষের জন্ম'-এর প্রভাবে সে চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতাদি থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। পাকিস্তানের জন্যে বঙ্গবিভাগ, ইংরেজশাসনের কালগত দৈর্ঘ্য ইত্যাদির মতো কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে লেখক কিছু ভুল তথ্যও পরিবেশন করেছেন।

শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) অপরাজেয় মানব-মনের কাহিনী। আবুল মনসুর আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ উপন্যাসকার তাঁদের আদর্শ আর বক্তব্যের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চেয়েছেন মোটামুটি হিসেবে সাম্প্রতিক কালের চৌহদ্দিতে। কিন্তু শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'-র পরিমণ্ডলকে বোধ হয় কোনো দেশ বা কালের গণ্ডীতেই স্থাপন করা চলে না। তাঁর নায়কের ঘোষণা, দীরহাম-দৌলত দিয়ে গোলাম কেনা যায়, বাঁদী কেনাও সম্ভব, কিন্তু তাদের হাসি

কেনা যায় না। এই ঘোষণার স্থান হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ক্ষমতা এবং ধনের গর্বে মত্ত হারুণ-অর-রশীদের বাগদাদকে। সেই সামন্তবাদী বাগদাদের থেকে আধুনিক ধনতন্ত্রী সমাজের বা তার ক্রীতদাসের থেকে ধনতন্ত্রী সমাজের হাতে বন্দী মানুষের কোনো পার্থক্যই নেই। তাই, স্বচ্ছন্দেই বলতে পারি, মানুষের যে-হাসি তার স্বাধীন আত্মার প্রতীক, তা কোনো দেশে কোনো কালেই নিজের উৎস ছাড়া আর কাউকেই মানে না এবং অন্যের হুকুমের আওতায় পড়লেই সে যায় নির্বাপিত হয়ে। শওকত ওসমান অবশ্যি এই সত্যকে দেশ-কালের ঊর্ধ্বে স্থাপনের পর তার প্রয়োগক্ষেত্রের সন্ধানে বেরিয়ে কাহিনীর শেষাংশকে (উপন্যাসে আসলে যা পূর্বভাষণ) যুক্ত করেছেন এদেশের মাটির সাথে। যেখানে তার একটি সম্প্রসারণ দেখি: এককালে হয়তো মানুষ কোনো কোনো অবস্থার কাছে হার মেনেছিলো এবং জীবনের একটি লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে সার্থকতার আর কোনো পথ খুঁজে পেতো না, কিন্তু এদেশের তথা একালের মানুষ ব্যর্থতার সম্মুখে পড়লে এক বারেই হাল ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

'সমাগম' (১৯৬৭) শওকত ওসমানের দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস। তবে, তার প্রকৃত পটভূমি পৃথিবীর মানবসমাজ। চরিত্রে ফ্যানটাসি জাতীয় এবং শেষাংশে নাটকের আঙ্গিকে লিখিত এই উপন্যাসখানির আদ্যোপান্ত হালকা রসে জারিত। কিন্তু সে শুধু তার বাহ্যিক রূপ। সে-রসের সামান্য নীচেই নিরতিশয় গভীর বিষয়ের সমাবেশ দৃশ্যমান। 'সমাগম'-এ বর্তমান আলো-হাওয়ায় লালিত কিছু মানুষের প্রতিচ্ছবি আছে বটে। কিন্তু মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অবতীর্ণ প্রস্থিতপ্রাণ কয়েকজন মনীষী আর মহাপুরুষ, অবশ্যই স্থিতপ্রাণ মানুষের রূপে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন কবি আলাওল, বার্ণাড শ', রলাঁ, মাইকেল, হাজী মহসীন এবং বিদ্যাসাগর। শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং টলস্টয়ও কয়েক মুহূর্তের জন্যে আবির্ভূত হন। উপন্যাসের ঘটনাবলীর বিন্যাস এই সব মনীষী আর মহাপুরুষের সাহিত্য এবং জীবনদর্শনের মর্মবাণীর সরস বিচারে। কিন্তু মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ আর শান্তির বাণী উচ্চারণ। যে-বাণী আজ সারা বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধি মানুষের কণ্ঠেই

আকুতির রূপে ধ্বনিত। শওকত ওসমান একে সংক্ষিপ্ত কটি কথার মাধ্যমে স্বর্ণপদবীর মতো করে আমাদের চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তুলেছেন, —'মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক', 'ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদিগণ ও তাদের অনুচরেরা ধবংস হোক', 'মানুষের নির্বোধতম সংগঠন হিসাবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ।' বক্তব্যের এই আন্তর্জাতিকতায় এবং বাচনভঙ্গির আর রচনাকৌশলের অভিনবত্বে 'সমাগম' আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে অনন্য।

'সমাগম'-এর পর শওকত ওসমানের আরো দুখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাসখানির নাম 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৮)। এর কাহিনী রূপকাশ্রয়ী এবং তার বুনিয়াদ চোর-গুণ্ডা শ্রেণীর কয়েকটি মানুষের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিচিত্র পদ্ধতি। নায়ক কাল্লুর কাহিনীতে বর্তমান কালের সমাজের তথাকথিত ভদ্রজনদের কিছু ক্লেদময় চিত্রও গ্রথিত হয়েছে। কিন্তু এইটুকুই কাহিনীর একমাত্র বা প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। 'চৌরসন্ধি'-র কাহিনীর মূল লক্ষ্য তথা বৈশিষ্ট্য রূপকের আবরণে উপ-মহাদেশের শোষক-লুণ্ঠকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বার্থের খাতিরে দেশবিভাজক মীমাংসার মাধ্যমে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসানের ইতিকথা বর্ণনা। কিন্তু বহু দূর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার বুনিয়াদে গড়া রূপকে আশ্রিত বলে ঘটনাবলীর পরিকল্পনা স্পষ্টতঃই কৃত্রিম এবং বর্ণহীন। এমনকি, অভিজাত আর স্ল্যাং শব্দের নিপুণ মিশ্রণে নির্মিত বাগ্‌ভঙ্গিও তার দুর্বলতা ঢাকা দিতে পারেনি। বরং দেখা যায়, অতিচটুলতায় আর কিছু অশালীন শব্দের ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত কাহিনী তার বক্তব্যের ভারটুকু হারিয়ে ফেলেছে। বিষয়ের দিক থেকে তর্কাতীতরূপে বিশিষ্ট হয়েও 'চৌরসন্ধি' তাই শওকত ওসমানের দুর্বলতমো উপন্যাস।

'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০) শওকত ওসমানের চতুর্থ বিভাগোত্তরকালীন উপন্যাস, যার পটভূমি ঐতিহাসিক কিন্তু কল্পিত। লেখক এর কাহিনীকে অভিহিত করেছেন 'শাহ্‌নামা'-র এক অলিখিত কাহিনী বলে। শাসকরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চান জ্ঞানবিদ্যা আর তারুণ্যের বিনাশের মাধ্যমে, কিন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই অন্ধকারে ঠেলে দেয় এবং প্রকৃত শাসক তিনিই হন, যিনি জনসাধারণের ইচ্ছের ইচ্ছে মেলাতে পারেন, - এই

বক্তব্যের কাঠামোতে নির্মিত 'রাজা উপাখ্যান'-এর কাহিনীর মূল নায়ক সম্রাট জাহ্হক। তিনি অভিশপ্ত এবং তাঁর কণ্ঠদেশ দুটি গোখরো সাপের দ্বারা পরিবৃত। সাপ দুটির খোরাক তরুণ-তরুণী এবং জ্ঞানী-গুণীজনের মগজ, যার সরবরাহে যতি পড়লে সম্রাট নিজেই খোরাক হবেন। শেষ পর্যন্ত আপন কন্যা এবং মগজের জন্যে বন্দীকৃত এক তরুণের চেষ্টায় তিনি রক্ষা পান এবং নিজেকে জনগণের দাস বলে ঘোষণা করেন। এই লোমহর্ষক কাহিনী অনেকাংশেই সংক্ষিপ্ত, খণ্ডচিত্রের সমাহার। খণ্ডচিত্রগুলি সব ক্ষেত্রেই সার্থক, এমন কথা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু সমাহার শাসক-শোষক সমাজের—এবং প্রাচীন পারস্যেরও—কিছু উপাদেয় চিত্র তুলে ধরেছে। চরিত্রগুলির অধিকাংশই স্বল্পরেখ এবং অসম্পূর্ণ,—যদিও আকর্ষণ কারোই কম নয়। মোটামুটি হিসেবে সম্পূর্ণ কেবল হুরমুজ, যার বুদ্ধির বলে সম্রাট মুক্তি পান।

স্থিতলক্ষ্য জীবনবোধে এবং যুগচেতনার গভীরতায় আমাদের আরো কয়েকখানি উপন্যাস সচ্ছল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) এবং সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'অনেক সূর্যের আশা' (১৯৬৭)। 'সারেং বৌ'-তে শহীদুল্লা কায়সার ব্যষ্টির মানসে, অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে মানুষের আত্মরক্ষার যে সংগ্রামী প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'সংশপ্তক'-এ তা-ই সুবিস্তীর্ণ পটভূমিতে, ঘটনাসঙ্কুল আর জনবহুল পরিবেশে এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিত্রিত। মোটামুটি হিসেবে পঞ্চম দশকের শুরু থেকে শেষ অবধি সংস্থিত 'সংশপ্তক' এক দিকে যেমন অবক্ষীয়মাণ সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণায় লালিত মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর স্বাভাবিক মৃত্যুর কাহিনী, অন্য দিকে তেমনি মুসলিম-সমাজের ক্রমিক জাগৃতির ইতিহাস। ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতীক দরবেশ চাচা বা সর্বতোভাবে অন্তঃপুরিকা বড়ো সৈয়দগৃহিণী যে সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, তারই পচনশীল, ভিজে মাটিতে জন্ম নিয়েছে নতুন যুগের নতুন প্রাণ,—প্রথমে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি এবং তার পরে সেকান্দরের প্রভাবে মোহমুক্ত—জাহেদ। এবং নবীন মুসলিম নারী-সমাজের আদরার প্রতীক রাবুও। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গার পটভূমিতে জাহেদ, রাবু এবং (পরে বিব্রতমনা)

সেকান্দরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আর নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সাধনায় ফেলু, রামদয়াল আর তাদের সমশ্রেণীর কিছু মানুষ প্রবল প্রতিপক্ষ। এখানে স্থূল রেখায় উপস্থাপিত, এই তথ্যটি পঞ্চম দশকের মুসলিম সমাজমানসের বিভিন্ন প্রবণতার এক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে লব্ধ। এবং বিশ্লেষণটিকে সম্পূর্ণ করেছে মালুর কাহিনী। যা বাকুলিয়ার সৈয়দ পরিবারের কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র, 'সংশপ্তক'-এ চিত্রিত সমাজের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ধারানুসরণ। সব মিলিয়ে এ-গ্রন্থে বিষয়ের আর বক্তব্যের পরস্পরনির্ভর যে সম্পূর্ণতা পাই, আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে তা সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার্য, শিল্পবোধের আর রচনায় সংযমের অভাবে 'সংশপ্তক' দীন। পড়বার সময় অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, এ-গ্রন্থ যেন বেহিসেবী পরিকল্পনার এক রাশ ঘটনার বিশৃঙ্খল বিন্যাস।

'জীবনক্ষুধা', 'সংশপ্তক' আর 'ক্ষুধা ও আশা'-র মতো 'অনেক সূর্যের আশা'-র কাহিনীর কালও মোটামুটি হিসেবে পঞ্চম দশক এবং তার পটভূমিও সুবিস্তৃত। কিন্তু 'অনেক সূর্যের আশা'-য় বিষয়ের যে দৃঢ়সংবদ্ধ শিল্পানুগ রূপ দেখি, তা পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে নেই। বস্তুতঃ, ওপরে আমরা আদর্শবাদী, যুগসচেতন উপন্যাসবর্গে গণ-জীবনের উপন্যাসের যে রূপাভাস দিয়েছি, 'জীবনক্ষুধা', 'ক্ষুধা ও আশা', 'সংশপ্তক' ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত সে-উপবর্গে 'অনেক সূর্যের আশা'-ই একমাত্র সামন্ততঃ সার্থক রচনা। উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে বর্ণাঢ্য পঞ্চম দশকের ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যে আবুল মনসুর আহমদ থেকে শুরু করে সরদার জয়েনউদ্‌দীন অবধি সব উপন্যাসকারই মুগ্ধ। এবং সবাই তৎ-কালীন সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে তৎপর। কিন্তু উক্ত দশকের অন্যতমো প্রধান ঘটনা পাকিস্তান আন্দোলনের (যা আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত এবং কার্যতঃ যার জন্যে সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁর উপন্যাসকে ইতিহাস আশ্রয়ী বলে দাবী করেছেন) যথার্থ বিচার—বিশেষতঃ, তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে – আমরা 'অনেক সূর্যের আশা'-তেই প্রথম পেয়েছি। ক্ষুব্ধ, সিনিকপ্রতিম প্রাক্তন শ্রমিক ইস্রাফিলের অনুভবের জের টেনে এবং পুলিসের গুলীতে নিহত

সংগ্রামী শ্রমিকনেতা হায়াৎ খাঁর জীবনকথার বর্ণনায় পঞ্চম দশকের যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষে পীড়িত বাংলার যে চিত্র এ-গ্রন্থে রেখায়িত, তাকে এক কথায় বলা চলে তৎকালীন মুসলিম-সমাজের আশাবাদী মানসপ্রবণতার চালচিত্র।

'অনেক সূর্যের আশা'-র সমবয়েসী উপন্যাস মঈনুদ্দীনের 'নয়া সড়ক'-ও (১৯৬৭) আশাবাদী রচনা। চরিত্রে আদর্শবাদী এবং কোনো কোনো জায়গায় জনজীবনঘেঁষা এই উপন্যাসখানিতে যুগচেতনার আভাসও পাওয়া যাবে। কিন্তু মঈনুদ্দীনের যুগচেতনা সঙ্কীর্ণ ধারণায় লালিত। তাঁর কাহিনী বিভাগোত্তর কালের পটভূমিতে সংস্থিত। এবং তার পল্লবায়ন 'রদ্দিমাল ব্যবহার-সংস্থা' নামক একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক-পরিচালকদের জীবন আর আদর্শকে কেন্দ্র করে। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য আবর্জনাকে ব্যবহার্য রূপ দেওয়া। এর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয় অন্যান্য কর্মসূচী। জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে আদর্শ শিশু-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, আদর্শ পত্রিকা প্রকাশ, সমবায়ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি। উদ্দেশ্যাবলী মহৎ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সব উদ্দেশ্যই সমাজের সমস্যাদি-সম্পর্কিত ভুল— এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ববিরোধী মতবাদের দ্বারা পালিত এবং উচ্চশিক্ষিত ধনিক শ্রেণীর দুটি মানুষের দ্বারা অন্যের ওপর আরোপিত। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সমাধান যে সব সময় সমাজ বা জাতির কোনো সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়, কাহিনীস্পৃষ্ট সকল সমস্যারই মূল যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিহিত, লেখক তা জানেন না। তিনি তাই সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই রদ্দি মালের মতো এক আদর্শকে আঁকড়ে ধরে নিজের অজানতে কেবল ইউটোপিয়ার কানা গলিতে ঘুরে মরেছেন। তাঁর নায়ক-নায়িকা যদি কোনো সাফল্য লাভ করে থাকে, তবে তা তাদের আদর্শ আর কর্মপ্রচেষ্টার গুণে নয়। সেটা প্রায় সর্বতোভাবেই লেখকের ইচ্ছের ফল। তাঁর নিজস্ব ভুল বানান আর ভুল অর্থে প্রযুক্ত শব্দাবলীতে কণ্টকিত 'নয়া সড়ক'-এর কাহিনী তাই থামবার জায়গা পেরিয়েও বহু দূর এগিয়ে গেছে এবং যখন সিণ্ডেটের গণভোটের এক কর্মীকে জোর করে মহাপুরুষ বানিয়ে অকস্মাৎ থেমে পড়েছে, তখন তাঁর ঘটনা-পরিকল্পনা, আদর্শ, উদ্দেশ্য, সমস্তই হয়ে উঠেছে বস্তুতঃ হাস্যকর।

সত্যেন সেনের 'পদচিহ্ন'-এর (১৯৬৮) কাহিনী এর ঠিক বিপরীত। এই উপন্যাসে আমরা যে দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই, তা দেশের সকল সমস্যার প্রকৃত মূলে নিবদ্ধ। 'পদচিহ্ন'-এর কালগত পটভূমিও, 'নয়া সড়ক'-এর পটভূমির মতোই, বিভাগোত্তর যুগ। অসমসাহসী এই উপন্যাসখানিতে লেখক যে-সমস্ত সমস্যার অবতারণা আর আলোচনা করেছেন এবং সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেসবের সম্পর্কে আমরা সবাই অল্পবিস্তর সচেতন। কিন্তু সমস্যাগুলির স্বরূপ নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের মন বড়ো স্পর্শকাতর। এবং যখন আমরা সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিই, সে-দৃষ্টি সাধারণতঃ একদেশদর্শিতার উর্ধ্বে ওঠে না। এমনকি, অতি উদার, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে কদাচিৎ।

'পদচিহ্ন'-এর নায়ক আনিস এক সত্যিকার ব্যতিক্রম। সে সুস্থ, স্বচ্ছ আর নির্ভুল সমাজচেতনায় ভাস্বর। এমন চরিত্র আমরা 'পদচিহ্ন'-এর আগে বা পরে বিভাগোত্তর কালের আর কোনো উপন্যাসে দেখিনি। আনিসের এহেন অনন্যতার মূলে আছে তার তত্ত্বজ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মিলন তথা অপ্রিয় সমস্যার মূল সন্ধানে আর সমাধানের ইঙ্গিত দানে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজদর্শনের অকুতোভয় প্রয়োগ। সত্যেন সেনের এই উপন্যাসের কাহিনী আসলে তার ছোট্টো একটি ভ্রমণের কাহিনী। সে গিয়েছিলো তার হিন্দু বন্ধু সুবিনয়ের গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে। সেই অবকাশে সুবিনয়দের এবং আশপাশের আরো দুই-একটি গ্রামও তার দেখা হয়ে যায়। এই ভ্রমণের সময় সে নানাবিধ ঘটনার আর সমস্যার সম্মুখে পড়েছে। যেমন, হিন্দু পরিবারের স্পর্শ-বিচার, পাকিস্তানী হিন্দু সমাজের মানসিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদি। তাকে কতকগুলি ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারও মোকাবেলা করতে হয়েছে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে আমরা পাই শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে দ্বন্দ্ব, বাঙালী শরণার্থীর গ্রাম-বাসের অসুবিধা, শিক্ষিত এবং ধনিক শ্রেণীর শহরমুখিতা, মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নারী হরণ আর হিন্দু-মুসলিম বিবাহ। বস্তুতঃ, লেখক পাকিস্তানী আমলের কোনো উল্লেখযোগ্য সমস্যাই বাদ দিতে চাননি। কিন্তু, সুখের

বিষয়, একখানি উপন্যাসের সঙ্কীর্ণ পরিসরে এতোগুলি সমস্যা টেনে নিয়ে এলেও, সর্বত্রই তিনি সমস্যার মূল কারণ এবং তার প্রকৃত সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছেন। এবং তার চেয়েও বড়ো কথা,— সমস্যার উপরিপ্রদত্ত তালিকা থেকেই দেখা যাবে,—'পদচিহ্ন'-এ এমন কতকগুলি সমস্যার অবতারণা আছে, কোনো মুসলিম লেখকের রচনায় যার সমাধানের ইঙ্গিত দান তো দূরের কথা, আলোচনা থাকলেও তা অত্যন্ত হালকা—এমনকি, হাস্যকর—মনে হত। তবে, দেশের সমস্ত সমস্যাকে মাত্র একখানি উপন্যাসে দেখবার প্রয়াসের একটি কুফলও আছে। 'পদচিহ্ন'-এ এই কুফলটি মারাত্মক। এর কাহিনী স্কেচের সীমা ছাড়িয়ে কোথাও সুসংবদ্ধ রূপ নিতে পারেনি। লেখক যদি তাঁর কাহিনীকে সুসংবদ্ধ এবং আর একটু বিস্তারিত করতেন, আমার বিশ্বাস, 'পদচিহ্ন' তাহলে কেবল এখানকারই নয়, সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতমো শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হয়ে উঠতো।

পরবর্তী কালে সত্যেন সেনের আরো কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে আমরা মাত্র তিনখানির উল্লেখ করবো। উপন্যাস তিনখানির নাম 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' (১৯৬৯), 'উত্তরণ' (১৯৭০), আর 'মা' (১৯৭১)।

'সাত নম্বর ওয়ার্ড' চরিত্রে গণমুখী উপন্যাস। যে গণচেতনা সমকালীন সমাজের প্রায় সকল স্তরেই দেখা গেছে, এই উপন্যাসে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে। এর কাহিনী হাসপাতালকেন্দ্রিক। বর্তমান আলোচনা থেকে দেখা যাবে, এ-জাতীয় উপন্যাস আমরা আগেও একাধিক পেয়েছি। এবং যদিও গণচেতনায় দিপ্ত নয়, তবু সেগুলির কাহিনীও মোটামুটি হিসেবে যুগসচেতন। তবে, 'সাত নম্বর ওয়ার্ড'-এর কাহিনী সেগুলির তুলনায় অনেকখানি অগ্রসর। কাহিনীটির বর্ণনাকারী একজন অসুস্থ রাজবন্দী, যাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয় প্রহরাধীনে। (প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, লেখক নিজে একাধিকবার রাজবন্দী অবস্থায় হাসপাতালে গেছেন।) কিন্তু কাহিনীতে তাঁর ভূমিকা ঠিক সক্রিয় নয়, যদিও আশপাশের রোগী, নার্স, ডাক্তার, ওয়ার্ড বয় প্রমুখের কাজকর্ম, কথাবার্তা আর আচার-আচরণ তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছেন

এবং তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে চেয়েছেন। কাহিনীর মুখ্য বিষয় নার্স'দের হাসপাতাল-জীবনের চিত্রণ আর অধিকার আদায়ের আন্দোলন। এর মধ্যে বাইরের কিছু কথাও এসে পড়েছে। আর আছে অন্যান্য রোগী, ডাক্তার আর ওয়ার্ড' বয়ের কথা। বিশেষ করে, মজনু নামে এক বালকের করুণ ইতিহাস,—হাসপাতালে যার দুটি পা-ই কেটে ফেলা হয়। সবার কথা মিলিয়ে উপন্যাসে যে স্বচ্ছ, সাবলীল কাহিনী গড়ে উঠেছে, তা যে কোনো পাঠকেরই মনে দোলা দেবে। এমন সুলিখিত এবং সুসংবদ্ধ কাহিনী সত্যেন সেনের খুব কম উপন্যাসেই আছে।

সত্যেন সেনের বৃহত্তমো—প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার উপন্যাস—'উত্তরণ' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এ-উপন্যাস একটি সাধারণ মানুষের প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষ আর বিকাশের এক মহাকাব্য স্বরূপ। অপিচ, তার মাধ্যমে লেখক আমাদের বিভাগপূর্বকালীন—এবং বিভাগোত্তর কালেরও প্রথম কয়েকটি বছরের—সমাজের তথা রাজনীতির বহু সমস্যা, শোষণ আর সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। নায়ক মালেক অত্যাচারী পিতার সন্তান, কর্ম'জীবনের শুরুতে শোষক মাতুলের আশ্রয়ে পালিত। তারপর এক সহকর্মীর প্রেরণায় আর নিজের অভিজ্ঞতার উসকানিতে শুরু হয় তার অগ্রযাত্রা। যে-যাত্রায় তার সম্মুখে আসেন আতর্থী আর সিদ্দিকের মতো উদারপন্থী রাজনীতিক, হারুণ, মাসুদ আর দীন মোহাম্মদের মতো প্রগতিশীল কর্মী। ফল, শেষ পর্যন্ত সে সংগ্রামী শ্রমিক-কর্মীতে পরিণত। কিন্তু তার এই পরিণতিতে কেবল অপরের প্রেরণা আর সাহচর্য বা বৃহত্তরো সমাজের সমস্যা বা ঘটনাবলীই সাহায্য করেনি, ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিধ সমস্যাও এতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে,—বিশেষতঃ, তার এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে, উক্ত সমস্যাবলী বস্তুতঃ সামাজিক সমস্যারই অঙ্গ। এবং সে সাধারণভাবে মানুষের সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম তথা অগ্রগতির প্রতীক। এদিক থেকে 'উত্তরণ' সত্যেন সেনের এবং আমাদের আদর্শবাদী উপন্যাসসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ-গ্রন্থেও রচনাশৈলীর কোনো শিল্পগুণ নেই,—বিশেষতঃ, ভাষায়। যা আছে, তা হল কয়েকটি অপরূপ চরিত্র,—কদমালি, মালেক, মনোজ আতর্থী, রফু, মাসুদ প্রমুখ। (প্রসঙ্গতঃ, নারী-চরিত্রগুলি

যেন প্রায় ক্ষেত্রেই ছাঁচে-ঢালা।) আর রয়েছে এক অপরূপ কাহিনী, যা স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহের মতোই আপন বেগে আর বৈচিত্র্যে পাঠককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। এবং প্রমাণ করে, সত্যেন সেন কাহিনীনির্মাণে বাস্তবিকই ওস্তাদ।

'মা' বৃটিশ আমলের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক ক্রান্তিকালের স্মারক। এ-গ্রন্থের মূল উপজীব্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মৃত্যুর সূচনা আর সাম্যবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের এক পর্যায়ে তার কিছু কর্মী সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। 'মা'-র প্রধান চরিত্র প্রবাল তাঁদেরই প্রতিনিধি। গ্রন্থের সকল ঘটনা এবং বাকী সমস্ত চরিত্র তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আবর্তন বস্তুতঃ এক সংঘাত,—পুরাতন সন্ত্রাসবাদের সাথে নতুন সাম্যবাদের দ্বন্দ্ব। এ-দ্বন্দ্বের চিত্রণে কোনো পক্ষকেই অবশ্যি লেখক পূর্ণরূপে তুলে ধরেননি। তবে, সন্ত্রাসবাদের পরাজয় এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের বিস্তৃতি কাহিনীতে স্পষ্ট। নামচরিত্র মা (অসীমা), বীথি এবং আরো দুই-একটি চরিত্র যে শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তার কারণ ঠিক নতুন রাজনৈতিক চেতনা বা অভিজ্ঞতা নয়, প্রবালের প্রতি তাদের হৃদয়ের দুর্বলতা। অসীমাতে গোর্কির 'মা'-র মূল চরিত্রের কিছু প্রভাব আছে,—বিশেষতঃ, শেষ দিকে।

বৈচিত্র্য সন্ধানের অভ্যাস শিল্পীমানসের মজ্জাগত। এই অভ্যাসের ফলেই বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসে উপরি-উক্ত বর্গগুলির বাইরে, ভিন্নতরো শ্রেণীর কিছু উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান আলোচনার শুরুতে এ-জাতীয় উপন্যাসকে আমরা 'মনস্তাত্ত্বিক' নামে চিহ্নিত করেছি।

কিন্তু বলে রাখা ভালো, এমন চিহ্ন দানের কারণ কেবল সুব্যবহার্য শব্দের অভাব। ফ্রয়েড, পাভলভ, এলিস প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী আর যৌনতত্ত্ববিদের গবেষণার প্রভাবে বর্তমান শতকের প্রতীচীতে শিল্প-সাহিত্যে চিন্তার যে নতুন ধারা এবং মানসরহস্যের যে নতুন বিশ্লেষণ দেখা যায়, আমাদের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলি অবশ্যই সর্বাংশে সে সবের

ধারা আকৃষ্ট নয়। পরন্তু, উক্ত ধারা আর বিশ্লেষণ যদিচ এই উপন্যাসগুলির লেখকমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়, তাঁদের সৃষ্টির প্রকৃত এবং যথার্থ পরিচয়জ্ঞাপক বিশেষণটির নিকটতমো প্রতিবেশী সম্ভবতঃ 'মনোময়'। বস্তুতঃ, মনোময়তাই তাঁদের রচনাবলীতে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। কখনো প্রখর, আবেগময় যৌনতার পথে, কখনো যৌন দর্শনের প্রেক্ষিতে জীবনের এপিক-আভাস রূপায়ণের অছিলায়, কখনো বা অস্তিত্ববাদের কুটিল আবরণে।

এ-বর্গের উপন্যাসগুলির স্রষ্টাদলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় নাম সৈয়দ শামসুল হক আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এ-পর্যন্ত সৈয়দ শামসুল হকের চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে,—'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯) 'দেয়ালের দেশ' (১৯৫৯), 'অনুপম দিন' (১৯৬২) আর 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪)। প্রথম এবং তৃতীয় উপন্যাসের কাহিনী স্পষ্টতঃই মনোবিদ্যার তত্ত্বাবলীর ভ্রান্ত অনুসরণের ফল। দ্বিতীয় উপন্যাস 'দেয়ালের দেশ'-এ লেখক রোমান্টিক প্রেমের সাথে জৈব প্রেমের (যার লক্ষ্য বংশ-গতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সন্তান কামনা) সমন্বয় সাধনের সূত্র সন্ধান করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে গ্রন্থের উত্তরভাষণে যৌনতত্ত্ববিদ, ব্লথের একটি উক্তির উদ্ধৃতিও পাওয়া যাবে। কিন্তু উত্তরভাষণের ব্যাখ্যা যা-ই হোক, এ-গ্রন্থের নায়িকা তাহমিনা আর তার স্বামী আবিদ আসলে লেডি কন্সট্যান্‌স্‌ চ্যাটার্লি আর তাঁর পঙ্গু স্বামীর প্রতিচ্ছায়া। তবে, লেডি চ্যাটার্লির কাহিনীতে বাস্তবতার যে পুরু প্রলেপ আছে, 'দেয়ালের দেশ'-এ তা অনুপস্থিত। 'সীমানা ছাড়িয়ে'-র আলীজাহ আপাতদৃষ্টিতে মনের দিক থেকে স্বাভাবিক। নতুন শিল্প সৃষ্টির পথে রক্ষণশীলতার বাধাবিঘ্ন তাঁর মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করে, তার জন্যে তিনি পাঠকদের সমবেদনার হকদার। কিন্তু তাঁর শিল্পাদর্শের সম্পর্কে লেখক স্পষ্টবাক নন। আর, আলীজাহর ভ্রাতুষ্পুত্রী, উপন্যাসের নায়িকা জরিনাকে সৈয়দ শামসুল হক চাচার যে-জীবনদৃষ্টির রঙে রঞ্জিত করেছেন, তার স্বরূপ নির্ধারণ পাঠকদের পক্ষে অসম্ভব। আলীজাহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিল্পীজীবনের অভিজ্ঞতা শুনেই নিজের আর্মচেয়ার রাজনীতির ভুল বুঝে ফেললেন,—এমন ঘটনা বাস্তবতার বিচারে হাস্যকর। শক্তিমান লেখকের রচনার এই ব্যর্থতা পাঠকের

কাছে সত্যিই বেদনাদায়ক। বিশেষ করে এই কারণে যে, সৈয়দ শামসুল হকের চারখানি উপন্যাসের মধ্যে 'সীমানা ছাড়িয়ে'-তেই রচনাকুশলতার স্বাক্ষর সবচেয়ে স্পষ্ট।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের প্রধান কারণ অবশ্যি মনোময়তা নয়। আমরা বিষয় বা পটভূমিকার কোনো নতুনত্বও এতে দেখিনে। বিভাগোত্তর কালের প্রথম সফলকাম উপন্যাসকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা'-য় কোনো মৌলিক বক্তব্য নিয়েও উপস্থিত নন। উপন্যাসখানির নতুনত্ব তার রচনার টেকনিকে আর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের ভঙ্গিতে। যার বুনিয়াদ অস্তিত্ববাদ। এ-জিনিষ আমাদের আর কোনো উপন্যাসে নেই।

'চাঁদের অমাবস্যা'-র কাহিনী নির্মিত হয়েছে এক পল্লীনারীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। তার মৃতদেহটি যে প্রথম দেখতে পায়, সে স্থানীয় একটি অভিজাত পরিবারে আশ্রিত এবং স্থানীয় ইস্কুলের যুবক শিক্ষক আরেফ। মৃতদেহটি দেখবার পর সে সন্দেহ, কৌতূহল আর দ্বিধায় দিগ্ধ। সন্দেহ তার ঘটনার বিচিত্রতার কারণে, কৌতুহল রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে আর দ্বিধা খুনীর পরিচয় প্রকাশের শাস্তি স্বরূপ আশ্রয় হারানোর এবং অভিজাত পরিবারের মর্যাদাহানির আশঙ্কায়। কাহিনীর সমাপ্তি অবশ্যি যুবক শিক্ষকের কর্তব্যবোধের জয়ে। সব মিলিয়ে কাহিনীর যে গতি-পরিণতি দেখি, তা এক রহস্যোপন্যাসের স্বাদে ঋদ্ধ এবং এই স্বাদকে গাঢ় করেছে লেখকের নবসৃষ্ট গম্ভীর ধ্রুপদী ছন্দে আত্মস্থ ভাষা। কিন্তু 'চাঁদের অমাবস্যা'-য় আমরা যে-বস্তুর অভাব দেখি, তার তুলনায় ভাষার কারুকার্য তুচ্ছ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে নিষিক্ত অস্তিত্ববাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণতকরণের অপবাদে বিব্রত এবং 'চাঁদের অমাবস্যা' সে অপবাদ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। 'লাল সালু' আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'-র সমাজসচেতন, স্বদেশপরিচয়জ্ঞানী লেখক কোন্ কারণে অস্তিত্ববাদের প্রলোভনে পড়েছিলেন?

'চাঁদের অমাবস্যা'-য় আরেফের কর্তব্যবোধের জয়ে যেটুকু জীবনমুখিতা আছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে

(১৯৬৮) তা প্রায় বিলুপ্ত। রচনাসৌষ্ঠবে 'চাঁদের আমাবস্যা'র তুলনায় সমৃদ্ধতরো 'কাঁদো নদী কাঁদো' আরো বেশী মনোরম এবং রহস্যঘন। কিন্তু স্টীমার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মহকুমা শহরে যে আর্তি দেখা যায়, তার কাহিনী যদিও বহুপল্লবিত, কাহিনীর বর্ণনাকারী তবারক মিঞার মূল লক্ষ্য মুহম্মদ মোস্তফার জীবনের পরিণতি বর্ণনা। অথচ যে মানসিক দ্বন্দ্ব আর যন্ত্রণা মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়, তবারক মিঞা আর মুস্তফার ভাইয়ের স্মৃতিচারণে তা কার্যতঃ নিরস্তিত্ব। শিল্পের মাধুর্য আর টেকনিকের অভিনবত্ব সত্ত্বেও, কাহিনীর দিক থেকে 'কাঁদো নদী কাঁদো' তাই ব্যর্থ।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তৎপর এবং উল্লিখিত মনোময়তায় সিক্ত অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজী আতহার আহমদের 'উন্মোচন' (১৯৫৬), আহসান হাবীবের 'আরণ্য নীলিমা' (১৯৫৮), রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৮), ইসহাক চাখারীর 'বোবা জোয়ার' (১৯৬২), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'বেগম শেফালী মীর্জা' (১৯৬৮) ইত্যাদি।

চরিত্রে রোমান্টিক, 'উন্মোচন'-এর সমস্ত চরিত্রই কিশোর। এবং কাহিনী তাদেরই অস্থির, স্বাপ্নিক আর অনিশ্চিতলক্ষ্য মনের। যে-মন সব কিছুকেই দেখে নবপ্রেমিকের চোখে। এই মনের দিকে আমাদের আর কোনো উপন্যাসকার আজও দৃষ্টিপাত করেননি। 'আরণ্য নীলিমা'-র নায়ক চিত্রী এবং বাস্তবলোকের মানুষ। অনেকটা সজ্ঞানে লোভ-লালসার শিকারে পরিণত স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা তাই ক্ষমাসুন্দর। কিন্তু মনের দিক থেকে অপরাজেয় এই চিত্রী জীবনের স্বপ্নসাধ রূপায়ণের প্রয়াসে সমাজের নানা প্রতিকূল শক্তির কাছে পরাজিত। সে আধুনিক আদর্শবাদী জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের এক ট্র্যাজিক পরিণতির প্রতীক। 'বটতলার উপন্যাস' যৌনকামনাক্লিষ্ট মনের চিত্র এবং 'বোবা জোয়ার' শহরবাসী কয়েকটি মানুষের মনোবিকলনের বিশ্লেষণ। 'বেগম শেফালী মীর্জা'-র জালালী বু চরিত্রে, নায়ক রশীদের প্রথম জীবনে এবং অন্যত্রও বাস্তবনির্ভর জীবনবোধের কিছু প্রকাশ আছে। তা সত্ত্বেও সুপাঠ্য এই উপন্যাসখানি আসলে রশীদ এবং শেফালীর প্রেম আর মানসদ্বন্দ্বে প্রতিষ্ঠিত। রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১) আর প্রসন্ন পাষাণ-

এও (১৯৬৩) সমাজ জীবনের কিছু প্রতিফলন ঘটেছে, যেমন ঘটেছে নূরুল ইসলাম খানের 'মেহের জুলেখা'-য় (১৯৬৫)। কিন্তু রশীদ করিম মূলতঃ মনের কারবারী। এবং নূরুল ইসলাম খানের উপন্যাসখানি অন্তরাশ্রয়ী রচনার আঙ্গিকগত নিরীক্ষার ফল। উপন্যাসকার আটটি ছোটো গল্পকে 'ক্ষীণ' সূত্রে গেঁথে উপন্যাস রূপে উপস্থিত করেছেন। এ-জাতীয় নিরীক্ষা আমাদের আর কোনো উপন্যাসে নেই।

বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনায় যতি টানবার আগে আরো কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই উপন্যাস-গুলিকে উপরি-উক্ত কোনো শ্রেণীতে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়, বক্তব্য ইত্যাদির কারণে এগুলি কিছু বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত। প্রচলিত বর্গীকরণের প্রথায় তাদের সে-লক্ষণ অনিরীক্ষিত থেকে যেতে পারে।

এই উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'মুক্তি' (১৯৬৮)। আবুল মনসুর আহমদের 'জীবনক্ষুধা', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' আর সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'অনেক সূর্যের আশা'-য় আমরা কাহিনীর যে কালগত পটভূমি আর বিষয় পাই, 'মুক্তি'-র পটভূমি আর বিষয়ও তাই। কিন্তু এ-উপন্যাস উক্ত রচনাগুলির বিভাগোত্তরকালীন পূর্বসূরী নয়। কেননা, এর রচনাও বিভাগপূর্বকালীন। সঙ্কীর্ণ পরিসরেও জনবহুল উপন্যাস 'মুক্তি'-র কাহিনীকাল চতুর্থ দশকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি অবধি প্রসারিত। এই উপন্যাসে বাংলার তৎকালীন বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিক মহলের· বিশেষতঃ, তার মুসলিম অংশের— চিন্তাভাবনা আর মানসপ্রবণতার এক প্রামাণ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু শেষ দিকে আশরাফ. রহিমা, কৃষ্ণদাস আর ডলির প্রেম-দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের ফলে 'মুক্তি' প্রেমের উপন্যাসে পরিণত।

সত্যেন সেনের 'রুদ্ধ দ্বার মুক্ত প্রাণ' (১৯৬৫) কারাজীবনের কাহিনী নিয়ে লিখিত উপন্যাস। বাংলার প্রথম কারাভিত্তিক উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' যে রাজনৈতিক ধারা বিশ্লেষণের বলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সত্যেন সেনের রচনায় তেমন কোনো উদ্দেশ্য লক্ষণীয়

নয়। 'রুদ্ধ দ্বার মুক্ত প্রাণ' কারাবাসী কিছু মানুষের কাহিনী বর্ণনার অছিলায় সাধারণভাবে সকল মানুষের স্বরূপ আবিষ্কারে উৎসাহী। বস্তুতঃ, মানবতাবাদই এই উপন্যাসের প্রাণরস এবং কারাজীবনের সঙ্কীর্ণ পটভূমিতেও তা আপন দ্যুতিতে ভাস্বর। 'রুদ্ধ দ্বার মুক্ত প্রাণ' তাই আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের এক উপভোগ্য সৃষ্টি। তবে, সত্যেন সেনের আরো অনেক উপন্যাসের মতো এ-উপন্যাসেও কাহিনী সুসংবদ্ধ নয়।

'রুদ্ধ দ্বার মুক্ত প্রাণ'-এর তিন বৎসর পরে, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'সেয়ানা' নামক উপন্যাসখানিতে অবশ্য লেখক কাহিনী নির্মাণে অত্যন্ত যত্নবান। এর বিষয়টিও বিচিত্র,—ট্রেণের পকেটমারদের (পেশাগতভাবে যারা সেয়ানা বলে পরিচিত) জীবন। কাহিনীর নায়ক ঝড়ু বাড়ী ছেড়েছিলো দশ বছর বয়েসে এবং পকেটমার হয়েছিলো ঘটনাচক্রে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে তাকে আমরা পাই ছাব্বিশ বছরের যুবক রূপে। কিন্তু মনে সে তখন বৃদ্ধ। অন্ততঃপক্ষে তার নিজের বিচারে। পাঠকের বিচারে সে তখন অতি অভিজ্ঞ পকেটমার। কিন্তু সে ঘটনাচক্রে পকেটমারের পেশা গ্রহণ করলেও এবং ষোলো বছরে সে-পেশায় অতিশয় পাকা হয়ে উঠলেও (মাঝখানে অবশ্য কিছু দিন সে দেহপশারিণীদের দালাল এবং ভেড়ুয়া ছিলো) আসলে পকেট-মারের জীবনকে কখনো মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। পেশা-গত প্রয়োজনে সে বাংলা, বিহার, আসাম আর মণিপুরের বহু জায়গায় ঘুরেছে, বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছে এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর দেশবিভাগের মতো বড়ো বড়ো ঘটনা দেখেছে। কিন্তু কোনো কিছুই যেন তার মনে দাগ কাটেনি। বুকের গহনে তার সব সময়ই জেগে থেকেছে নীড়ের স্বপ্ন। যে-নীড় মাতাপিতার স্নেহে, গৃহিণীর প্রেমে আর সন্তানের মমতায় ঘেরা। ষোলো বছরের সেয়ানাজীবনে সে অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচটি নারীর স্নেহ বা ভালোবাসা পায়। বস্তুতঃ, সখিনা ভাবী, পদ্মিনী, লুসি কষ্টা, আয়শা আর বাসন্তী তার মরুময় জীবনে সত্যিকার ওয়েসিস। ঘটনার আবর্তে পড়ে সে লুসি কষ্টাকে নিয়ে ঘরও বেঁধেছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে-ঘর টেকেনি। তারপর আর তার নীড়ের স্বপ্ন সফল হল না। এমনকি, দেশ 'স্বাধীনতা' পাওয়া সত্ত্বেও। তার

স্বপ্ন সফল করবার পথে তখন প্রধান বাধা পেশা। তাকে তাই শেষ পর্যন্ত নিরুপায়ভাবে আবার ছিন্নমূল জীবনই বেছে নিতে হয়েছে। ঝড়ুর এই নিরুপায়তা আর গৃহমুখিতার দ্বন্দ্ব উপন্যাসে এমন দরদী তুলিতে চিত্রিত যে, তা যে কোনো পাঠকের মনই পকেটমারের সকল দোষক্রটি অপরাধ ভুলিয়ে তার প্রতি,—পকেটমারের আড়ালে পড়া রক্তমাংসের মানুষটির জন্যে সহানুভূতিতে ভরে তোলে। মানবচরিত্রের এমন দরদী হৃদয়স্পর্শী চিত্রণ আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে খুব কমই আছে।

উপন্যাসের প্রচলিত বর্গীকরণবিধির শাসন অগ্রাহ্য করেছে আবদুর রাজ্জাকের 'কন্যাকুমারী' (১৯৬০), মোহাম্মদ মোত'জার 'চরিত্রহানির অধিকার' (১৯৬৬), খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের 'কত ছবি কত গান' (১৯৬৭) আর গজনফর আলীর 'তিমির জীবন'-ও (১৯৬৮)। 'কন্যাকুমারী' কাহিনীচরিত্রে প্রেমের উপন্যাস। এবং পটভূমির বিচারে গ্রামীণ। কিন্তু মূল বেশ তার নগরের। এতে সমাজের কিছু খণ্ডচিত্র থাকলেও আসলে এ-উপন্যাস বিশেষ কোনো বক্তব্য পরিবেশন করে না। কিন্তু এর আঙ্গিকের স্বাস্থ্যময়তা আর মার্জিত মৃদুভাষণ যে শিল্পের স্বাদ দেয়, বক্তব্যের স্বাদহীনতাজনিত ক্ষোভ তাতে অনেকখানিই মিটে যায়। 'চরিত্রহানির অধিকার' সর্বতোভাবেই বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস। কিন্তু আধুনিক সমাজনির্ভর মনস্তত্ত্বের আলোকে দীপ্ত এই উপন্যাসখানির কাহিনীভাগে অর্জিত সাফল্য বিনষ্ট হয়েছে লেখকের এক সুদীর্ঘ উত্তর-ভাষণের ফলে। 'কত ছবি কত গান'-এর স্থানগত পটভূমি একখানি জাহাজ, যার যাত্রী বিভিন্ন দেশের বারোশত মানুষ। উপন্যাসখানির কাহিনী গড়ে উঠেছে যাত্রীদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে। এসবের জের টানতে টানতে কাহিনী যেমন সম্মুখদিকে এগোয়, তেমনি পিছিয়েও যায়। কোনো কোনো যাত্রীর কথা বলতে গিয়ে লেখক তাদের দেশের পুরাণো ইতিহাসের কাহিনীও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একখানি উপন্যাসের পরিসরে এতো মানুষের এতো কথা কখনো যথাযথভাবে বলা যায় না। সম্পূর্ণ করে তো নয়ই। 'কত ছবি কত গান'-এর আকারের বিপুলতা সত্ত্বেও তার কাহিনী তাই কতকগুলি আধোস্পষ্ট চিত্র বা জীবন্তিকার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই হতে

পারেনি। গজনফর আলী তাঁর উপন্যাসখানির ভূমিকায় বলেছেন, "আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা সার্থকতা-ব্যর্থতায় বিমণ্ডিত নিত্য-প্রবাহিত নিয়ত-চঞ্চল যে জীবন—তেরশ' পঞ্চাশ থেকে এক যুগ, তারই রূপায়ন প্রচেষ্টা 'তিমির জীবন'।" কথাগুলি পড়লে উপন্যাসখানির কাহিনীর সম্পর্কে পাঠকের মনে সত্যিই কৌতূহল জাগে। বিশেষতঃ, লেখক যুগচিত্র তুলে ধরবার যে প্রচেষ্টার কথা বলেছেন, তার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বগা-গনি-রমিজা-রাবিয়াকে নিয়ে গঠিত এক পরিবারের কাহিনী 'তিমির জীবন'-এ তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য খুব কমই চোখে পড়ে। শেষ দিকে যুগচিত্রের একটি আংশিক এবং অস্পষ্ট আভাস অবশ্যই আছে। সেটুকুর কথা বাদ দিলে, কাহিনীতে লেখক-কথিত যুগ বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপেই অনুপস্থিত। এবং বগা-গনি-রমিজা-রাবিয়ার জীবনসংগ্রামের চিত্রেও রেখার ঘন সন্নিবেশ বা বর্ণের ঔজ্জ্বল্য নেই।

আমাদের কোনো কোনো উপন্যাসকার বিদেশের বিখ্যাত রচনার আদলে স্বদেশী সমাজের ছায়া দেখবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'সত্যমিথ্যা'-য়, আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'খরতরঙ্গ'-এ (১৯৫৭)। 'সত্যমিথ্যা' যোহান বোয়ারের 'পাওয়ার অব এ লাই'-এর দেশজ রূপ। কিন্তু যোহান বোয়ারের কাঠামোতে বাংলার কাহিনীর পুনর্নির্মাণ স্বাভাবিক কারণেই সফল হয়নি। 'খরতরঙ্গ' জীবনবাদী উপন্যাসকার তুর্গেনিফের একটি কাহিনীর সার্থক ছায়ানুসরণ।

বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের বিস্তৃততরো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ওপরের আলোচনায় আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি আর উৎকর্ষ-অপকর্ষের সম্পর্কে যে সকল কথা বিক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, এবার শুধু সেগুলির সংগ্রহ আর সংক্ষেপনের মাধ্যমে এ-সাহিত্যের রূপটি একটু স্পষ্ট করে দেখে নিই।

বর্তমান আলোচনার শুরুতে আমরা বিভাগপূর্ব কালের বাংলা উপন্যাসের যে ইতিহাস বর্ণনা করেছি, তার থেকে লক্ষণীয় সে-উপন্যাসের বিকাশ প্রথম দিকে ছিলো মন্থর এবং প্রধানতঃ ইতিহাস-আশ্রয়ী। কিন্তু বৈচিত্র্যায়ণের পথে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় খুব বেশী সময়

লাগেনি। এবং বিভাগোত্তরকালীন উপন্যাসের যখন জন্ম, তখন পরিণতির সকল লক্ষণই বিভাগপূর্বকালীন উপন্যাসের অঙ্গে ছিলো স্পষ্ট। কিন্তু সেই পরিণতির বুনিয়াদে দাঁড়িয়েও বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস আজ অবধি যা পেয়েছে, তাকে কৈশোরের অনতিপুষ্ট চেতনার বেশী আর কিছুই বলা সম্ভব নয়। বয়েসে সে অবশ্যই কিশোর। তার সংখ্যাগত পুষ্টির প্রশ্ন তোলা তাই হয়তো অবান্তর। কিন্তু শিল্পের বিচারে বিভাগপূর্বকালীন বাংলা উপন্যাসের পরিণতিকে উপেক্ষা করবার কোনো কারণ তো দেখিনে। ওপরে বিভাগোত্তর কালের অনেক উপন্যাসেরই বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। সেই আলোচনার পর প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক: বিভাগপূর্বকালীন বাংলা উপন্যাসের বিভিন্ন শাখার যে স্মরণীয় সৃষ্টিগুলির নাম ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, এখানকার কয়খানি উপন্যাস সেগুলির পাশে স্থান পেতে পারে?

এ-প্রশ্নের আংশিক উত্তর আমরা বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনায় বিভিন্ন গ্রন্থের দোষগুণের উল্লেখে পেয়েছি। এখানে তারই জের হিসেবে আরো দুই-একটি কথা বলে নিলে অন্যায় হবে না।

বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসকারদের বিষয় নির্বাচন আর বক্তব্যের প্রবণতার যে আভাস ওপরের আলোচনায় পাওয়া গেছে, মোটামুটি হিসেবে তা অবশ্যই দেশকালনিষ্ঠ এবং জীবনমুখী। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই প্রবণতা সব ক্ষেত্রে নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন নয়। তার ফলে, আমাদের কোনো কোনো বিশিষ্ট রচনাও সামাজিক-ঐতিহাসিক তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যায় কিছুটা পথভ্রষ্ট। প্রমাণ, 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এ অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে উপনীত সামন্ততন্ত্রের সামনে ধনতন্ত্রের নামে বণিকতন্ত্রের উপস্থাপন। 'পাতালে শর্বরী'-তে নিম্নবিত্ত চাষী নির্বিত্ত সমাজের প্রতিনিধিরূপে উল্লিখিত। কোনো লেখক যে তাঁর এক উপন্যাসে জীবনপ্রেমী এবং অন্য উপন্যাসে জীবনবিমুখ পলায়নবাদী হতে পারেন, তার বিস্মাপক নজিরও দুর্লভ নয়। 'লাল সালু'-র সমাজচেতন মনের পাশে 'কাঁদো নদী কাঁদো'-র বা 'মেঘবরণ কেশ'-এর সমাজমুখিতার পাশে 'বোবা জোয়ার'-এর অর্থহীন মনস্তাত্ত্বিক বিসরণও যে সম্ভব, তা

কার্যতঃ অবিশ্বাস্য। এবং মলাটে সব ক্ষেত্রে লেখকের নাম মুদ্রিত না থাকলে পাঠকরা হয়তো ভাবতেও পারতেন না যে, 'তেইশ নম্বর তেলচিত্র'-এর প্রখর জীবনবোধ আর 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন'-এর যৌন কণ্ডূয়নের মূলে আছে একই লেখনী।

আমাদের উপন্যাসে আঙ্গিক আর কলাকৌশলেও ত্রুটিবিচ্যুতি বা অসংযমের অভাব নেই। 'জননী'-র দুই সতীনের কলহ, 'মেঘবরণ কেশ'-এ কেশবতীর আবির্ভাব এবং 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'-এর খালা-পরিচিতির সাথে মূল কাহিনীগুলির সম্পর্ক যে কি, বহু চিন্তার পরও পাঠক হিসেবে আমাদের কাছে তা অবোধ্য থেকে গেছে। অগোছালো রচনা 'সংশপ্তক'-এ হুরমতিকে দেখতে যাওয়ার পথে বানু আর আরিফার অভিজ্ঞতার যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই, তা রীতিমতো পীড়াদায়ক। 'ক্ষুধা ও আশা'-য় চট্টগ্রামে জোহার সামনে অকস্মাৎ আমদানী করা দেশলাইপ্রার্থীর মুখে আগুনের দ্ব্যর্থবোধক মাহাত্ম্যের কথা হাস্যকর। কাহিনীর বিন্যাসে দৃঢ়সংবদ্ধ 'অনেক সূর্যের আশা'য় নায়ক রহমতের সৈনিকজীবনের খুঁটিনাটি তথ্য নিতান্তই অবান্তর। 'কাশবনের কন্যা' দুটি সমান্তর কাহিনীর সমষ্টিমাত্র, স্বাভাবিক-ভাবে প্রত্যাশিত সঙ্গমপট নয়। 'আদিগন্ত'-র উপসংহার অতিমাত্রায় উদ্দেশ্যমূলক এবং 'রাঙা প্রভাত' আর 'কন্যাকুমারী'-র শেষাংশ অতি-নাটকীয়, সুতরাং শিল্পরসবর্জিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান প্রমুখ কয়েকজন উপন্যাসকার নিজেদের বিষয় আর বক্তব্যের উপযোগী ভাষা গড়ে নিয়েছেন। সে-ভাষা অবশ্যই সর্বজনবোধ্য। কিন্তু আমাদের অনেক উপন্যাসেই আঞ্চলিক শব্দ আর বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহারের প্রবণতা বড়ো বেশী প্রবল। অসংখ্য আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় মুখর আমাদের দেশের পাঠককুল তার ফলে রীতিমতো বিভ্রান্ত আর ক্লিন্ন। 'সত্যমিথ্যা', 'সংশপ্তক', 'হাজার বছর ধরে', 'অনেক সূর্যের আশা' এবং 'ক্ষুধা ও আশা'-র লেখকেরা ভুলে গেছেন যে, তাঁদের রচনায় আঞ্চলিক শব্দের মুহুর্মুহুঃ প্রয়োগ অপরিহার্য ছিলো না এবং এ-জাতীয় শব্দের প্রয়োগে তাঁদের সাফল্য যেমনি হোক না কেন অসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পাঠকজনের কাছে তা রসগ্রহণের পথে অকারণ বাধা। এ-প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, আমাদের বহু উপন্যাস-

কারের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে অশুদ্ধ আর অমার্জিত। এবং তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সুপ্রতিষ্ঠিত আর অতি খ্যাত লেখকও রয়েছেন।

বিষয় আর পটভূমি নির্বাচনের কালে আমাদের উপন্যাসকারদের দৃষ্টি এই সেদিনও অবধি নিবদ্ধ ছিলো প্রধানতঃ গ্রামের দিকে এবং গ্রামপ্রীতির ক্ষয় আজও খুব দ্রুত নয়। নাগর্যের অধিকার এদেশে এখনো অত্যন্ত সীমিত। আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের মুখ্যতঃ গ্রাম-কেন্দ্রিক হওয়া তাই স্বাভাবিক। কিন্তু অতিগ্রামকেন্দ্রিকতা অবশ্যই পক্ষপাতিত্বের লক্ষণ। কেননা, নাগর্য এখানে একেবারে উপেক্ষণীয় কখনো ছিলো না। অথচ আমাদের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের কাহিনীই গ্রামচারিণী। তবে, লক্ষণীয়, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির একটি বড়ো অংশে—বিশেষতঃ, তরুণ লেখকদের রচনায়—নাগর্যের অধিকার বিস্তৃততরো। এর সম্ভাব্য কারণ, গ্রামের সাথে পূর্বোক্ত লেখকদের তুলনায় তরুণদের সম্পর্ক ক্ষীণ।

বিভাগোত্তর কালের সাহিত্য যখন 'স্বাধীন' হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায়, নতুন পরিচয়ে আখ্যাত এবং নতুন উদ্দেশ্যে সংলগ্ন এদেশের সম্মুখে তখন সাহিতের রসদ অঢেল, সম্ভাবনা বহুবিধ এবং ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ। কিন্তু মানুষের বিবেক যেমন স্বাধীন হয়েও শত বাধা, সহস্র বিঘ্নের নিগড়ে অষ্টাঙ্গে বাঁধা, তেমনি দশা সে-সময়ে এদেশের সাহিত্যেরও। পঞ্চম দশকে—এমনকি, ষষ্ঠ দশকের প্রথম দিকেও এখানকার সাহিত্যের গতি ছিলো পদে পদে বিঘ্নিত। তার কারণ, এ-সাহিত্যের পথে তখন শৈলভূমির বন্ধুরতা, যার প্রধান স্থপতি প্রাণ ধারণ আর লালনের উপকরণের অভাব। এই অভাব দেখা দিয়েছে নানান রূপে, নানান বস্তুর মাধ্যমে। কখনো প্রকাশনা সংস্থার অপ্রাচুর্যে আর সাহিত্যলালনে অনীহায়, কখনো ব্যবসায়ের স্থূল প্রয়োজনের জিনিষপত্রের অনিশ্চিত এবং কৃপণ সরবরাহে, কখনো জনসাধারণের শিক্ষাগত মান আর লেখককুলের অভিজ্ঞতার আপজাত্যে, কখনো বা পাঠকজনের বিদেশীপ্রীতিজাত বৈরিতায়। এসব সমস্যার আভাস আমরা আগেই দিয়েছি। এগুলির নতুন, বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু বলে রাখি, এই সব বাধাবিঘ্নের ফলে আমরা লেখক পেয়েছি অল্পই।

এবং ওপরে যতো উপন্যাসের নামই উল্লিখিত হোক না কেন, বিভাগোত্তর কালের সৃষ্টি হিসেবে আমাদের উপন্যাসের সংখ্যা আজও উল্লাসজনক নয়।

তবু, আর একবার স্মরণীয়, বিভাগোত্তরকালীন সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো সঞ্চয় উপন্যাস। এবং এই সঞ্চয়ের কিছু গ্রন্থ এদেশের—এবং সমগ্র আধুনিক বাংলাসাহিত্যেরও—সেরা সৃষ্টির পর্যায়গত বলে স্বীকৃত। বিভাগোত্তরকালের উপন্যাসসাহিত্যের কোনো পরিক্রমাতেই আমরা যেন এ-তথ্য ভুলে না যাই। আমাদের এমন কথা বলবার বিশেষ কারণ সামাজিক উপন্যাসের ক্রমাগ্রগতি। এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ আজও প্রায় সর্বাংশেই গ্রামীণ। শ্রমশিল্পাশ্রয়ী যে আধুনিক সভ্যতা গতিনির্ভর, তার পদধ্বনিতে শহর-অঞ্চল যদিচ সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছুটা বিক্ষুব্ধ, গ্রামের সমাজে তার স্পন্দন অনুভূত হয় কদাচিৎ। পৃথিবীর বহুযুগলালিত সন্তান সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় আর সব দেশের মতো এখানেও স্পষ্ট। তবু, সামন্ততন্ত্রের অতিবৃদ্ধ ধ্যানধারণা আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের গ্রামজীবনকে যেভাবে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে, তার তুলনা খুব কম দেশেই পাওয়া যাবে। আবার, আধুনিক সভ্যতার বিরল স্পন্দনে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলেও এ-জীবনে যথেষ্ট জটিলতা দেখা দিয়েছে। নগরজীবনের অবস্থাও এর থেকে বিশেষ উন্নত নয়। বরং ধনতন্ত্রাশ্রয়ী সভ্যতার অশুভ শক্তিগুলি নগর-অঞ্চলে বর্তমানে যে-মাত্রায় তৎপর, তাতে এসব জায়গায় সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে আরো দ্রুত গতিতে এবং আরো তীব্রভাবে। তাই দিনযাপনের গ্লানি সম্পর্কে নগরসমাজ অনেক বেশী সচেতন। সে-গ্লানি তার কাছে অনেক বেশী দুঃসহও। সামন্ততন্ত্রের শানিত নখর থেকে কিছুটা মুক্ত এই সমাজের অবস্থা তাই যেন কড়াই ফেটে চুলোয় পড়া মাছের মতো। তবে, গ্রাম আর নগর দুই রাজগীতেই, বহুবিধ সঙ্কটের মধ্যেও, অবমানিত মানবাত্মা যে সত্য এবং সুস্থ জীবনবোধের টানে সংগ্রাম করে চলেছে, একথাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। এ-সংগ্রাম কালের অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সে-অগ্রগতিকে রুখবার ক্ষমতা কোনো সভ্যতা বা সমাজব্যবস্থারই নেই। এদেশের সমাজে অগ্রগতির লক্ষণগুলি হয়তো খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার অনতিস্পষ্টতাকে অনুপস্থিতি বলে ভুল করাই

কি সম্ভব? এবং ভুল আমাদের উপন্যাসকারদের হয়ওনি। নিরীহ সমাজচিত্র আমাদের উপন্যাসে ওপরের আলোচনায় অনেক দেখেছি, সত্যি। কিন্তু 'লাল সালু', 'সূর্যদীঘল বাড়ী' এবং 'আলমনগরের উপকথা'-য় যার সুচনা, 'নির্জন মেঘ', 'পাতালে শর্বরী', 'কর্ণফুলী,' 'ঘর মন জানালা,' 'পদচিহ্ন' ইত্যাদি উপন্যাসে তার ব্যাপ্তিও তো মিথ্যে নয়।

আশার কারণ আরো আছে। সে-কারণ আমাদের উপন্যাসকারদের বিষয়, বক্তব্য আর আঙ্গিকের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শওকত ওসমান নাটকসুলভ আঙ্গিকে লিখিত 'ক্রীতদাসের হাসি'-তে (এবং অংশতঃ 'সমাগম'-এ) আধুনিক বিশ্বের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহর সাম্প্রতিক দুখানি উপন্যাসই আঙ্গিক আর বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন। সৈয়দ শামসুল হক আর মীজানুর রহমান শেলী চেতনা-প্রবাহের প্রয়োগমূল্য পরীক্ষায় রত। সত্যেন সেন ইতিহাসের অখ্যাত অধ্যায়গুলিতেও আধুনিক বক্তব্য খুঁজে ফিরেছেন এবং অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত বিষয়কেও সাহিত্যের আঙ্গিনায় টেনে এনে মনোরম করে তুলেছেন।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে বৈপ্লবিক বা বিস্ময়কর কোনো লক্ষণ হয়তো এখনো সুচিত নয়। কিন্তু এ-সাহিত্যের ধারা যাঁরা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই একে ষষ্ঠ দশকের অবিমিশ্র জের বা সরল রূপান্তর বলেও কিছুতেই মেনে নিতে চাইবেন না। ষষ্ঠ দশকের - এমনকি, সপ্তম দশকের প্রথম দিকের—উপন্যাসগুলির সাথেও গত কয়েক বছরের উপন্যাসসাহিত্যের সম্পর্ক বস্তুতঃ বংশগতি রক্ষার মতো বলে যতোটা প্রতীত, তার চেয়ে বেশী প্রতীত কৈশোর আর যৌবনের সখ্যের মতো বলে। অন্য কথায়, এ যেন একই ব্যক্তির বয়ঃপ্রাপ্তি এক কাল থেকে আর এক কালে উত্তরণ। এমন উত্তরণ কারো স্বাধর্ম্যের বিসর্জন তো নয়ই, স্বরূপত্যাগও নয়। তবু, কালধর্মে মনে পরিবর্তন আসে, দেহেও এবং বাসে তো অবশ্যই। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেও চলে, উপন্যাসের প্রকাশ-হারও গত কয়েক বৎসরে যথেষ্ট বেড়ে গেছে।

এই সব কারণে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়মূল,- বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস অচিরেই তার দোষত্রুটি কাটিয়ে পরিণতির বনকাঙ্গ পথে অগ্রসর হবে।
[১৯৬৮। ১৯৭১]

বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য

(১৯৪৭—৭১)

বৃটীশ শাসনের অবসানে বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি নিয়ে যেদিন পৃথক্ একটি প্রদেশ গঠিত হয়, সেদিন অঞ্চলটির বর্তমানে বাংলাদেশ নামধেয় ভূখণ্ডের—জীবনপরিবেশ ছিলো, স্বাভাবিক কারণেই, দ্বিবর্ণ। এক দিকে আশায় আর সম্ভাবনায় স্বর্ণরেখ, অন্য দিকে সংশয়ে সন্দেহে ধূসর। সৃষ্টির নতুন প্রয়োজনে আর প্রেরণায় উৎসাহিত, অথচ উপকরণের অপ্রতুলতায় বিড়ম্বিত। এবং যেহেতু সাহিত্য জীবনপরিবেশেরই প্রতিরূপ, তার দ্বারা প্রভাবিত আর তারই ছায়াধার, তাই এখানকার তৎকালীন সাহিত্য আমাদের সেই বিশেষ অবস্থার স্মারক।

স্মৃতির বিশদতরো বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাবো, তখন আমাদের সাহিত্যগত তথা জাতীয় আদর্শের রূপ ছিলো অনেকটা অস্পষ্ট, সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শিক্ষা আর সংস্কৃতির লালন সংকীর্ণ এবং রুচিশীল প্রকাশনার বিবিধ বস্তুগত উপকরণ রীতিমতো দুর্লভ। বলা নিষ্প্রয়োজন, এগুলির সরল ক্রিয়ায় যেমন সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি পারস্পরিক প্রভাবের জটিল ক্রিয়ায়ও। সেসবের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে, দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখে তার কিছু আভাস দেওয়া যেতে পারে।

বস্তুগত উপকরণের অভাবে বইপত্রের চাহিদামাফিক প্রকাশনার প্রথম দিকে যে ঘাটতি দেখা দেয়, তার একটি বড়ো অংশ আমরা পূরণ করেছি পশ্চিম বাংলার বইপত্র এনে। বাংলার ও-অঞ্চলের ওপর নির্ভরতায় হয়তো আমাদের কিছুটা অনন্যোপায়তা ছিলো. কিন্তু সেই অনন্যোপায়তাকে দীর্ঘ আয়ু দানের প্রয়োজন ছিলো না। যথাকালীন

এবং অবশ্যই যথাযথ বাস্তব সহায়তা পেলে এখানকার প্রকাশনাশিল্প যে উক্ত নির্ভরতা অল্প দিনেই কাটিয়ে উঠতে পারতো, তা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে। কিন্তু আমাদের আদর্শের অস্পষ্টতা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফল, এক দিকে দেশজ প্রকাশনাশিল্পকে যথোচিত উৎসাহ দানে কিছুটা কৃপণতা, অন্য দিকে বিদেশী সাহিত্যের প্রতি অনেকটা অহেতুক উদারতা।

উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির দরুন এখানকার সাহিত্যের কোন, শাখার অগ্রগতি কতোটা বিড়ম্বিত হয়েছে, তা সঠিক বলবার মতো তথ্য আমরা কোথাও পাইনে। তবে, সহজেই অনুমেয়, শিশুসাহিত্যের ভাগে বাধা কিছু কম আসেনি। কেননা, প্রকাশনার বস্তুগত এবং কারিগরী উপকরণের প্রয়োজন বয়স্কজনপাঠ্য গ্রন্থের তুলনায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বেশী। এবং অবশ্যই ভিন্নতরোও। উদাহরণতঃ, পাঠসহায়ক চিত্রাবলী শিশুসাহিত্যে প্রায় অপরিহার্য। এই চিত্রাবলী অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক বর্ণের হয়ে থাকে। এর অর্থ ব্লকের সংখ্যা আর মুদ্রণব্যয়ের বৃদ্ধি। আর, চিত্রীর পারিশ্রমিক তো আছেই। কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ থেকে লব্ধ আয়ের পরিমাণ কম এবং সমপরিমাণ ব্যয়ে প্রকাশিত উপন্যাস এর চেয়ে অনেক বেশী মুনাফাদায়ক। এক্ষেত্রে প্রকাশনার অসুবিধার সময়ে বয়স্কজনপাঠ্য গ্রন্থাদির কাছে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের জয়ের সম্ভাবনা থাকে যতোখানি, তার চেয়ে পরাজয় ঘটবার আশঙ্কা থাকে প্রবলতরো।

সুখের বিষয়, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য কালক্রমে তার অসুবিধাগুলি অনেকাংশেই কাটিয়ে ওঠে। শিক্ষার প্রসার এবং পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বস্তুগত এবং কারিগরী উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা হ্রাস, প্রকাশকদের উৎসাহ ইত্যাদি কারণে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রকাশ তখন যথেষ্ট আশাজনক হয়ে দাঁড়ায়। নির্ভুল পরিসংখ্যান আজও এদেশে অজ্ঞাত। বিভাগোত্তর কালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা দেওয়া তাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি সরকারী সূত্র থেকে অবশ্যি আমরা জানতে পাই, এ-সময়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্রায় তেরো হাজার। কিন্তু এ-জাতীয় পরিসংখ্যানে বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থও সাহিত্য-

গ্রন্থরূপে গৃহীত। বর্তমান আলোচনায় আমাদের কাছে সংখ্যাটির গ্রহণীয়তা তাই সীমায়িত। তবে, একটি ব্যক্তিগত হিসেবে দেখা যায়, কিছু ভুলভ্রান্তির কথা বাদ দিলে, বৃটীশ শাসনের অবসানের পর থেকে মুক্তিকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাহিত্যপদবাচ্য শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় অন্ততঃপক্ষে দু' হাজার।

বলা নিষ্প্রয়োজন, অগ্রগতি কেবল সংখ্যার বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বস্তুতঃ, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং প্রকাশনার সৌষ্ঠবেও তা প্রসারিত। স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়, বিষয়ের অমিতপর্ণী বৈচিত্র্য আমাদের শিশুসাহিত্যে আজও আসেনি। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনায় লক্ষণীয়, স্বল্প পরিসরে আমরা যা পেয়েছি, তাও উপেক্ষ্য নয়। অন্য দিকে, প্রকাশনাসৌষ্ঠবেও আমাদের শিশুতোষ গ্রন্থাবলী প্রায় যে কোনো রুচিমান পাঠকের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচনা ঘটে ১৯৫৮ সালে, অধুনালুপ্ত প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান শিশুসাহিত্য ভবনের উদ্যমে এবং সাম্প্রতিকতমো সাফল্য অর্জিত ঢাকা আর চট্টগ্রামের কয়েকটি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায়।

আমাদের শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা, প্রকাশনাসৌষ্ঠব আর বিষয়গত বৈচিত্র্যের এই অগ্রগতিতে আমরা অবশ্যই আনন্দিত এবং উৎসাহিত হয়েছি। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমাদের কৌতুহল মুখ্যতঃ সৃষ্টির রূপ দর্শনে তথা তার প্রবণতাবলীর পরিবীক্ষণে। সংকীর্ণ পরিসরে এসবের সম্যক সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই, আমাদের অবলম্বন আপাততঃ কেবল অবয়বরেখা এবং লক্ষ্য তারই মাধ্যমে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সৃষ্ট শিশুসাহিত্যের শরীর-মনের কিছু রূপাভাস লাভ। এই প্রয়াসে অবলম্বিত রেখাচিত্রে আলোচিত কালকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নিয়ে। যার প্রথমটি স্বাভাবিক কারণেই সূচনার, দ্বিতীয়টি বিকাশের আর তৃতীয়টি বৈচিত্র্যায়ণের।

ওপরে আমি আমাদের শিশুসাহিত্যের অগ্রগতির যে-অংশটিকে সূচনা পর্ব বলে চিহ্নিত করেছি, তার শেষ সীমা ১৯৫৫ সাল। এ-পর্বে বাংলাদেশ—তখনকার পূর্ব পাকিস্তান—ছিলো ধর্মাশ্রয়ী ভাবনায় আচ্ছন্ন এবং কার্যতঃ জীবনের সব ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। মূল রাষ্ট্র

পাকিস্তান তখনও শিশু। তার রাজনৈতিক চেতনায় সত্তার নবলব্ধতার ঘোর। যেমন অস্তিত্বের গৌরবে, তেমনি প্রতিষ্ঠার কামনায়। অর্থনীতির বুনিয়াদ তখন তার গঠনের পথে। আর, ঐতিহ্যের সংজ্ঞা বিতর্কের শিকার। এবং তার ফলে সংস্কৃতির শাখাবলী শঙ্কায় সংশয়ে দ্বিধান্বিত। ভাষা আন্দোলন—এদেশের প্রথম বিরাট, তাৎপর্যময় জীবনবাদী চেতনার প্রকাশ—এই সময়েরই ঘটনা এবং 'চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল তার এক দোসর। তবু, ধর্মের পাণ্ডুর প্রভাব আমাদের জীবনের কোনো চেতনাকেই একেবারে মুক্ত রাখেনি। এমন পরিবেশে আর যেসব অসুবিধা দেখা দেয়, সেগুলির উল্লেখ আমি আগেই করেছি।

এতো বিড়ম্বনা পায়ে জড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ তো দূরের কথা, ব্যাপক সূচনাও সম্ভব ছিলো না। আমরা তাই দেখতে পাই, সূচনা পর্বের প্রথম দিকে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় অত্যন্ত অল্প। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের একটি হিসেব বলে, প্রথম তিন বৎসরে প্রকাশিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা ছিলো গড়ে মাত্র একশো বিয়াল্লিশ। কিন্তু পরিসংখ্যানের বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, এই একশো বিয়াল্লিশখানি গ্রন্থের অধিকাংশই আসলে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্যে রচিত। এবং যেগুলি সত্যিই শিশুপাঠ্য, সেগুলিরও একটি বড়ো অংশ বা বিশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশিত হয় প্রকাশকদের নতুন সৃষ্টির কোনো তাগিদে নয়,—সংশ্লিষ্ট লেখকদের নিজস্ব উদ্যোগে কিংবা বিভাগপূর্ব কালে পাওয়া খ্যাতির বলে অথবা বিষয়ের কারণে। প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ্য, সে-সময়ের প্রখ্যাত আর নবীন লেখকদের রচনাবলীর একটি বড়ো অংশের বিষয় ছিলো পাকিস্তানের জন্ম এবং তার সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনকথা।

স্বল্পফসল এ-পর্বের আলোচনায় আমার প্রথম লক্ষ্য ছন্দিত রচনা, যা আমাদের শিশুসাহিত্যে সব সময়ই সুলভ।

উক্ত শ্রেণীর রচনার প্রাচুর্যের কারণ তার সৃষ্টির সৌকর্য কিনা, জানিনে। তবে, বিশেষ একটি প্রবণতার আতিশয্য এর জন্যে অবশ্যই অনেকখানি দায়ী। শোনা যায় বাংলাদেশের আবহাওয়া এদেশবাসীর অনুভূতির এক প্রবল নিয়ন্তা এবং তার স্পর্শে আমাদের মানসতন্ত্রীতে

যে বেপন সঞ্চারিত হয়,—বিশেষতঃ, নির্দিষ্ট এক বয়েসে,—কাব্যের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব বড়োই উদ্দাম। কিন্তু আমরা একটি স্ববিরোধেরও শিকার। ছন্দিত রচনার চর্চায় আমরা যতোটা উৎসাহী, গ্রন্থাকারে তার প্রকাশনে ঠিক ততোটাই নিরাগ্রহ। তাই, রচনার শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়, যদিও পত্রপত্রিকায় ছন্দিত রচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, বিভাগোত্তর কালে ছড়া আর কবিতার গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে সবচেয়ে কম।

প্রকাশনার এই বিরলপ্রসূ ক্ষেত্রটির প্রথম উল্লেখযোগ্য ফসলগুলি আমরা যাঁদের হাত থেকে পেয়েছি, তাঁরা হলেন জসীমউদ্দিন আর হোসনে আরা। দুজনেই আমাদের প্রবীণতমো—এবং বিভাগপূর্ব কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত—শিশুরঞ্জক লেখকদলের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার আধুনিক কাব্যলোকে লৌকিক উপাদানের সার্থক এবং খ্যাতিমান কারবারী, জসীমউদ্দিনের কবিমানসের পূর্ণ বিকাশ বিভাগপূর্ব কালেই ঘটে। এবং সেই সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর শিশুতোষ কবিতাবলীর প্রথম সংকলন 'হাসু'। দ্বিতীয় সংকলন 'এক পয়সার বাঁশী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে কলকাতা থেকে, ১৯৪৮ সালে। পরবর্তী কালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় আরো দুটি সংস্করণ। ১৯৫১ আর ১৯৫৫ সালে। সতেরোটি ছোট-বড়ো কবিতার সংকলন 'এক পয়সার বাঁশী'-র সব রচনাই বিভাগপূর্ব কালের। জসীমউদ্দিনের বিভাগোত্তর কালের রচনাগুলি আজও সংকলিত হয়নি। একালে তাঁর রচনা অনেকাংশেই নিরুত্তাপ। এবং গদ্য এখন তাঁর কাছে অধিকতরো প্রিয়।

হোসনে আরা প্রায় সর্বাংশেই শিশুসাহিত্যিক। এবং তাঁর সৃষ্টি-ধারা প্রধানতঃ কবিতার। তাঁরও প্রথম গ্রন্থ—তিরিশটি কবিতার সংকলন —'ফুলঝুরি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে, বিভাগপূর্ব কালের রচনা নিয়ে। বাংলাদেশে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'খেয়াল-খুশী' (১৯৫১)। হোসনে আরার রচনায় আমরা যে-মনের সাক্ষাৎ পাই, চারিত্র্যের বিচারে তা বাংলা শিশুসাহিত্যে দুর্লভ নয়, কিন্তু শিশুজনের অত্যন্ত আপন। বস্তুতঃ, অনন্যসাধারণ কোনো প্রতিভার অধিকারিণী না হলেও তিনি এরই জন্যে জনপ্রিয়। এ-মন মাতৃমন। আটাশটি কবিতা আর

ছড়ার সংকলন 'খেয়াল-খুশী'-তে এই মন স্বভাবে লঘুগতি এবং উদ্ভট চরিত্র আর ঘটনার মুখাপেক্ষী। যেমন,—

…বাইরে বেগে ছুটে আসেন বড়বাবু কুণ্ডু,
রাগের চোটে চুল খাড়া হয়, ঘুরতে লাগে মুণ্ডু।
দিনে রাতে বাজিয়ে চলেন হৃদ্দ জোরে ঘণ্টা,
ছুটে এল মংলা কানাই মরিয়া ক'রে মনটা।
কুণ্ডু বাবুর মুণ্ডু তবু হলো নাকো ঠাণ্ডা,
নিজের মাথায় মারতে চাহেন আড়াই-মণি ডাণ্ডা।

ছন্দিত রচনার গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা যে-বিরলপ্রসূতা দেখি, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্যি তা নেই। বস্তুতঃ, আমাদের শিশুসাহিত্যে কথাগ্রন্থের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তবে, এই তথ্য আপাতদৃষ্টিতে যতোখানি উৎসাহজনক, আসলে তা নয়। কেননা, এক্ষেত্রের অধিকাংশ ফসলই সেই শ্রেণীর বস্তু, যা চিন্তালেশবর্জিত এবং কোনো কোনো লেখক এক দিনেও যার গোটা বই লিখে ফেলেন। 'রহস্যকাহিনী' নামে পরিচিত এই রচনাবলীর গ্রন্থসংখ্যা কথাসাহিত্যের অন্য যে কোনো শাখার গ্রন্থসংখ্যার চেয়ে বেশী। সত্যিকার সাহিত্যপদবাচ্য উপন্যাস বা গল্প-সংকলনের ব্যবসায়গত সাফল্য নাকি অনেক সময়ই এগুলির থেকে কম। আমাদের বহু প্রকাশক তাই সূচনা পর্ব থেকেই রহস্যকাহিনী প্রকাশনে অতি মাত্রায় উৎসাহী। এর ফলে রুচিশীল গল্প-উপন্যাসের প্রকাশ এ-পর্বে বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে এবং শক্তিমান আর প্রভাবশালী কথাকাররাও সব সময় প্রকাশনার বাজারে কলকে পাননি।

কবিতার আসরে যেমন, তেমনি কথাসাহিত্যের আসরেও গ্রন্থ নিয়ে প্রথম আবির্ভূত হন সেই সব লেখক, যাঁরা বিভাগপূর্ব কাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত। অথবা যাঁরা নিজস্ব প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের বলে বলীয়ান। তাই দেখতে পাই, সূচনা পর্বে স্মরণীয় কথাগ্রন্থের সংখ্যাও ছিলো অল্প। এ-সময়ে উপন্যাস প্রকাশিত হয়, সব শ্রেণী মিলিয়ে, তিরিশের কিছু বেশী এবং সাধারণ গল্প আর রূপকথার সংকলন প্রায় তিরিশখানি। এগুলির মধ্যে উপন্যাস হিসেবে তখন সমাদর পেয়েছে মাত্র পাঁচখানি

গ্রন্থ। মঈনুদ্দীনের 'ডাঃ শফিকের মোটর বোট' (১৯৪৯), নন্দিতা আনোয়ারের 'ডাঃ শামীমের আবিষ্কার' (১৯৫৩), শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'সবাই যাকে করল হেলা' (১৯৫৪), আহসান হাবীবের 'রাণীখালের সাঁকো' (১৯৫৫?) আর মবিনউদ্দীন আহমদের 'কুদরত খাঁর ভিটে' (১৯৫৫)। উল্লেখযোগ্য, এই উপন্যাসগুলির তিনখানির কাহিনীই আদর্শবাদী এবং শেষ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণতঃই রহস্য-উপন্যাস। আহসান হাবীবের উপন্যাসখানি পরবর্তী কালে (১৯৬৫) পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানির ভাষা অনাড়ম্বর, কিন্তু অকপটভাবে বিষয়নিষ্ঠ। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এর ভাষার নমুনা,—

> …ন'বছর বয়সে আজীজের হাতে খড়ি হলো, কিন্তু হাসাহাসি হলোনা সে ব্যাপার নিয়ে। গাঁয়েগেরামে এমনি হয়; বারো বছর বয়সেও শুরু হয় লেখাপড়া। স্কুলের প্রায় সব ছেলেরই বয়স বেশী, আর আশ্চর্য কথা, প্রেসিডেন্টের ছেলে জয়নালেরও ঐ একই অবস্থা। তার ওপর বাপের স্কুল নাহলে তার আবার এক এক ক্লাশে বছর দুই করে থাকতেও হতো।…

সূচনা পর্বে আমরা পাঠযোগ্য গল্প-সংকলন পেয়েছি উপন্যাসের থেকে কিছু বেশী। এগুলির মধ্যে ছিলো মনোরম গুহঠাকুরতার 'আবু হোসেন' (১৯৪৮), 'নাবিক সিন্দাবাদ' (১৯৪৮), আর 'বনে জঙ্গলে' (১৯৪৯), ইব্রাহীম খাঁর 'ব্যাঘ্র মামা' (১৯৫১), 'শিয়াল পণ্ডিত' (১৯৫২) আর 'গুলবাগিচা' (১৯৫৩), সুশীল ঘোষের 'কসমস' (১৯৫২), গোলাম রহমানের 'রকম-ফের' (১৯৫৩) এবং সৈয়দ আবদুল মান্নানের 'এক যে ছিল সওদাগর' (১৯৫৩), 'আরব্য রজনী' (১৯৫৫) আর 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (১৯৫৫)। এসব গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই স্বদেশী বা বিদেশী গল্পের পুনর্বর্ণন। মৌলিক গল্পের সংকলন হিসেবে স্মরণীয় কেবল 'রকম-ফের'। পরবর্তী কালে হাস্যরসিক লেখকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, গোলাম রহমানের প্রতিভার কিছু প্রতিশ্রুতি এ-গ্রন্থে ধরা পড়েছিলো।

বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে কোথাও যদি বেদনাদায়কভাবে দৈন্য প্রকট হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে নাটকে। আমার একটি হিসেব থেকে দেখতে পাই, বিভাগোত্তরকালে এদেশে শিশুতোষ নাটক আত্মপ্রকাশ

করে প্রায় আশীখানি। এবং এগুলির মধ্যে অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দোখানি প্রকাশিত হয় সূচনা পর্বে। কিন্তু এ-পর্বে আমরা সার্থক—অর্থাৎ যথার্থই রসোত্তীর্ণ, শিশু পাঠকের উপযোগী এবং মঞ্চায়নের যোগ্য—গ্রন্থ পেয়েছি কার্যতঃ মাত্র একখানি।

সূচনা পর্বের প্রথম দিকে, ১৯৫০ সালের আগে, বাংলাদেশ থেকে সম্ভবতঃ কোনো শিশুতোষ নাটকই প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫০ সালে যে-কয়খানি নাটক আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলিকেই আমাদের নাটক রচনার আদিতমো প্রয়াসের ফল বলে ধরে নিতে পারি। এ-বৎসরে নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তিনখানি,—ইব্রাহীম খাঁর নাটিকা-সংকলন 'ভিস্তী বাদশা' আর 'নিজাম ডাকাত' এবং এ. এইচ. এম. বসিরউদ্দিনের 'বিচিত্রানুষ্ঠান'। ইব্রাহীম খাঁর প্রায় সব নাটিকাই ইতিহাস-আশ্রয়ী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সূচনা পর্বে পরবর্তী কালে আমরা আরো পাঁচখানি ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটক পেয়েছি। এবং সেগুলির সবই পূর্ণাঙ্গ নাটক। এ-পর্বের বাকী নাটক-নাটিকার অধিকাংশই সামাজিক। যাদের প্রবীণতমো অগ্রজ 'বিচিত্রানুষ্ঠান'। কিন্তু সাহিত্যের কোনো সুস্থ আলোচনায়ই একমাত্র ইতিহাস রক্ষার কারণ ছাড়া এ-গ্রন্থের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য মহাত্মা আলী হজরত পূণ্যাত্মা কায়েদে আজম মৌলানা মোহাম্মদ আলী জিন্না (বার এট-ল) মরহুম মগফুর সাহেবের অমর স্মৃতিতে অর্ঘ্য স্বরূপ উৎসর্গীকৃত 'নির্দিষ্ট নায়িকাবিহীন আবৃত্তিমূলক একাঙ্ক নাটিকা' এই 'বিচিত্রানুষ্ঠান' না পড়লে কারো পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়, নাটকের নামে প্রলাপও মুদ্রিত হয়। ১৯৫৪ সালে 'সংশোধন' নামে এ. এইচ. এম. বসিরউদ্দিনের আরো একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক প্রবণতা আর কিছু একদেশদর্শী ধারণায় দুষ্ট, এগ্রন্থও কম দুঃসহ নয়।

অন্যান্য সামাজিক নাটকের মধ্যে উল্যেখযোগ্য আবদুল জব্বার খাঁর আদর্শবাদী রচনা 'প্রতিজ্ঞা' (১৯৫৫, ১৯৬২) এবং শওকত ওসমানের 'এতিমখানা' (১৯৫৫,১৯৬৩)। 'প্রতিজ্ঞা'-র কাহিনীর বুনিয়াদ কয়েকটি সুবোধ এবং দুষ্টস্বভাব ছাত্রের কার্যকলাপ। এর অতিমুখর প্রচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনীকে বিপর্যস্ত করেছে। 'এতিমখানা' সূচনা পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

এটি গতিময়, সুপাঠ্য রচনা এবং বাংলাদেশের দুর্লভ সীরিয়াস নাট্য-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতমো সৃষ্টি। 'এতিমখানা'-র মূল সুর ব্যঙ্গের। কিন্তু তা সর্বত্রই ফল্গুধারার মতো। স্পষ্ট কেবল শেষ দৃশ্যে, যেখানে নায়কের অতিমুখরতায় তা বস্তুতঃ নীরসতায় অবসিত,—এমনকি, ক্লাইম্যাক্সের প্রখরতা সত্ত্বেও। নাটকের কাহিনী নির্মিত হয়েছে যুদ্ধকালে বিমানবন্দরে বোমাপতনে নিহত এক কুলি-সন্তানকে নিয়ে,—যে পিতার মৃত্যুর পর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে এতিমখানায় গিয়ে ওঠে। এ-কাহিনী শেষ পর্যন্ত যে-বক্তব্যে পৌঁছয়, শ'র একটি উক্তি ঈষৎ বিকৃত করে তাকে বলা যেতে পারে,—'All charitable organizationa exist by sellnig themselves to the rich.' 'এতিমখানা'-র জিজ্ঞাসামুখর সংলাপের নমুনা,—

সলিম। দুনিয়ায় কেন এমন হয়? কারো বাপ-মা নেই, কারো বাপ-মা গরীব, তাই বলে ছেলেরা এত কষ্ট পাবে কেন ছেলে-বয়সে? (প্রায় চীৎকারে) ছেলেরা কেন এত কষ্ট পাবে?

মুনীর। আমিও ক'দিন থেকে তা-ই ভাবি। ছেলেরা কি অপরাধ করেছে, ছেলেদের উপর এত জুলুম?

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য বিরলপ্রসূ হয়তো নয়, কিন্তু বৈচিত্র্যে ঈষৎ দীন। এখানকার শিশুতোষ প্রবন্ধসাহিত্য জীবনী-প্রধান। এর গ্রন্থাবলীর শতকরা প্রায় আশী ভাগ জীবনী। এবং স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই এখানে আলোচিত হয়েছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, দু'চারখানি ছাড়া কোনো জীবনীগ্রন্থই পাঠকের মনে তেমন দাগ কাটে না। শিশুতোষ প্রবন্ধে রচনাশৈলীর উৎকর্ষ অন্যবিধ রচনায় বেশ কিছুটা লক্ষণীয়। এই রচনাগুলির কয়েকটি বিজ্ঞানবিষয়ক।

সূচনা পর্বে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, আমার হিসেবে, প্রায় নব্বুই-খানি এবং বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ তিনখানি। এ-সময়ের জীবনীসাহিত্য এক অনুদার মনোভাবে ক্লিষ্ট। জীবনীকাররা মুসলিম বা পাকিস্তানী বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কোনো মহাপুরুষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। অমুসলিম মহাপুরুষের জীবনীগ্রন্থ আমি পেয়েছি মাত্র একখানি। তখনকার

সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তি জিন্না। তিনি হজরত মোহাম্মদকেও হার মানান। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর সংখ্যাই এক ডজনের ওপর। এছাড়া বেশ কয়েকখানি জীবনী-সংকলনেও তিনি আলোচিত। কিন্তু হজরত মোহাম্মদের জীবনী প্রকাশিত হয় নয়খানি। এসবের অর্থ, ধর্মজীবী রাষ্ট্র পাকিস্তানে রাজনীতি তখন ধর্মের নামান্তর। একথার প্রমাণ আমরা পাই আরো কিছু তথ্য থেকে। জিন্নাজীবনীর কথা বাদ দিলে, সূচনা পর্বে পাকিস্তানী রাজনীতিকদের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্রায় এক ডজন। এবং ইকবালের জীবনী ছিলো চারিখানি। অন্যান্য মহাপুরুষের মধ্যে ভাগ্যবান কেবল হজরত ওমর আর নজরুল। প্রথমজনের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তিনখানি এবং দ্বিতীয়জনের দুইখানি। সে-সময়ের জীবনীকারদের মনোভাবের আর এক পরিচায়ক রাজনীতির কারণে খ্যাত বিদেশী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিরল আলোচনা। সংক্ষেপতঃ, সূচনা পর্বের জীবনীসাহিত্য ছিলো প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সাময়িকতার ফসল। অন্য কথায়, এ-সাহিত্যে জীবনবোধের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে ভক্তি, যা কদাচিৎ সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ভক্তির আতিশয্যই সূচনা পর্বে অন্যান্য সাহিত্যের চেয়ে প্রবন্ধসাহিত্যের অগ্রসরতার কারণ এবং প্রবন্ধসাহিত্যে জীবনীপ্রাধান্যের হেতু। অথচ একটি কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। বাংলা শিশুসাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান অবিস্মরণীয়। এ-সাহিত্যের সূচনায় বিজ্ঞান ছিলো তার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বাংলাদেশে প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় দেশবিভাগের প্রায় সাত বৎসর পরে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানির নাম 'যারা উড়তে শেখাল', লেখক মোহাম্মদ আবু হেনা। এবং এর পর আমরা বিজ্ঞানগ্রন্থ পেয়েছি মাত্র দুখানি,—আবদুল্লাহ্ আল-মুতীর 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' (১৯৫৫) আর 'অবাক পৃথিবী' (১৯৫৫)। প্রথম গ্রন্থখানি হাতে নিলে যে জিনিসটি আমাদের চোখে পড়ে সেটি হল আলোচিত বিষয় সম্পর্কে লেখকের অধ্যয়নের ব্যাপকতা এবং জ্ঞানের গভীরতা। এবং এসবের সাথে হাত মিলিয়েছে অধীত বিষয় পরিবেশনের নৈপুণ্য। সরস গল্পের মুক্তাপ্রতিম দানা গ্রন্থখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। তবে, প্রাকৃতজনবোধ্য

বিজ্ঞানসাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে তার প্রধান এবং একমাত্র নিষ্ঠাবান লেখক আবদুল্লাহ্ আল-মুতী। তিনি সত্যিকার সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এক স্বচ্ছ, জীবনবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাবলী তাই শুধু তত্ত্ব বা তথ্যের বিবৃতি নয়, সরস এক-একটি কাহিনী। আবদুল্লাহ্ আল-মুতীর গ্রন্থ দুখানি আমাদের পরিচিত কিছু পদার্থ আর প্রাকৃতিক ব্যাপার নিয়ে লেখা কতকগুলি প্রবন্ধের সংকলন। তাঁর রচনাশক্তির পরিচয় প্রথম গ্রন্থেও বিধৃত রয়েছে। এ-গ্রন্থে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা,—

> ...এসো, আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল জ্বালি। কেননা যেখানেই আমরা এই মশাল জ্বালি না কেন, আর আজ তা যত ছোটই হোক, আমরা তো জানি এই মশাল একদিন জ্বলে উঠবে দেশের দিকে দিকে; তার উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়বে কছির শেখের মতো আমার দেশের হাজার হাজার, লাখ লাখ ভাই-বোনের চোখে—আর তাদের চোখের অন্ধকার, মনের অন্ধকার যাবে কেটে।...

সূচনা পর্বে প্রকাশিত অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য এবং রচনা আলোচনার অযোগ্য।

বিদেশী রচনার অনুবাদ আর পুনর্বর্ণনা সূচনা পর্বে ছিলো একান্তই অনুল্লেখ্য। এ-প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এ-সময়ে অনুবাদগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে মাত্র পাঁচখানি এবং সবগুলিরই প্রকাশকাল ১৯৫৫ সাল। এগুলির মধ্যে দুখানির অনুবাদক শামসুল হক এবং দুখানির সিরাজউদ্দীন হোসেন। বাকী গ্রন্থখানি মেরী হল এট্‌সের উপন্যাস 'ইন দ্য ফরেস্ট'। অনুবাদ করেন নূরজাহান খানম, 'বনে জঙ্গলে' নাম দিয়ে। কোনো গ্রন্থের অনুবাদেই অনুবাদকদের নিজস্ব উদ্যোগ ছিলো না। গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রচারমূলক উদ্যোগে। পুনর্বর্ণিত কাহিনীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সাইলাস মারনার', 'কিডন্যাপড,' আর 'গ্রেট এক্সপেকটেশন'। তিনখানি গ্রন্থেরই পুনর্বর্ণক কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ এবং তিনখানিই প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে।

ওপরে আমরা দেখেছি, একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ ছাড়া আর কোনো ধরনের গ্রন্থ প্রকাশনে সূচনা পর্বে আমাদের বিশেষ উৎসাহ ছিলো না এবং প্রবন্ধগ্রন্থেও আমাদের বিষয়গত বৈচিত্র্য ছিলো একান্তই দুর্লভ। এসবের অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, এ-পর্বে শিশুসাহিত্যের চর্চা বা বিষয়গত বৈচিত্র্য উক্ত রূপেই সীমায়িত থেকেছে। বরং দেখা যায়, সূচনা পর্বে শিশুসাহিত্যের একটি বাহন তার বিকাশের বুনিয়াদ স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই বাহনটির নাম শিশুতোষ পত্রিকা।

বাংলাদেশে প্রথম শিশুপত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। কিন্তু পত্রিকার মাধ্যমে শিশুসাহিত্যচর্চার আয়োজন এর আগেও ছিলো। সে-আয়োজনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালের পঁচিশে ডিসেম্বরে প্রকাশিত পাক্ষিক 'মুকুল'-এ। যার পরিচালনায় ছিলেন খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক মোহাম্মদ মোদাব্বের আর হোসনে আরা এবং প্রথম সম্পাদক আবদুল্লাহ্ আল-মুতী। পত্রিকাখানির আত্মপ্রকাশ ঘটে মুকুল আন্দোলন তথা মুকুল ফৌজের মুখপত্র রূপে। কিন্তু এরই একটি নির্দিষ্ট বিভাগে এদেশের নবীন-প্রবীণ লেখকরা তাঁদের শিশুতোষ রচনা প্রকাশের প্রথম সুযোগ পান। এদিক থেকে বিচার করলে নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে, পাক্ষিক 'মুকুল' এদেশের শিশুপত্রিকার জগতে পথিকৃৎ। প্রায় সতেরো বৎসর চলবার পর পত্রিকা খানি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে পূর্ণাঙ্গ শিশুমাসিক রূপে তার পুনঃপ্রকাশ ঘটে।

এদেশে সম্পূর্ণতঃই শিশুতোষণে নিয়োজিত প্রথম পত্রিকা 'ঝংকার'-এর আবির্ভাব ঘটে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন মঈদ-উর-রহমান এবং পরিচালক মিজানুর রহমান। সে-সময়ের নানাবিধ অসুবিধার মধ্যেও সম্পাদক-পরিচালক 'ঝঙ্কার'-কে শিশুলোভন করবার চেষ্টায় বিশেষ কোনো ত্রুটি রাখেননি। তা সত্ত্বেও কয়েক মাস চলবার পরই পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়।

'ঝংকার'-এর পর সূচনা পর্বে বাংলাদেশ থেকে দশখানি শিশুপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে আটখানি মাসিক এবং দুখানি পাক্ষিক। এই পত্রিকাগুলির অধিকাংশই ছিলো স্বল্পায়ু,—একখানি মাসিক এবং দুইখানি পাক্ষিক ছাড়া আর কোনো পত্রিকাই বৎসরের সীমা পেরুতে

পারেনি। আটখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে : বেগম ফওজিয়া সামাদ-সম্পাদিত 'মিনার' (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৪৯), আরেফ আলী-সম্পাদিত 'দ্যুতি' (আগস্ট,১৯৪৯), ফয়েজ আহমদ-সম্পাদিত 'হুল্লোড়' (আগস্ট,১৯৫০), তৈয়েবুর রহমান-সম্পাদিত 'সবুজ নিশান' (এপ্রিল-মে, ১৯৫১), আবদুল ওয়াহেদ-সম্পাদিত 'আলাপনী' (আগস্ট, ১৯৫৪), সরদার জয়েনউদদিন-সম্পাদিত পাক্ষিক 'সিতারা' (১লা মার্চ, ১৯৫৫) আর পাক্ষিক 'শাহীন' (৭ই মার্চ, ১৯৫৫) এবং বেগম জেব-উন-নিসা আহমদ-সম্পাদিত 'খেলাঘর' (জুন-জুলাই, ১৯৫৫)। রচনার স্বাদুতায়, সম্পাদনার নিপুণতায় এবং অঙ্গের সৌষ্ঠবে 'হুল্লোড়' ছিলো ষষ্ঠ দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশুপত্রিকা। পরবর্তী কালেও তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার গৌরব খুব কম পত্রিকাই অর্জন করেছে। 'সিতারা' কেবল বাংলাদেশের প্রথম শিশুপাক্ষিকই নয় প্রথম সত্যিকার শিশুপত্রিকাও বটে। রচনাগুলি দেখে মনে হয়, এর পাঠকদের বয়ঃসীমা ছিলো ছয় থেকে নয় বৎসর। যতোদূর জানি, এতো অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকাদের জন্যে বাংলাদেশে আর কোনো শিশুপত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। 'সিতারা'—এবং 'শাহীন'-ও—ছিলো সম্পূর্ণতঃ রঙীন কালিতে মুদ্রিত। এক্ষেত্রেও 'সিতারা' পথিকৃৎ। 'শাহীন' এবং 'সিতারা' প্রকাশিত হয় প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে।

বাংলাদেশে মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম শিশুপত্রিকা হাবিবুর রহমান এবং মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান-সম্পাদিত মাসিক 'প্রতিভা' এবং দ্বিতীয় শিশুপত্রিকা মনিরুল হুদা আর মোশারফ হোসেন-সম্পাদিত 'বিদ্যুৎ'। 'প্রতিভা' প্রকাশিত হয় কিশোরগঞ্জ থেকে, ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে, মাত্র পাঁচটি সংখ্যার আয়ু নিয়ে। 'বিদ্যুৎ'-এর জন্মভূমি বাগেরহাট, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩ সালের জুন-জুলাইতে। এর আয়ু ছিলো তিন সংখ্যা।

পত্রপত্রিকার বেলায় যা-ই হোক, সূচনা পর্বে শিশুসাহিত্য-সংকলনের দিকে কেউ বিশেষ দৃষ্টি দেননি। হয়তো এই কারণে যে, সংকলন প্রকাশন এমনিতেই ব্যয়বহুল, অধিকন্তু সে-সময়ে শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশনের অন্যবিধ অসুবিধাও ছিলো অনেক। সূচনা পর্বে আমরা সংকলন পাই তাই মাত্র তিনখানি, নূরুল ইসলাম কাব্যবিনোদ-সম্পাদিত আর রংপুর থেকে প্রকাশিত 'কাব্য-মুকুল (১৯৫১), আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'সবুজ নিশান'

(১৯৫৫) এবং বেগম জেব-উন-নিসা আহমদ-সম্পাদিত আর ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'খেলাঘর' (১৯৫৫)। দুঃখের বিষয়, কোনোখানিই পাঠকদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বাংলাদেশের প্রথম 'কিশোর কবিতা-সংকলন' বলে বিজ্ঞাপিত, 'কাব্য-মুকুল'-এর রচনাগুলি ছিলো কার্যতঃ কুনির্বাচিত। এবং 'খেলাঘর' মাত্র অংশতঃ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের দিগ্‌দর্শায়ক। 'পাকিস্তানী শিশুদের জাতীয় কবিতা সঞ্চয়ন' বলে অভিহিত এবং তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত 'সবুজ নিশান' ছিলো ছড়া, কবিতা আর গানের সুনির্বাচিত সংকলন।

সূচনা পর্বের এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সম্মুখে আমরা বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যের পরবর্তী যে-অংশটি দেখতে পাই, আমি তারই নাম দিয়েছি বিকাশ পর্ব। এ-পর্বের আয়ুষ্কাল মোটামুটি হিসেবে পাঁচ বৎসর,—১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল। আমাদের ইতিহাসের এই সময়টিতে সমাজ, রাজনীতি বা অর্থনীতিতে তেমন কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি। বরং সূচনা পর্বের রাজনীতির অস্থিরতার জের এ-পর্বের প্রথম দিকেও দেখা গেছে এবং শেষ দিকে তা উগ্র সামরিক শাসনের রূপ নিয়েছে। মাঝখানে যে রাজনীতির অস্থিরতা একেবারেই ছিলো না, তা নয়। কিন্তু গণতন্ত্রের রূপাভাস তখন অনেকটা আশান্বিত। এবং অর্থনীতির স্থিতিশীলতা তথা আর্থনীতিক অগ্রগতি কিছুটা পরিলক্ষিত। এসবের প্রভাব আমাদের সে-সময়কার শিশুসাহিত্যে স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয়। বিকাশ পর্বের প্রথম দু'বছরে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের সংখ্যা সূচনা পর্বের শেষ বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর থেকে কম। তারপর আবার কিছু বৃদ্ধি। চতুর্থ বৎসরে আগেকার সব রেকর্ড ভঙ্গ এবং শেষে আবার কিছু অবনতি। এবং যেহেতু পটভূমির তেমন কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি তাই সাংস্কৃতিক চেতনাও এ-পর্বে ছিলো মোটামুটি হিসেবে সরল আত্মবিকাশেই তৎপর আর শিশুসাহিত্যের অগ্রগতি প্রায় সর্বাংশেই সংখ্যাগত উন্নতিতে সীমাবদ্ধ।

সৃষ্টির সংখ্যাগত হিসেবে এ-পর্বে আমরা কবিতাগ্রন্থ পাই মাত্র সাতখানি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি বৃটিশ যুগের কোনো লেখকের কিছু শিশুতোষ কবিতার মরণোত্তর সংকলন এবং একখানি চরিত্রে প্রচারবাদী। বাকী

গ্রন্থগুলি হল ফয়েজ আহমদের 'জোনাকী' (১৯৫৮), সুজাত আলীর 'চাঁদের হাট' (১৯৫৮), হোসনে আরার 'হললা' (১৯৫৯), ইসমাইল হোসেনের 'খোকার আবদার' (১৯৬০) আর আশরাফ সিদ্দিকীর 'কাগজের নৌকা' (১৯৬০)। প্রথম এবং শেষ গ্রন্থকার বিকাশ পর্বে ছিলেন তরুণ। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থ দুখানি রচনা হিসেবে রসোত্তীর্ণ এবং আজও এদেশে বহুপঠিত।

রচনার পরিমাণের দিক থেকে—এবং জনপ্রিয়তায়ও—ফয়েজ আহমদ এদেশের শিশুসাহিত্যিক দলের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি প্রায় সর্বাংশেই শিশুসাহিত্যিক, যেমনটি বাংলাদেশে দুর্লভ এবং মুখ্যতঃ কবিতাকার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষায় আর রচনারীতিতে তিনি কিছুটা অনাধুনিক। বিষয়ের পরীক্ষানিরীক্ষায়ও তিনি তেমন উৎসাহী নন। তাঁর রচনাবলী প্রায় সম্পূর্ণতঃই হাস্যরসের এবং তাদের প্রধান উপজীব্য মানুষ আর পশুপাখীর নানাবিধ উদ্ভট আচরণ (যা তাঁর পূর্বজ অনেক শিশুসাহিত্যিকেরও প্রিয় বিষয়) এবং কল্পিত আঙ্গিক বিকৃতি, দৈর্ঘ্য বা বিস্তার। কিন্তু তাঁর সব রচনাই এক সহজ শিশুরঞ্জক লালিত্যে উজ্জ্বল। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'জোনাকী' আটাশটি ছোটো-বড়ো রচনার সংকলন। এ-গ্রন্থ তাঁর বিষয়ের দুটি শ্রেণীর এক স্মরণীয় মিলনভূমি। প্রমাণ, এর প্রথম রচনা 'উড়ে বক,'—

> কোথা থেকে বক এল এক
> উড়ে,
> কেউ বলে সে পাঞ্জাবী বা,
> কেউ বলে সে উড়ে।
> আসাম থেকে বাঁশ এনেছে সাথে,
> লম্বা গলা বাড়িয়ে রেখে তাতে
> মেঘনা নদীর কুমীর খোঁজে দূরে
> কোথা থেকে বক এল এক উড়ে।

আশরাফ সিদ্দিকীর 'কাগজের নৌকা' পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে রচিত তেরোটি দীর্ঘ কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি বিষয়ে এবং মানস প্রবণতায় বহুবিচিত্র। এ-গ্রন্থে শান্ত বাৎসল্য রসের ধারা আর

এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মনের কল্পনাবিস্তার যেমন আছে, তেমনি রয়েছে শিক্ষামূলক মানবতাবাদী অনুভাবন এবং আরো নানা ভাবের অনুকণা। একদা ছন্দের বিক্রীড়নে আর শব্দের ব্যঞ্জনায় চমক সৃষ্টির যে প্রয়াস আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতায় দেখা গিয়েছিলো, তার স্বাক্ষরও গ্রন্থখানির অনেক কবিতায়ই বিধৃত হয়।

কবিতার ক্ষেত্রে বিকাশ পর্বে আমরা যে-অচলাবস্থা দেখি, কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা নেই। বস্তুতঃ, সূচনা পর্বের মতো এ-পর্বেও কথাসাহিত্য ছন্দিত সাহিত্যকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। কেবল সংখ্যায় নয়, গুণগত দিক থেকেও। এই অগ্রগতির জন্যে বিকাশ পর্বের কথাসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে যেমন ঋণী, তেমনি নবীন-প্রবীণ লেখকদের কাছেও। এ-পর্বে বেশ কিছু নবীন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই লেখকদের মধ্যে সব চেয়ে ভূরিপ্রসূ লেখনী আবু কামরুল নাহারের। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তাঁর অন্ততঃপক্ষে আঠারোখানি গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যে আর কোনো লেখক আজ অবধি এতো গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আবু কামরুল নাহারের রচনাবলীর নাম কেবল ইতিহাসকারের কাছেই পরিচিত। কারণ সহজেই অনুমেয়।

বিকাশ পর্বে আমরা উপন্যাস পাই একশো পঁচিশখানি। বলা বাহুল্য, এমনিতে এ-সংখ্যা যতো উৎসাহনজকই হোক না কেন, ঝাঁপিতে তুলে রাখার মতো ফসল এগুলির ভেতর বেশী ছিলো না। এ-সময়ের অধিকাংশ উপন্যাসই-রহস্য উপন্যাস—সংখ্যা যাদের একশোর ওপর। বাকী যে-রচনাগুলি সত্যিই সাহিত্যপদবাচ্য, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'ডানপিটে শওকত' (১৯৫৮), শওকত ওসমানের 'তারা দুইজন' (১৯৫৮), মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের 'জয়যাত্রা' (১৯৫৯) আর মঈনুদ্দীনের 'স্বপন দেখি' (১৯৫৯)। সব উপন্যাসই কম বেশী আদর্শবাদী। বিশেষ করে, 'স্বপন দেখি'।

এ-পর্বে নজরুল হক তিনখানি বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস প্রকাশ করেন. 'শুক্রগ্রহে অভিযান' (১৯৫৭) চাঁদের দেশে একদিন' (১৯৫৯) আর 'মঙ্গল গ্রহের মানুষ'।

বিকাশ পর্বের কথাসাহিত্যে উপন্যাসের থেকে ছোটো গল্প অনেক বেশী অগ্রসর। সুচনা পর্বে যা ছিলো প্রায় কল্পনার অতীত। বিকাশ পর্বে আমরা ছোটো গল্পের সংকলন পাই প্রায় আশীখানি। ছোটো গল্প সংকলনের এই সংখ্যাগত অগ্রগতির সাথে আরো একটি কথা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। এ-পর্বে আমাদের শিশুতোষ গল্পে বিষয়গত বৈচিত্র্যেরও বিকাশ ঘটেছে। রচনাগুলির মধ্যে হাস্যরসের কাহিনী যেমন আছে, তেমনি আছে ইতিহাস, অভিযান, রূপকথা ইত্যাদি ধরনের কাহিনীও। সুচনা পর্বে এমন বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পাইনি। দ্বিতীয়তঃ, বিকাশ পর্বে আমাদের কথাকাররা স্বদেশী বা বিদেশী কাহিনীর পুনর্বর্ণনের চেয়ে মৌলিক রচনার ব্যাপারে অনেক বেশী উৎসাহী। এবং এ-ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণের উৎসাহে কোনো পার্থক্য নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন, এমন সৃজনশীল উৎসাহ যে কোনো সাহিত্যের জন্যেই মঙ্গলজনক এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশের শিশুতোষ কথাসাহিত্যে যে অগ্রগতি ঘটে, তার জন্যে অনেকাংশেই দায়ী আমাদের কথাকারদের বিকাশ পর্বকালীন এই সক্রিয়তা।

এ-সময়ের রচনাবলীর একটি বড়ো অংশের উপজীব্য হাস্যরস। এই রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাজেদুল করিমের 'চিংড়ি ফড়িং-এর জন্ম-দিনে' (১৯৫৬), গোলাম রহমানের 'বাড়ী নিয়ে বাড়াবাড়ি,' 'বুদ্ধির ঢেঁকি' আর 'পানুর পাঠাগার' (১৯৫৯) এবং নমিতা আনোয়ারের 'বারোয়ারী' (১৯৬০)। গোলাম রহমান সুচনা পর্ব থেকেই হাস্যরসিক গল্পকার হিসেবে ছিলেন সুপরিচিত। বিকাশ পর্বের রচনাগুলি তাঁর খ্যাতি আরো বৃদ্ধি করে। তিনি প্রায় সামন্ততঃই মানুষের– বিশেষতঃ, ছোটদের— উদ্ভট আচরণের নিপুণ কারবারী। ভাষায় তথা রচনাভঙ্গিতে তিনি একেবারেই আটপৌরে। কিন্তু এই আটপৌরে কৌশলেই উদ্ভাবিত ঘটনাবলীর নাটকীয়তাকে লোভনীয় করে তুলেছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সাজেদুল করিম। সুরসিক এই লেখকের লেখনীও ভুরিপ্রসু। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তাঁর খুব অল্প রচনাই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। দশটি সার্থক গল্পের সংকলন 'চিংড়ি ফড়িং-এর জন্ম-দিনে'-র অন্তর্ভুক্ত 'জ্যামিতি কসে লিচু খাও' শীর্ষক গল্পটি থেকে তাঁর রচনাভঙ্গির একটুখানি নমুনা দিই,—

…আম-কাঁঠালের গন্ধ যখন পেয়েছি, আর কী থাকা যায়? সোজা চলে এলুম মামা-বাড়ী। শনিবার বিকাল চারটায় টিকেট কেটে চাপলুম গাড়ী, আর ভোর না হতেই মামা-বাড়ীর ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে মাইল সাতেক পায়ে-হাঁটা পথ। তার-পরেই মামা-বাড়ীর বিরাট ফটক। আমাকে দেখে টুটুল, পুতুল তারা দৌড়ে এলো।…

কথাসাহিত্যে যাকে বলা চলে সীরিয়াস রচনা,—যা কোনো নীতি বা আদর্শের অনুসারী এবং বক্তব্যে ঋদ্ধ,—তাও আমরা বিকাশ পর্বে বেশ কিছু পেয়েছি। যেমন, শওকত ওসমানের 'ডিগ্‌বাজী' (১৯৫৭), মেহ্‌রাবের 'ঈমানের জোর' (১৯৫৭), হাফিজা খাতুনের 'নীতি ও কাহিনী' (১৯৫৭), রাজিয়া মাহ্‌বুবের 'ছোটদের গল্প' (১৯৫৮) ইত্যাদি। কাহিনীতে নীতি বা আদর্শের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব কেবল ঘটনার দেহে তার সার্বিক সংক্রামণে। এমন সংক্রামণ, বলা নিষ্প্রয়োজন, কখনো সহজ-সাধ্য নয়। ঈষৎ অমনোযোগের সুযোগেও তা প্রচারকের নির্বসন ভূমিকায় নেমে পড়তে পারে। এবং অবশ্যই কাহিনীর আততায়ীর ভূমিকায়ও। এসবের দ্বারা কবলিত কাহিনীর অভাবও বিকাশ পর্বে ছিলো না। কিন্তু, সুখের বিষয়, এ-সময়ে আমাদের অন্ততঃপক্ষে দুজন কথাকার—শওকত ওসমান আর রাজিয়া মাহ্‌বুব—কুশলী মাঝির মতোই গল্পকে নীতি আর আদর্শের পাটনে তীর্ণ করে দিয়েছেন।

রাজিয়া মাহ্‌বুবের গ্রন্থখানি আটটি ক্ষীণকায় গল্পের সংকলন। তাঁর সব কটি গল্পই নীতিমূলক। এবং লক্ষ্য তাদের কচি বয়েসের ছেলেমেয়ে। এই সব কুশীলব নিয়ে তিনি যে আসর বসান, তার কাহিনীমালায় ঘটনার সরলতা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। শওকত ওসমানের লক্ষ্যও অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে। কিন্তু তাঁর সব কুশীলব মানুষ নয়। তাঁর গল্পগুলিও ঘটনায় সরল। তবে, ভাষার দক্ষ কারিগর শওকত ওসমান সরল বিষয়েও উপভোগ্য রস সঞ্চারণের ক্ষমতা রাখেন। প্রমাণ, 'জুলুম' শীর্ষক একটি গল্পের সূচনা-ভাগ,—

উপদেশ আমি মোটে সহ্য করতে পারি না। পয়সা খরচ হয় না ত আর উপদেশ দিতে। যীশুখৃষ্ট শুধু উপদেশ দান করেন নি,

প্রাণও দান করেছিলেন। দানের সঙ্গে প্রাণের যোগ চাই, কিন্তু তেমন দৈবাৎ ঘটে। তাই ছেলে বেলা থেকেই মুরুব্বীদের উপর আমার ভারী রাগ, খালি উপদেশ আর উপদেশ। অমুক কর, তমুক কর। স্কুলে যা, জোরে হাঁটিসনি, গাড়ী ঘোড়া দেখে চল, হাঁচি পড়লে কড়ে আঙুল নাকের ডগায় নিয়ে যা, সাপ দেখলে কুল্‌হু আল্লা পড়। বাপস। উপদেশের ঠেলায় জান্‌ ঝালাপালা।...

বিকাশ পর্বের কথাসাহিত্যে বিষয়ের শ্রেণীগত দিক থেকে কিছু যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করতে পারে, তবে সে হল রূপকথা। কথাসাহিত্যের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে রূপকথার মাধ্যমে। কাহিনী হিসেবেও এর একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। কেবল ছোটোদের জন্যে নয়, বড়োদের জন্যেও। হয়তো এই সব কারণেই রূপকথা আমাদের লেখকমহলে এতো প্রিয়।

এ-পর্বে সবচেয়ে বেশী রূপকথা-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন আবু কামরুন নাহার। তাঁর আঠারোখানি গ্রন্থের অধিকাংশই রূপকথা। দ্বিতীয় উৎসাহী রূপকথাকার মোসলেমউদ্দিন। তাঁর রূপকথা-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'রাজকন্যার দেশে' (১৯৫৬) আর 'রাক্ষসের দেশে' (১৯৫৯) ব্যাপক না হলেও যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। এ-সময়ের অন্যান্য জনপ্রিয় রূপকথা-গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাসাদ্দুক লোহানীর 'রূপকথার মায়াপুরী' (১৯৫৬), ফকির লোকমান হাকিমের 'রূপকথার রাজ্যে' (১৯৫৯) এবং জসীমউদ্‌দীনের 'ডালিম কুমার' (১৯৬০)। রূপকথাকারদের সবাই যে নিজস্ব কাহিনী পরিবেশন করেছেন, তা নয়। তাঁদের অনেক রচনাই আসলে প্রচলিত রূপকথার পুনর্বর্ণন। কাহিনীর আকর্ষণের তারতম্য নির্ভর করে অবশ্যি সংশ্লিষ্ট লেখকের রচনাশৈলীর ওপর। রচনাশৈলীর বিচারে আমাদের সমগ্র রূপকথাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ডালিমকুমার'। এ-গ্রন্থে লেখকের ভাষার মাধুর্য যে কতোখানি, উদ্ধৃতি ছাড়া তা বোঝানো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়,—

...রাজার এত থাকতেও কিছু নেই, রাজার বাড়ীতে নেই ছোট্ট এত টুকুন, তুলতুলে, টুকটুকে, ফুটফুটে, কোলে নেওয়া যায়,

আদর করা যায়, সোনা বলা যায়, লক্ষ্মী বলা যায়, মাণিক বলা যায়, চাঁদ এনে চাঁদের চুমো চাঁদমুখে মাখিয়ে দেওয়া যায়, একেবারে জুঁই কুড়িটির মত, সাগরের ফেনার মত, ছোট্ট এত টুকুন একরত্তি একটি খোকন।…

সূচনা পর্বে আমরা নাটকের ক্ষেত্রে যে দৈন্য লক্ষ্য করেছি, আনন্দের কথা, বিকাশ পর্বে তা অনেকখানি দূরীভূত। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, নাটকের এই অগ্রগতি ঠিক সংখ্যাগত নয়। হিসেব নিলে দেখা যায়, সূচনা এবং বিকাশ পর্বে প্রায় সমসংখ্যক নাটকই প্রকাশিত হয়। বিকাশ পর্বে নাটকের অগ্রগতির কারণ রচনার গুণগত উন্নতি এবং বিষয়ের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি। এখানে আরো উল্লেখ্য, এ-পর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং কিছুটা ক্ষমতাবান লেখকের আবির্ভাবও নাটকের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিকাশ পর্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যগ্রন্থ ইব্রাহীম খাঁর 'জঙ্গী বেগম' (১৯৫৬)। বারোটি নাটিকার সংকলন, এ-গ্রন্থের সব কটি রচনারই বিষয় ঐতিহাসিক এবং বক্তব্য শিক্ষামূলক। কিন্তু দুটি নাটিকা ছোটোদের জন্যে অচল এবং অন্য কয়েকটি রচনা কথোপকথন মাত্র। এ-পর্বের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী নাট্যগ্রন্থ মুফাখ্‌খারুল ইসলামের 'আউলাদ' (১৯৫৮)। এই পূর্ণাঙ্গ শিশুতোষ নাটকখানির ঘটনাবলীর বিন্যাসে এবং বক্তব্যে লেখক বাঙালীর জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এবং তাঁর মতে, তাদের জাতীয়তাবোধ কেবল মুসলিমদের ঐক্যেই সম্ভব। তাঁর দর্শনে সমাজ-তাত্ত্বিক জ্ঞানের যতো অভাবই থাক না কেন, গ্রন্থখানির দৃশ্যবিন্যাসে সত্যিকার নাটকীয়তা আছে।

এ-পর্বে আমরা এমন আরো কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ পেয়েছি, যেগুলি 'আউলাদ'-এর মতোই বক্তব্যের দিক থেকে সীরিয়াস। যেমন, আলাউদ্দিন আল আজাদের 'মরক্কোর যাদুকর' (১৯৫৯), রাজিয়া মাহ্‌বুবের 'সাগর কন্যা' (১৯৬০) এবং এ, কে, মকবুল আহমদের 'দুখু মিয়া' (১৯৬০) আর 'সেই ছেলেটি' (১৯৬০)। বক্তব্যের প্রতি মনোযোগী আরো কিছু নাটক এ-সময়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু রচনা হিসেবে এগুলির অধিকাংশই অনুল্লেখ্য। মোটামুটি হিসেবে পাঠযোগ্য কেবল ফকির লোকমান হাকিমের 'প্রতিযোগিতা' (১৯৫৭) আর 'সোনার মেডেল' (১৯৫৭),

ফিরোজ আল মুজাহিদের 'দুই ভাই' (১৯৫৮) এবং শরৎচন্দ্র ঘোষের 'দুরন্ত' (১৯৫৮)।

'মরক্কোর যাদুকর'-এর লেখক আলাদিন আর তার আশ্চর্য প্রদীপের কাহিনীকে আরব্য উপন্যাসের পটভূমি থেকে উঠিয়ে নিয়ে সমগ্র পৃথিবী আর নিরবধি কালের পটভূমিতে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু পুরাতন কাহিনীর ব্যবহারে তিনি কোনো প্রচলিত রীতি বা ব্যাখ্যার অনুসারী নন। আলাদিনের প্রদীপকে তিনি দেখেছেন 'মানব জাতির প্রজ্ঞা' রূপে। অপিচ, তাঁর চোখে আলাদিন জনগণের প্রতিনিধি এবং শিল্পী, সাহিত্যিক, শ্রমিক, কৃষক,—সবাই তার সমর্থক। 'মরক্কোর যাদুকর'-কে এমনিভাবে জনগণের নাটকের রূপ দিয়ে এর মাধ্যমে লেখক ঘোষণা করেন,--

> আমরা এক নবযুগ স্বষ্টির পথে পা দিয়েছি। সে যুগ স্বাধীনতার যুগ, সাম্যের যুগ, শান্তির যুগ। প্রাচুর্য আর আনন্দই হবে এর মূলমন্ত্র। এরপর সরল শৈশব, সার্থক যৌবন এবং সফল বার্ধক্যের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ লাভ করবে জীবনের পূর্ণতাকে।

কাহিনী আর দৃশ্য পরিকল্পনার অভিনবত্ব সত্ত্বেও কুশীলব আর দৃশ্যপটের বাহুল্য নাটকখানির মঞ্চায়ন প্রায় অসম্ভব এবং উপভোগ কেবল পঠনীয়তায় সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে।

রাজিয়া মাহ্‌বুবের 'সাগর কন্যা' বিভিন্ন ধরনের নয়টি নাটিকার সংকলন। সব কটি নাটিকাই উপভোগ্য। 'বিচার' শীর্ষক একটি নাটিকার কাহিনী কৌতূহল স্বষ্টির সার্থকতায় রসঘন এবং এর শেষ দৃশ্য বুদ্ধিতে দীপ্ত। আঙ্গিকের সাফল্যে এটি আমাদের শিশুতোষ নাট্যসাহিত্যের এক বিশিষ্ট রচনা। গ্রন্থের কয়েকটি নাটিকার ভাষা ছন্দোবদ্ধ। তবে, গদ্যের আকারে বিন্যস্ত। এগুলির মধ্যে 'সবুজগীন' এদেশের প্রথম শিশুতোষ নৃত্যনাটিকা। এ, কে, মকবুল আহমদের 'সেই ছেলেটি' দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের সংগ্রামের কাহিনী এবং 'দুখু মিয়া' নজরুলের বাল্য আর কৈশোর জীবনের নাট্যরূপ। দুখানি নাটকেই যথেষ্ট দোষত্রুটি আছে। কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে দুটি কাহিনীই নতুন।

এ-পর্বের অন্যান্য নাট্যগ্রন্থের প্রধান উপজীব্য লোককথা আর কৌতুক-কাহিনী। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য বন্দে আলী মিয়ার নাটিকা-সংকলন 'টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার' (১৯৫৬) আর 'শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা' (১৯৫৭), তাজমিলুর রহমানের 'কলির জিন' (১৯৫৮ ?) এবং কে, এ, জিয়াউদ্দিনের 'মঞ্জু মুকুল' (১৯৫৯)।

প্রবন্ধসাহিত্যে সূচনা পর্বে লেখক-প্রকাশকের যতো অনুরাগই কাড়ুক না কেন, বিকাশ পর্বে তার সংখ্যাগত অবনতি ঘটে। এ-পর্বে প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ কমে যায়। একটি গঠনশীল নতুন সাহিত্যশাখার জন্যে এটি নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ নয়। কিন্তু, সুখের বিষয়, এ-সময়কার প্রবন্ধসাহিত্য অন্য দিক থেকে তার সংখ্যাগত অবনতির ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নিয়েছে। সূচনা পর্বের প্রবন্ধসাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, সে-সাহিত্য ছিলো জীবনীপ্রধান এবং এক সাম্প্রদায়িক প্রবণতায় ক্লিষ্ট। জীবনীপ্রাধান্য বিকাশ পর্বের প্রবন্ধসাহিত্যেও লক্ষণীয়। এবং এ-সময়েও কয়েকজন সুপরিচিত মুসলিম ধর্মগুরু আর রাজনীতি-কের জীবনী একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি আরো একটি প্রবণতা নির্ভুলভাবেই স্পষ্ট। এই প্রবণতায় আমাদের শিশুতোষ জীবনীকারদের দৃষ্টি সম্প্রদায়িকতার সীমা ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা প্রসারিত। আর, প্রসারিত দৃষ্টিতে এমন দুই-একজন মহাপুরুষও আলোচনার আওতায় এসে পড়েছেন, যাঁরা ছিলেন ধর্মজীবী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে অগ্রহণীয়। এমনকি, শত্রুশিবিরের সৈনিক রূপে পরিগণিত। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য, বিজ্ঞান আর রাজনীতির বিদেশী মহৎ কর্মীরাও এ-সময়ে আমাদের জীবনীকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এবং এই কর্মীদেরও কেউই মুসলিম নন। এ-প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বললে অন্যায় হবে না। বিকাশ পর্বের জীবনীগ্রন্থগুলি প্রকাশের মূলে ব্যাপক উদ্যোগ ছিলো মাত্র দুই-তিনটি প্রতিষ্ঠানের। কালক্রমে এগুলিরই একটি এদেশে জীবনীগ্রন্থের প্রধান প্রকাশকে পরিণত হয়।

বিকাশ পর্বে মুসলিম ধর্মগুরু আর রাজনীতিকদের জীবনী ছাড়া অন্য যেসব জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হাবীবুর রহমানের 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' (১৯৫৬), মোহাম্মদ মনিরুজ্জমানের 'কবি

আলাউল' (১৯৬০), বন্দে আলী মিয়ার 'বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র' (১৯৬০), রফিকুল ইসলামের 'বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরি' (১৯৬০), সত্যপ্রসাদ সেন-গুপ্তের 'মহাকবি শেক্সপীয়ার' (১৯৬০) আর খায়রুল বাশারের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬০)। রচনা হিসেবে সব কটি গ্রন্থই উপভোগ্য। সংশ্লিষ্ট লেখকদের আলোচনার পরিসর ছিলো সঙ্কীর্ণ। তা সত্ত্বেও তাঁরা আলোচিত মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনাবলী, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যতো দুর সম্ভব গুছিয়ে পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এ-প্রয়াসে সবচেয়ে সফলকাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তাঁর লেখনীতে কবি আলাউলের জীবনকথা লোভনীয় গল্পের রূপ নিয়েছে। লেখকের এই সাফল্যের প্রধান কারণ ভাষা। কঠিন শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও যার গতিময় লালিত্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। তেরোটি নামাঙ্কিত অধ্যায়ে বিভক্ত 'কবি আলাউল'-এর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এই ভাষার একটুখানি নমুনা দিচ্ছি,—

> ভাগ্যপীড়িত মন্ত্রীপুত্র চলেছেন স্বদেশ ছেড়ে। নিঃসহায়, নিঃসম্বল। লোকজন নেই, সৈন্য সামন্ত নেই। বলহীন, কপর্দকহীন। ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত মন। বার বারই ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে পুরোনো দিনের কথা, জন্মভূমির কথা। ভাবছেন, সে সব দিনগুলোতে যদি ফিরে যাওয়া যেত।

বিকাশ পর্বে অন্য যেসব প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেগুলির বিষয় বিবিধ। প্রধান বিষয় ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস-গ্রন্থগুলির কোনোখানিরই রচনা হিসেবে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ্য খেলাধূলো, যাদুবিদ্যা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান। সাহিত্যবিষয়ক একখানি গ্রন্থে—দাদাভাই (রোকনুজ্জামান খান)-এর 'আমার প্রথম লেখা'-য় (১৯৫৭)—কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের সাহিত্যচর্চার আদি কথা তাঁদেরই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এ-পর্বে আমরা উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ পাই মাত্র তিনখানি। আবদুল মতীনের 'বুড়ো পৃথিবী' (১৯৫৮), বেগম সালেহা খাতুনের 'অন্ধকার থেকে আলোয়' (১৯৫৮) আর এ, এ, মোহাম্মদ আবদুশ শুকুরের 'কাজের বিজ্ঞান' (১৯৫৮)। 'বুড়ো পৃথিবী' মফঃস্বল (বগুড়া) থেকে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ। এবং এর লেখক পাঠকসমাজে অপরিচিত। কিন্তু একজন জাত লেখকের ক্ষমতার ছায়া গ্রন্থখানির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিধৃত রয়েছে।

লেখকের আলোচিত বিষয় পৃথিবীর জন্মকথা। এবং তা বিবৃত হয়েছে কথোপকথনের মাধ্যমে। কিন্তু সে-কথোপকথন বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থাদির কথোপকথন নয়, যেন কোনো রসাশ্রয়ী নাটকের সংলাপ। যদিও তাতে এক ব্যক্তির ভূমিকাই আসল। বক্তার কথাগুলি অবশ্যই গদ্যে আশ্রিত এবং রস পরিবেশনে সে-গদ্য একাই যথেষ্ট। তবু, লেখক মাঝে মাঝে স্বরচিত কিছু ছড়া জাতীয় জিনিষও জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের একাংশ,—

> ···শুরু হল বৃষ্টি ঝরার যুগ! উঃ! সে কি বৃষ্টি, কি তার তোড়া!···বৃষ্টি ঝরার এই যুগটিতে একবার যদি কোন মতে বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ করল তো নাও; এখন মাসই কি, বছরই কি, দিনরাত খালি বৃষ্টি-ই হ'তে লাগল, বৃষ্টিই হ'তে লাগল, আর বৃষ্টিই হ'তে লাগল।···

সূচনা পর্বে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছি, সে-সময়ের সব অনূদিত গ্রন্থই প্রকাশিত হয় একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রচারমূলক উদ্যোগে। দুঃখের বিষয়, বিকাশ পর্বেও অনুবাদের ক্ষেত্রে এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং এ-সময়ে তার সাথে হাত মিলিয়েছে তারই দেশের আর একটি প্রচারজীবী প্রতিষ্ঠান, এবং এদেশের লেখক-প্রকাশকরা স্বাধীন আগ্রহ আর উদ্যোগের কথা ভুলে গিয়ে যথারীতি নিজস্ব, অপরমুখাপেক্ষী অনুবাদকর্ম থেকে দূরে সরে থেকেছেন।

বিকাশ পর্বে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গড়ে প্রতি মাসে একখানি করে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বলা প্রয়োজন, কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান দুটির প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। যদিও একটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রত্যেক গ্রন্থেই নিজেদের সহযোগিতার কথা লিখিতভাবে ঘোষণা করেছে। অনূদিত সকল গ্রন্থই প্রকাশিত হয় স্থানীয় প্রকাশকদের দ্বারা। গ্রন্থগুলির মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। বাকী গ্রন্থগুলির প্রধান উপজীব্য ইতিহাসখ্যাত মহাপুরুষদের জীবনকথা।

কিন্তু বিষয় যা-ই হোক না কেন, কোনো গ্রন্থ প্রকাশনের মূলেই যে এদেশের শিশুসাহিত্যের উন্নয়নকামনা ছিলো না, তার প্রমাণ, প্রতিষ্ঠান দুট তাদের দেশের বাইরের কোনো গ্রন্থের অনুবাদে বিন্দুমাত্র উৎসাহও দেখায়নি। তাদের উদ্যোগে উৎসাহে অনূদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুপরিচিত

কোনো নামও পাওয়া যাবে না। তবে, বিষয়ের নিজস্ব আকর্ষণ আর প্রকাশনা-সৌষ্ঠবের দরুন কয়েকখানি গ্রন্থ কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কেবল সরাসরি অনুবাদে নয়, বিদেশী সাহিত্যের পুনর্বর্ণনেও আমাদের লেখক-প্রকাশকদের উৎসাহ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বিদেশী সাহিত্যের প্রতি এই বিরাগের কারণ অনুসন্ধানের অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু একটি কথা উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজন। এ-বিরাগ সুস্থ এবং উদার সাহিত্যচেতনার উন্মেষ সাধনের পথে এক প্রবল বাধার রূপ নিতে পারে। এবং আমার আশঙ্কা, আমাদের লেখক-প্রকাশকরা এ-বিষয়ে সচেতন নন। বিদেশী রচনার পুনর্বর্ণন যে বিকাশ পর্বেও সূচনা পর্বের বিন্দুতে থেকে গেছে, তার কারণ হয়তো তাঁদের এই সচেতনতার অভাব। তবে, সত্যের খাতিরে স্বীকার করা প্রয়োজন, বিকাশ পর্বে বিদেশী কাহিনীর কয়েকটি উপাদেয় পুনর্বর্ণন দেখা যায়। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সৈয়দ আবদুল মান্নানের 'কাঠের পুতুল' (১৯৫৬; মূল লেখক পিনোচিয়ো), দীপঙ্কর চৌধুরী ও ফওজুল করিমের 'রবিনসন ক্রুসো' (১৯৫৮), হাবীবুর রহমানের 'বিজন বনের রাজকন্যা' (১৯৫৯) আর 'ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা' (১৯৫৯), আবদুল মতিন আর আবুল হাসানাতের 'ক্ষুদে মানুষের দেশে' (১৯৫৯) এবং গোলাম রহমানের 'আজব দেশে এলিস', (১৯৫৭) 'ঈশপের গল্প' (১৯৫৮), আর 'জ্যান্ত ছবির ভোজবাজি' (১৯৬০)।

পুনর্বর্ণিত কাহিনীতে মূল লেখকের নামোল্লেখ কেবল তাঁর ঋণ স্বীকারের খাতিরেই নয়, সৌজন্যের জন্যেও অপরিহার্য। এবং উপরি-উক্ত গ্রন্থগুলিতেও এই অপরিহার্যতা যতো দূর সম্ভব স্বীকৃত। ব্যতিক্রম কেবল 'ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা'। মার্কিন কথাসাহিত্য থেকে গৃহীত এই কাহিনীটির মূল লেখকের নাম হাবীবুর রহমান কোথাও উল্লেখ করেননি। সে যা-ই হোক, গ্রন্থখানি এদেশের শিশু পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদর পেয়েছে। এর কারণ বিষয়ের বিচিত্রতা, কাহিনীর নাটকীয় গতি এবং হাবীবুর রহমানের ভাষাভঙ্গি। বিভিন্ন পশুর ল্যাজ-পরিচিতি 'ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা'-র ভাষার নমুনা,—

··ঘরের দক্ষিণের জানলার পাশে একটা দড়ির খাটিয়া—তার ওপরে সেই আদ্যিকালের কোন এক বষ্ঠি-বুড়ির সেলাই-করা একটা কাঁথা আর সাপের খোলসের ঝালর দেওয়া একটা বালিশ।··· গোটা দুই ঠ্যাং নড়বড়ে বেতের চেয়ার—শামাদানের ওপরে একটা মাটির চেরাগ—তা থেকে তেল পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে। ওপাশে একটা কুলুঙ্গিতে বুড়োর শুঁড়-বাঁকানো এক জোড়া চটি—হয়তো কখনো-কখনো পায়ে দিয়ে চটর-পটর হাঁটে।···

পত্রপত্রিকার দিক থেকে বিকাশ পর্বের শিশুসাহিত্য ছিলো মন্দভাগ্য। সূচনা পর্বে শিশুপত্রিকা প্রকাশনের উৎসাহ আসে জোয়ারের মতো এবং সে-সময়ে আট বৎসরে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আগেই বলেছি, অন্ততঃপক্ষে এগারোখানি। কিন্তু বিকাশ পর্বে এই উৎসাহে ভাটার টান পড়ে। এ-সময়ে আমরা শিশুপত্রিকা পাই মাত্র আটখানি। তার ওপর, একখানি ছাড়া এই পত্রিকাগুলির কোনোখানিরই বয়েস বৎসরের সীমা অতিক্রম করেনি। তবে, পত্রপত্রিকার ব্যাপারে বিকাশ পর্বের দৈন্য সূচনা পর্বের খানদুয়েক পত্রিকার দীর্ঘায়িত আয়ুতে কিছুটা দূর হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'আলাপনী' বিকাশ পর্বের সীমা পেরিয়ে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত টিকে ছিলো। এটি বাংলাদেশের প্রথম দীর্ঘায়ু শিশুপত্রিকা। এবং এদেশের সবচেয়ে দীর্ঘায়ু শিশুপত্রিকা, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 'খেলাঘর' আজও টিকে আছে।

বিকাশ পর্বের শিশুপত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালের আগস্ট থেকে ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে। প্রথম পত্রিকা 'কিশোর সাহিত্য'-এর আবির্ভাব ঘটে ছাত্রদের মুখপত্র রূপে, ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা থেকে, এম. এ. আজিজের সম্পাদনায়। এ-পত্রিকার রচনাবলী প্রকৃতিতে শিশুসাহিত্যের সাথে তুল্য হলেও শিশুসাহিত্যের সৃষ্টি এবং প্রচার ছিলো এর কাছে গৌণ। একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে আদর্শবাদী 'কিশোর সাহিত্য' ছাত্রসমাজের আদর্শ আর বক্তব্যের প্রচারকেই বড়ো বলে মেনেছে। এ-পত্রিকার সব লেখক-লেখিকাই ছিলো ছাত্রছাত্রী। লেখক-পরিচালক গোষ্ঠীর বয়েসে এবং কঠোর আদর্শবাদিতায় এ-পত্রিকা বাংলাদেশে আজও অনন্য হয়ে রয়েছে।

'কিশোর সাহিত্য'-এর জন্মকালে প্রকাশিত, কিন্তু তার থেকেও স্বল্পায়ু মাসিক 'বণালী' আত্মপ্রকাশ করে দিনাজপুর শহর থেকে, এস. এম. এন. আশরাফ উদ্দীনের সম্পাদনায়। এর কিছু দিন পরে, ১৩৬৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয় 'নতুন সকাল'। যার জন্মভূমি ছিলো যশোহর। 'মুকুল' নামের একখানি বয়স্কজনপাঠ্য পত্রিকার রূপান্তর, এই পত্রিকা-খানির সম্পাদনা করতেন মোহাম্মদ দাউদ আলী। এখানি বাংলাদেশের প্রথম ত্রৈমাসিক শিশুপত্রিকা। কর্তৃপক্ষ অবশ্যি একে সংকলন বলে চালাতেন। চার সংখ্যার পর 'নতুন সকাল' পূর্ব নামে এবং পূর্ব পরি-চয়ে ফিরে যায়। এ-সময়ে একখানি পাক্ষিক পত্রিকাও মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত হয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৫৯)। মাত্র চার সংখ্যার আয়ু নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানির নাম ছিলো কিশলয়' এবং প্রকাশ-ভূমি যশোহর। আর, সম্পাদনা করেন আলমগীর জলিল।

বিকাশ পর্বের অন্যান্য পত্রিকা—'সবুজ সেনা,' 'রঙধনু,' 'মধুমেলা' আর 'পানতুয়া'-র জন্মভূমি ঢাকা। আল-কামাল আবদুল ওহাবের সম্পাদনায় ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত মাসিক 'সবুজ সেনা' ছিলো উক্ত নামের এক প্রতিষ্ঠানের আদর্শবাদী মুখপত্র এবং দুই বাংলার লেখক-লেখিকাদের সক্রিয় সমর্থনে পুষ্ট। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে মোসলেম উদ্দীনের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক 'রঙধনু'-র রচনাবলীতে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিলো না। তবে, এ-পত্রিকা নতুন লেখক সৃষ্টি এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ দানের ব্যাপক আয়োজন করে। পত্রিকা-খানি ১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে বন্ধ হয়ে যায়। বিকাশ পর্বের শেষ পত্রিকা 'মধুমেলা' আত্মপ্রকাশ করে গোলাম রহমানের সম্পাদনায়, ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই পত্রিকাখানিও মুদ্রণে আর অঙ্গসজ্জায় বিকাশ পর্বের অন্যান্য পত্রিকার মতোই নিরাকর্ষণ ছিলো। কিন্তু সম্পাদনার গুণে এবং রচনাবলীর উৎকর্ষে 'মধুমেলা' সূচনা এবং বিকাশ পর্বের অন্যতমো শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। এর আয়ুষ্কাল ছিলো চার মাস। বাংলাদেশের প্রথম বার্ষিক পত্রিকা দ্বিভাষিক 'পানতুয়া' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে, রাজিয়া মাহবুবের সম্পাদনায়।

পত্রপত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে বিকাশ পর্বে আমাদের উৎসাহে ভাটা পড়লেও সংকলন প্রকাশনে সে-উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে শিশুসাহিত্য-সংকলন প্রকাশিত হয় ছয়খানি। এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সূচনা পর্বের শিশুসাহিত্য-সংকলনের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের প্রথম সংকলনখানি প্রকাশিত হয় মফঃস্বল থেকে। বিকাশ পর্বে মফঃস্বলের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ। এ-সময়ের ছয়খানি সংকলনের মধ্যে মাত্র একখানি আত্মপ্রকাশ করে ঢাকা থেকে।

ঢাকার সংকলনখানির নাম 'ডালি'। এখানি প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দীনের সম্পাদনায়, ১৯৫৬ সালে। সহজবোধ্য কারণেই 'ডালি' ছিলো বিকাশ পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন। বিভাগোত্তর কালের ঢাকার দ্বিতীয় সংকলন 'ডালি'-র আত্মপ্রকাশ ঘটে ছাপান্নজন লেখকের রচনা নিয়ে, সংক্ষিপ্ত পরিসরেও বৈচিত্র্যের বর্ণালী ফুটিয়ে। সম্পাদক এতে নানা স্বাদের কবিতা, গল্প, রূপকথা, ঐতিহাসিক কাহিনী এবং প্রবন্ধ সংকলিত করেন। বিকাশ পর্বের দ্বিতীয় সংকলন 'পাপড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, ভেড়ামারা থেকে, এন. এম. জাহাঙ্গীরের সম্পাদনায়। এখানি বাংলা-দেশের দ্বিতীয় কিশোরপাঠ্য কবিতা-সংকলন। পরবর্তী কালে, ১৯৬০ সালে, এন. এম. জাহাঙ্গীর ভেড়ামারা থেকে আরো একখানি সংকলন প্রকাশ করেন। এখানির নাম ছিলো 'কোরক'। বাংলাদেশের প্রথম কিশোরপাঠ্য গল্প-সংকলন 'কোরক'-এ এদেশের বারোজন গল্পকারের রচনা সংকলিত হয়। এ-পর্বের তৃতীয় সংকলন সুফী মোতাহার হোসেন আর এ, টি, এম, শামসুল হুদা-সম্পাদিত এবং ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত 'স্বাপ্নিক'। সংকলনখানিতে রচনা ছিলো একান্নটি। এই বিরাট সংকলনখানির বৈশিষ্ট্য, এতে বাংলাদেশের সে-সময়কার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত এবং উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্যিকের রচনাই সংকলিত হয়। এবং সংশ্লিষ্ট লেখকদের প্রায় সবারই আলোকচিত্রসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছিলো। বাংলাদেশে এভাবে শিশুসাহিত্যের আর কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়নি। বিকাশ পর্বের বাকী সংকলন দুখানি আত্মপ্রকাশ করে চট্টগ্রাম থেকে। সংকলন দুখানির নাম 'নবারুণ' (১৯৫৮) আর 'প্রান্তিক'। প্রথমখানির সম্পাদক ছিলেন আবদুল মান্নান হাওলাদার এবং মোহাম্মদ

মোস্তফা, দ্বিতীয়খানির জামালউদ্দীন আহমেদ। মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত কোনো সংকলনই রচনায় আর প্রকাশনায় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

সপ্তম দশক বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রথম দিকটি ছিলো কণ্ঠরোধের সময়। কিন্তু ষষ্ঠ দশকে গণচেতনার যে বিকাশ ঘটে, কণ্ঠরোধের প্রয়াসকে তা খুব বেশী দিন সমীহ করে চলেনি। বরং তা ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রতিবাদী চেতনার রূপ নেয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ষষ্ঠ দশকে গৃহীত উন্নয়ন-উদ্যোগগুলির কিছু সুফল ফলতে শুরু করে। ইতিমধ্যে শিক্ষারও প্রসার ঘটেছে এবং তার ফলে সাংস্কৃতিক চেতনায় এসেছে ব্যাপ্তি, কিছুটা গভীরতাও, যা শিল্প-সাহিত্যে মার্জিত রুচির জননী এবং অবশ্যই নব নব জিজ্ঞাসারও। অতি সংক্ষেপে বর্ণিত এই অবস্থার সাহিত্যিক ফলশ্রুতি খানিকটা নতুন উৎসাহ,—পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি, পরীক্ষানিরীক্ষায় তরুণকুলের উদ্যোগ, প্রকাশনাশিল্পের অগ্রগতি ইত্যাদি যার বাহ্যিক প্রকাশ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, শিশুসাহিত্য এই পরিবর্তনের বাইরে পড়ে থাকেনি। বরং পরিবর্তনের হাওয়া এখানে ব্যাপকভাবেই লেগেছে। আর, তার ফলে বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের অগ্রগতি ঘটে একাধিক পথে। এই অগ্রগতির বস্তুগত রূপ শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদির সংখ্যা বৃদ্ধি, মননের দিকে বিষয়ের প্রধাবন আর রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যায়ণ। ইতিহাসের খাতিরে এখানে আরো উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, এ-সময়ের অগ্রগতির জন্যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ যেমন সাধারণভাবে দায়ী, তেমনি দায়ী বিশেষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, যা ছিলো উক্ত পরিবেশের আর এক ফসল। প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকাশনার। এবং কে না জানে, এদের ভেতর সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা ছিলো বাংলা একাডেমীর। প্রসঙ্গতঃ, এ-সময়ে শিশুতোষ গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদচিত্রণে—এবং অঙ্গসজ্জায়ও—ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এতেও বিশিষ্ট প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশস্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের উপরি-উক্ত অগ্রগতির ধারণাবলীকে যদি একটি শব্দে নামাঙ্কিত করা যায়, তাহলে সে-শব্দ হবে বৈচিত্র্যায়ণ।

এই বৈচিত্র্যায়ণ অবশ্যি একেবারে আকস্মিক ছিলো না। এর লক্ষণ যে বিকাশ পর্বে'ই সূচিত হয়, তা আমরা ওপরের আলোচনাতেই দেখেছি। তবে, বৈচিত্র্যায়ণের স্পষ্টতার প্রথম আভাস মেলে সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে। এবং তার বিস্তার উক্ত দশকের শেষ সীমা অবধি। হয়তো এর পরেও তার জের চলতো এবং তা আরো পরিণত রূপ নিতো। কিন্তু তেমন সময় সে পায়নি। অষ্টম দশকের শুরুতে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে অন্যতরো যুগের সূচনা হয়ে গেছে। সে-যুগের রূপ এবং প্রকৃতি একেবারেই আলাদা।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে'র অগ্রগতি বিশ্লেষণ করতে গেলে যেসব জিনিষ বিশেষভাবে চোখে পড়ে, সেগুলির মধ্যে একটি হল ছন্দিত রচনার ভাগ্যোন্নতি। সূচনা এবং বিকাশ পর্বে'র রচনাবলীর আলোচনায় দেখা গেছে, এমনিতে ছড়া আর কবিতা রচনায় আমাদের লেখকদের যতো উৎসাহই থাক না কেন, গ্রন্থ প্রকাশনের মাধ্যমে সে-উৎসাহ সমর্থন পেয়েছে কদাচিৎ। কিন্তু বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে' এই সমর্থন আসে প্রায় প্লাবনের মতো। আর, তার ফলে ছন্দিত রচনার গ্রন্থ প্রকাশের হার বেড়ে যায় প্রায় দশ গুণ। আগের কোনো পর্বে' কবিতা-গ্রন্থের সংখ্যা দশ অবধিও পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে' শুধুমাত্র বিশিষ্ট কবিতা-গ্রন্থের সংখ্যাই গিয়ে দাঁড়ায় দুই ডজনের ওপর। এবং এই সময়ে প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থের মোট সংখ্যা ছিলো ষাটের কাছাকাছি। সে-যুগের রূপ এবং প্রকৃতি একেবারেই আলাদা।

এ-পর্বে' প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থাদির সব লেখকই যে নবীন, তা নয়। বরং তাঁদের অধিকাংশই প্রবীণ এবং বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে'র পূর্ব' থেকেই প্রতিষ্ঠিত। তবে, অনেকেরই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই সময়ে। এ-দলের কবিদের মধ্যে রয়েছেন ফররুখ আহমদ, হাবীবুর রহমান, রোকনুজ্জামান খান, বেগম জেবু আহমদ, সানাউল হক প্রমুখ। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে' এঁদের পাশে নতুন যেসব কবি এসে দাঁড়ান, তাঁদের সংখ্যাও একেবারে উপেক্ষ্য নয়। তার চেয়েও বড়ো কথা, নতুন দলে আমরা বেশ কয়েকজন শক্তিমান কবির সাক্ষাৎ পেয়েছি। দ্বিতীয় দলের কবিদের এবং প্রবীণ আর পূর্ব'প্রতিষ্ঠিত কবিদেরও কারো কারো একাধিক কবিতা-গ্রন্থ বা ছড়া-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে যাঁদের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাঁদের ভেতর ছিলেন ফখরুখ আহমদ, ফয়েজ আহমদ, বেগম জেবু আহমদ এবং কাজী আবুল কাসেম। ফখরুখ আহমদের প্রথম গ্রন্থ 'পাখীর বাসা' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৬ সালে। সাতটি বিভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থের কবিতাবলীর কতকগুলির বিষয় পশুপাখী এবং প্রকৃতি। বাকী কবিতাগুলির কিছু কৌতুকধর্মী এবং কিছু প্রচারবাদী। পরবর্তী কালে (১৯৭১) 'ছড়ার আসর' নামে ফখরুখ আহমদের আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের অন্যতমো বিশিষ্ট শিশুরঞ্জক ছড়াকার ফয়েজ আহমদ এ-সময়ে দুখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন,—'তাধিন, তা' (১৯৬৩) এবং 'রিমঝিম' (১৯৬৬)। উনিশটি কবিতার গ্রন্থ 'তাধিন্-তা'-য় কল্পিত আঙ্গিক বিকৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ সাময়িকভাবে প্রশমিত। কিন্তু 'রিমঝিম'-এ তিনি 'জোনাকী'-র জগতে ফিরে গেছেন। অবশ্যি, এ-গ্রন্থের রচনাগুলি তাঁর প্রথম গ্রন্থের রচনাবলীর থেকে উন্নততরো। বেগম জেবু আহমদের 'মাছরাঙা' (১৯৬২) আর 'সোনার টিয়ে'-র ছড়াগুলির বিষয় নির্বাচিত হয়েছে শিশুর অতি পরিচিত জগৎ থেকে, স্নেহরসের ভিয়েন দিয়ে। কাজী আবুল কাসেম কৌতুকপ্রিয় কবি। এবং তাঁর কৌতুকের একটি বড়ো অবলম্বন উদ্ভট শব্দ। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে তাঁর দুখানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়,—'কাঁচামিঠে' (১৯৬৪) এবং 'সবুজ ছড়া' (১৯৭০)

এ-সময়কার অন্যান্য প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত কবির গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য হাবীবুর রহমানের 'আগডুম বাগডুম' (১৯৬২), রোকনুজ্জামান খানের 'হাট টিমা টিম' (১৯৬২), আশরাফ সিদ্দিকীর 'ছড়ার মেলা' (১৯৬৪), বেগম সুফিয়া কামালের 'ইতল বিতল' (১৯৬৬), সানাউল হকের 'ছেলে বুড়োর ছড়া' (১৯৬৯), হোসনে আরার 'টুং টাং' এবং মনোমোহন বর্মণের 'সবুজ কুঁড়ি স্বপন দেখে' (১৯৭০)।

আগেই বলেছি, বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে বেশ কয়েকজন শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, কবি হিসেবে নতুন হলেও আবির্ভাবকালে তাঁদের সবাই বয়েসে নবীন ছিলেন না। বয়েসে যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, কিন্তু কবি হিসেবে নতুন, তাঁদের মধ্যে প্রথম

উল্লেখযোগ্য কবিতাকার আবদুর রহমান। শিশুসাহিত্যের আসরে তাঁর আবির্ভাব সপ্তম দশকের প্রথম দিকে, প্রায় আকস্মিকভাবে, 'টুটুর হাওয়াই সফর' (১৯৬২) নামে একখানি গ্রন্থ নিয়ে। জুলে ভার্ণের 'রাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ'-এর দ্বারা প্রভাবিত 'টুটুর হাওয়াই সফর' এদেশের একমাত্র শিশুতোষ কাহিনীকাব্য। মাঝে মাঝে ছন্দের বৈচিত্র্যে লীলায়িত, এ-গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ সকল শ্রেণীর পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে,—

··আকাশ পাড়ি
দিচ্ছে টুটুর ঘুড়ি,
মেঘ জমেছে
পূব দিগন্ত জুড়ি।
পাহাড় ঘুমায়
বরফ মুড়ি দিয়ে,
লক্ষ শিশুর
মুখের হাসি নিয়ে।···

'টুটুর হাওয়াই সফর'-এর পর আবদুর রহমানের খণ্ড-কবিতার দুখানি সংকলন প্রকাশিত হয়,—'রাত নিঝঝুম' (১৯৬৩) আর 'ঝড়ের দেশ' (১৯৬৩)। গ্রন্থ দুখানিতে কয়েকটি সুখপাঠ্য কবিতা আছে।

ছড়াকার হিসেবে বর্তমানে সুপরিচিতা হোসনে আরা কামালের আবির্ভাবও ছিলো আকস্মিক। তাঁর রচনা পরিমাণে অল্প। কিন্তু তিনি সেই জাতের ক্ষমতার অধিকারিণী, যা অনায়াসসম্ভবা এবং তাই ফলশ্রুতিতে অনুপেক্ষ্য। দুঃখের বিষয়, তিনি স্বল্পবাক। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে তাঁর মাত্র একখানি ছড়া-সংকলন প্রকাশিত হয়,—'ইভুর জন্য ছড়া' (১৯৬৩)। এ-পর্বে তাঁর সতীর্থ অন্যান্য কবির গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাই কাজী লতীফা হকের 'ছড়ার মালা' (১৯৬৮) আর আল-কামাল আবদুল ওহাবের 'লতাপাতা' (১৯৬৯)। এই দুজন কবি অবশ্যি বৈচিত্র্যায়ণ পর্বের আগেও শিশুসাহিত্যের চর্চা করেছেন।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে যে-কয়জন তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান এখলাসউদ্দিন আহমদ, সুকুমার বড়ুয়া আর জালালুল আলাম। এখলাসউদ্দিন আহমদের প্রথম গ্রন্থ 'হাসির ছড়া মজার পড়া'

আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬১ সালে, কলকাতা থেকে। তারপর বাংলাদেশে তাঁর তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,—'টুকরো ছড়ার ঝাঁপি' (১৯৬৫), 'ইকড়ি মিকড়ি' (১৯৬৭) আর 'বাজাও ঝাঁজর বাম্বি' (১৯৭০)। ছন্দিত রচনায়—বিশেষতঃ, ছড়ায়—তিনি পশ্চিম বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসারী। কিন্তু লৌকিক ঐতিহ্য যেখানে ঈষৎ পরিবর্তনের পর সর্বজনীন গ্রাহ্যতার স্তরে নীত, সেখানেও তাঁর ছড়া এবং কবিতা আধুনিকতার নতুন ছায়াপাতে রসোত্তীর্ণ। বস্তুতঃ, ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী এই কবির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য, কোনো কোনো রচনায় তিনি লৌকিক কাব্যের ভাষার গায়ে আধুনিক খাঁজ কেটে একালের প্রতিবাদী চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এ-জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় 'টুকরো ছড়ার ঝাঁপি'-তে সংকলিত 'রাজার মেয়ে রাজকন্যে' শীর্ষক একটি রচনা। এর প্রথমাংশ,—

> রাজার মেয়ে রাজকন্যে খান না ভাত,
> মাঘের শীতে উদম গায়ে কাটান রাত।
> রাজা করেন শমন জারি,
> মুণ্ডু কাটা পড়বে তার-ই —
> মেয়ের আগে গিলবে যে কেউ পান্তা ভাত।
> দেশের লোকে বললে এও এক আজব বাত।

সুকুমার বড়ুয়া আর জালীলুল আলামের মন কৌতূহলী এবং নতুনত্বের সন্ধানী। তবে, দুজনের কৌতূহল আর নতুনত্বের ধারণায় একটুখানি পার্থক্য আছে। সুকুমার বড়ুয়া প্রথম দিকে ছিলেন গতানুগতিক রচনা-ধারার অনুসারী। তারপর তিনি হয়ে ওঠেন প্রবল সাহসী। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর অধিকাংশ রচনাই সমাজচেতনানির্ভর ব্যঙ্গে নিশিত। এবং এসব রচনায় তাঁর বক্তব্যও আধুনিক। কিন্তু এসবের থেকেও বড়ো তাঁর দুঃসাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যা প্রায় সর্বাংশেই ভাষাগত। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, শব্দকেন্দ্রিক। তিনি এমন সব শব্দকেও শিশুতোষ ছন্দিত রচনায় টেনে এনেছেন এবং স্মরণীয় স্বাদে ভরে তুলেছেন, যেগুলিকে বয়স্কজনসেবী কবিরাও হাতে নিতে তেমন সাহস পান না। এ-জাতীয়—এবং বিদেশী শব্দের লাগসই ব্যবহারে ভাষায় তীক্ষ্ণতা আনতেও তিনি

কিছু কম দক্ষ নন। অন্য দিকে, কৌতূহল আর নতুনের প্রতি আকর্ষণবোধ জালীলুল আলামের রচনাবলীতে নানান আলোর অস্থির বর্ণালী সৃষ্টি করেছে। তাঁর অবলম্বন কখনো বিষয়ের বৈচিত্র্য, কখনো বা ভাষার আর ছন্দের। জালীলুল আলামের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর প্রতিশ্রুতির মূল প্রকাশক্ষেত্র ছড়া। এতে মাঝে মাঝে তিনি শব্দ ব্যবহারে এমন কৌশল অবলম্বন করেছেন, বাংলা কবিতায় যা আমরা দেখতে পাই কেবল তার সর্বাধুনিক স্তরে। তাছাড়া, অপ্রত্যাশিত বিষয়কেও তিনি লোভনীয় রূপে শিশু পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরতে জানেন। তাঁর শব্দগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদাহরণ,—

এক ছিল ডাক-
তার বড় নাক।
খায় শুধু ডাল-
ভাত আর চাল-
তার টক দিয়ে
মেখে নিয়ে ঘিয়ে।

এক দিন রাত-
ত্রিতে হল বাত।
তা খুব চীৎ-
কার কাঁপে ভিৎ।…

জালীলুল আলাম স্বল্পবাক কবি। এবং এ-পর্যন্ত তাঁর মাত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থখানির নাম 'ঘি চপচপ' (১৯৬৩)। সুকুমার বড়ুয়া শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে অতিবিচরণে উৎসাহী। কিন্তু তাঁরও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একখানি,—'পাগলা ঘোড়া' (১৯৭০)। এ-গ্রন্থের সব রচনাই তাঁর কবিজীবনের প্রথম দিকের। এগুলিতে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো স্বাক্ষর নেই।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে অন্য যেসব কবিতা-গ্রন্থ আর ছড়া-সংকলন প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলমগীর জলীলের 'তাক ডুমাডুম' (১৯৬৩), এম. এ. হাশেম খানের 'মজার ছড়া' (১৯৬৮), কাইয়ুম চৌধুরীর 'তাই তাই তাই' (১৯৬৯), জুবাইদা গুলশান আরার 'মজার

ছড়া' (১৯৭০), শেখ নজিবর রহমানের 'শুকতারা' (১৯৭০), মুহম্মদ শামসুর রহমানের 'তিড়িং বিড়িং' (১৯৭০) এবং নুরুল আবসারের 'ছড়া দিলেম ছড়িয়ে' (১৯৬৯), 'পুষি' (১৯৭০) আর 'এক যে ছিল বুড়ি' (১৯৭০)।

এ-পর্বে ছন্দিত রচনার যে-ভাগ্যোন্নতি লক্ষণীয়, তা প্রায় বৈপ্লবিক। শিশুসাহিত্যের অন্য যে কোনো শাখার কাছেই এমন ভাগ্যোন্নতি ঈর্ষণীয়। আমার একথা বলবার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে অন্যান্য শাখার ভাগ্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বস্তুতঃ, আগেই আভাস দিয়েছি, এ-পর্বে আমাদের শিশুসাহিত্যের সকল শাখায়ই স্মরণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গুণগত অগ্রগতিতে কোনো শাখাই কারো থেকে কম যাবে না। তবে, প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যার দিক থেকে ছন্দিত রচনার অগ্রগতির তুলনায় অন্যান্য শাখার অগ্রগতি অনেক কম।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে কথাসাহিত্যের গ্রন্থাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় দেড় গুণ। কিন্তু বিকাশ পর্বের মতো এ-পর্বেও উপন্যাসের তুলনায় গল্প-গ্রন্থের সংখ্যাগত অগ্রগতি ঘটে বেশী। প্রসঙ্গতঃ, এখানে শিশুতোষ গল্প এবং উপন্যাসের চাহিদা সম্পর্কে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বয়স্ক পাঠকদের রুচি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থের চাহিদা তথা বিক্রয়ের পরিসংখ্যানের সাথে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন, এদেশে সর্বাধিক চাহিদা উপন্যাসের। এবং গল্পগ্রন্থের বাজার প্রায় নৈরাশ্যজনকভাবে সংকীর্ণ। কিন্তু শিশুসাহিত্যের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবল বৈচিত্র্যায়ণ পর্বেই নয়, সূচনা আর বিকাশ পর্বেও আমরা একথার প্রমাণ পেয়েছি। দ্বিতীয়তঃ, সকল পর্বেই উপন্যাসকারদের মধ্যে প্রাধান্য ছিলো তরুণদের।

এ-সময়ে প্রকাশিত পাঠযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নূরুদ্দীন আহমদের 'ফার্ষ্ট বয়' (১৯৬১), কামাল বিন মাহতাবের 'মঙ্গল গ্রহে সাত দিন' (১৯৬১), মীর মোশাররফ হোসেনের 'ডান-পিটে' (১৯৬৩), এখলাসউদ্দিন আহমদের 'এক যে ছিল নেংটি' (১৯৬৪), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'অবাক অভিযান' (১৯৬৪), আহসান হাবীব আর মোহাম্মদ নাসির আলীর 'বোকা বকাই' (১৯৬৬) এবং বুলবন

'ওসমানের কানা মামা' (১৯৬৭)। 'মঙ্গল গ্রহে সাত দিন' এ-পর্বের সম্ভবতঃ একমাত্র বিজ্ঞান-আশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসকার এ-গ্রন্থে বিজ্ঞানের চেয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বেশী। 'বোকা বকাই' অতি উপভোগ্য উপন্যাস। এর কাহিনীতে যে মাটিঘেঁষা স্বাভাবিকতা আছে, তা আমাদের খুব কম শিশুতোষ উপন্যাসেই পাওয়া যাবে। তবে, একে ঠিক বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের ফসল বলা সম্ভব নয়। গ্রন্থখানি রচিত হয় বিভাগপূর্ব কালে। তরুণ উপন্যাসকার বুলবন ওসমানের 'কানা মামা' আদর্শবাদী উপন্যাস এবং এক স্নিগ্ধ সরলতায় জারিত। শিশুতোষ আদর্শবাদী উপন্যাসে সচরাচর যে প্রচ্ছন্ন ভাবালুতা থাকে, এ-গ্রন্থ আশ্চর্যজনকভাবে তার থেকে মুক্ত। এর কাহিনী গড়ে উঠেছে এক দরিদ্র কিশোরের জীবনসংগ্রাম আর তার সাফল্য নিয়ে। উপন্যাসখানি বাংলাদেশের কিশোর পাঠকমহলে ব্যাপক-ভাবে নন্দিত হয়েছে। এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদের 'এক যে ছিল নেংটি'-র বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু এ্যাডভেঞ্চারধর্মী এই উপন্যাসখানির জনপ্রিয়তাও কিছু কম নয়। এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ কাহিনীর নাটকীয়তা এবং ভাষার সরল মাধুর্য। অষ্টম অধ্যায় থেকে 'এক যে ছিল নেংটি'-র ভাষার নমুনা, —

> অনেক-অনেকক্ষণ ধরে তারা এগিয়ে চল্‌লো। এগিয়ে চল্‌লো তারা চুপিচুপি, ভয়ে ভয়ে। ধেড়ে আগে আগে, পিছু পিছু নেংটি। কোথাও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও আবার ঘোলাটে, কখনো প্যাচ-প্যাচে কাদা, কখনো কখনো কোথাও আবার পায়ের পাতা ডোবা ছপ্‌ছপানি পচা জল। আর তার মধ্যে দিয়েই তারা এগিয়ে যেতে লাগলো হনহনিয়ে। অতি সাবধানে...

বিকাশ পর্বে'র কথাসাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখেছি, সূচনায় গল্পের ক্ষেত্রে বিষয়ের যে বৈচিত্র্যহীনতা ছিলো, এই সময়ে তা অনেকাংশেই দূরীভূত হয়। আনন্দের কথা, বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে' আমাদের গল্পকারেরা বিষয় নির্বাচনে আরো উদার। এবং তাঁদের ঔদার্যে কাদামাটির পটভূমি আরো প্রসারিত হয়েছে। এই প্রসারিত পটভূমিতে সীরিয়াস কাহিনী

যেমন আছে তেমনি আছে কৌতুককথা, এ্যাডভেঞ্চারধর্মী রচনা এবং সহজ, আটপৌরে জীবনের ঘটনাবলী। এ-পর্বে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীর প্রতি আমাদের গল্পকারদের অনুরাগ সঙ্কুচিত। এ-জাতীয় রচনার উল্লেখ-যোগ্য সংকলন পাওয়া যায় মাত্র কয়েকখানি এবং সেগুলির ভেতর সত্যিকার সার্থক রচনার সংখ্যা নগণ্য। তবে, অন্যান্য পর্বের মতো এ-পর্বেও রূপকথা জনপ্রিয়। আমাদের অনেক নবীন-প্রবীণ গল্পকারই এ-সময়ে রূপকথা লিখেছেন এবং তাঁদের রচনাপ্রয়াসের ফলে রূপকথা-গ্রন্থের কেবল সংখ্যাই বৃদ্ধি পায়নি, পরিবেশনেও উৎসাহজনক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

শিশুতোষ ছোটো গল্পকে যাঁরা শুধু গল্প বলেই জানেন না, কিছু বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম বলেও জানেন, তাঁদের প্রায় সবাই আমাদের শিশুসাহিত্যের প্রবীণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। সত্যেন সেনও বয়েসে প্রবীণ। কিন্তু শিশুসাহিত্যের আসরে তাঁর আবির্ভাব অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'পাতাবাহার' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। উনিশটি গল্পের সংকলন, এ-গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই বক্তব্যপ্রধান এবং সব বক্তব্যই সমাজসচেতন। সাম্যবাদী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী সত্যেন সেন তাঁর গল্পগুলিতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নানাবিধ দোষত্রুটি আর দ্বন্দ্বসংঘাতের চিত্র তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমানের 'প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প'-ও (১৯৫০) সমাজসচেতন এবং বক্তব্যের মূল সুরে 'পাতাবাহার'-এর গোত্রের। কিন্তু রচনাকুশলতার গুণে শওকত ওসমানের গল্পগুলি স্বাদুতরো। সত্যেন সেন এবং শওকত ওসমান যে-মানসপ্রবণতার কারণে সমাজসচেতন লেখক বলে পরিচিত, মোহাম্মদ মোদাব্বেরের হয়তো তা নেই। কিন্তু এই কুশলী গল্পকারও সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করেন না। সমাজের কিছু দোষত্রুটি তাঁর রচনাতেও ধরা পড়েছে। তাঁর এ-জাতীয় রচনার মূল লক্ষ্য শিশু এবং কিশোরদের চরিত্র গঠন। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'ডানপিটের দল' এবং ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'গল্প শোন'-তে এই শ্রেণীর বেশ কয়েকটি গল্প সংকলিত হয়েছে।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির একটি বড়ো অংশ কৌতুকজীবী। এবং এ-অংশে অপেক্ষাকৃত তরুণ আর নবীন লেখকদের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ।

কৌতুকের আসরে যে-কয়জন প্রবীণ বা পূর্বপরিচিত লেখকের সাক্ষাৎ মেলে, তাঁরা যেন ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমের দলের প্রথম উল্লেখ্য নাম মোহাম্মদ নাসির আলী। এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'লেবু মামার সপ্তকাণ্ড' (১৯৬৮)। এ-গ্রন্থ কিশোর-জীবনের অহংবোধ, নির্বুদ্ধিতা, বাহাদুরিপ্রিয়তা ইত্যাদি নিয়ে লেখা সাতটি গল্পের সংকলন। কাজী আবুল কাসেমের 'গামা মামার সারে গামা'-র (১৯৬৪) কৌতুকধারা ঈষৎ প্রচ্ছন্ন। দুটি গল্পের সংকলন 'গামা মামার সারে গামা'-র প্রথম গল্পটির উপজীব্য বিজ্ঞানের একটি কল্পিত অবদান এবং দ্বিতীয় গল্পটি কিশোরদের দলাদলি নিয়ে লিখিত। পরবর্তী কালে, ১৯৬৯ সালে, কাজী আবুল কাসেম কচি বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে একখানি গল্প-সংকলন প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির নাম 'কাজলা পুসি'। এর কৌতুকও প্রচ্ছন্ন। এ-জাতীয় কৌতুকের আরো কিছু গল্প পাওয়া যাবে বন্দে আলী মিয়ার 'ভুতুড়ে কাণ্ড' (১৯৬২), 'অতি চালাকীর বিপদ' (১৯৬৪) আর 'চালাকি'-তে এবং ইব্রাহীম খাঁর 'গল্প দাদুর আসর'-এও (১৯৭১)।

তরুণ গল্পকারদের কৌতুকধর্মী রচনাবলীর মধ্যে এ-পর্বে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে রাহাত খানের 'দিলুর গল্প' (১৯৬৯)। ছাত্র-জীবনের বিভিন্ন ধরনের দুষ্টুমি নিয়ে লেখা এই গ্রন্থখানির প্রতিটি গল্পই রচনা হিসেবে বিশিষ্ট। কেবল কাহিনী-পরিকল্পনার জন্যেই নয়, ঘটনাবলীর অভিনব নাটকীয়তা আর ভাষাভঙ্গির জন্যেও। তরুণ দলের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সার্থক কৌতুকজীবী রচনা নেই বললেই চলে।

এ-পর্বের অন্যান্য কৌতুকজীবী গল্প-সংকলনের মধ্যে উল্লেখ্য গোলাম রহমানের 'চকমকি' (১৯৬১), সানাউল্লাহ্ নূরীর 'বুদ্ধি শেখার গল্প' (১৯৬৩), মোজাফফর হোসেনের 'খোকাখুকুর হাসির গল্প' (১৯৬৯) ইত্যাদি।

একটু আগেই বলেছি, আমাদের কৌতুকধর্মী শিশুতোষ গল্পের আসরে এ-পর্বে তরুণ দলের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ। তাঁদের প্রাধান্য পাঁচমিশেলী সুরের গল্পেও আছে। কিন্তু সে-প্রাধান্য নিরঙ্কুশ নয়। এবং কৌতুকধর্মী গল্পে যেমন, তেমনি পাঁচমিশেলী সুরের গল্পেও তাঁদের সাফল্য প্রবীণ আর প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সাফল্যের তুলনায় কার্যতঃ নগণ্য। তবে, শিশু-

সাহিত্যের আসরে নবাগত লেখকদের কয়েকখানি গ্রন্থ মোটামুটি হিসেবে পাঠযোগ্য। যেমন, শাহ আনিসুর রহমানের 'আড্ডা' (১৯৬১), খগেন্দ্রনাথ দাসের 'খেলার সাথী' (১৯৬১), বাঙ্গাল আবু সাঈদের 'মিউ মিউ মিনি মামী' (১৯৬২) আর শেখ নজিবর রহমানের 'মজার গল্প' (১৯৭০)। ফকির লোকমান হাকিম বৈচিত্র্যায়ণ পর্বের আগেও দুই-একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর কিছুটা খ্যাতিও ছিলো।। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে তাঁর দুখানি রসালো গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। 'লাল শালুকের মেলা' (১৯৬১) আর 'কাঠবিড়ালীর গানের আসর' (১৯৬৩)। হালিমা খাতুন আর জাহানারা ইমামের কোনো গ্রন্থ আগে প্রকাশিত হয়নি। এ-পর্বে গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শিশুসাহিত্যের আসরে পরিচিত গল্পকারের মর্যাদা লাভ করেছেন। হালিমা খাতুনের 'সোনা পুতুলের বিয়ে'-র (১৯৬৫) গল্পগুলি শিক্ষামূলক। এর কোনো কোনো গল্পে উপকথাসুলভ রচনাভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। এ-গ্রন্থ—এবং জাহানারা ইমামের 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি'-ও (১৯৬৬) —কচি বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে লিখিত। 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি'-র গল্পগুলির ঘটনাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আটপৌরে, কিন্তু এক স্নিগ্ধ রসে সিক্ত।

এ-পর্বে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সার্থক ফয়েজ আহমদের 'পুত্‌লী' (১৯৬৪)। তিনটি গল্পের সংকলন, এই গ্রন্থখানির রচনাগুলি অংশতঃ এ্যাডেভেঞ্চারধর্মী এবং নানা রসের মিশ্রণে উপাদেয়। আর, ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই এক আধোগুঞ্জরিত সুরের অনুরণনের মতো। 'পুত্‌লী'-র প্রথম গল্পের 'আমি তারাদের রাণী' শীর্ষক অধ্যায় থেকে এই ভাষার একটুখানি নমুনা দিচ্ছি,—

> গানের সুর মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে, অনেক দূরে। সে গানের সুরের রেশ ছেয়ে রইল লবুর মন, বিভোর হয়ে রইল ক্ষণেকের তরে। তারপর সে আপন মনেই বলে উঠল : আমি যে একা!
>
> আবার সে জোরে বলল : আমাকে নিয়ে যাও তোমরা। কে তোমরা, আমাকে নিয়ে যাও।...

পাঁচমিশেলী রসের অন্যান্য গল্প-সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মঈনুদ্দীনের 'শাপলা ফুল' (১৯৬২) এবং আল-কামাল আবদুল ওহাবের

'বিনা টিকিটের যাত্রী' (১৯৬৪), 'সাত রং, (১৯৬৪) আর 'বিজয় অভিযান' (১৯৬৪)।

আগেই বলেছি, বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীর প্রতি আমাদের গল্পকারদের অনুরাগ আগের তুলনায় স্তিমিত। তবে, এ-পর্বে'ও আমরা ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্পের বেশ কয়েকখানি সংকলন পেয়েছি। যেমন, বেবী আন্ওয়ারের 'রাজার রাজা' (১৯৭০) আর মুস্তফা জামালের 'সত্যি কথার গল্প' (১৯৭১)। এ-জাতীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের রচনা ছাড়া আর কোনো লেখকের রচনাই সার্থক হয়নি।

কিন্তু ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনায় যেমনি হোক. রূপকথা রচনায় আমাদের কথাকারদের লেখনী স্বাদপ্রসূ। এবং অবশ্যই ভুরিপ্রসূও। অন্ততঃপক্ষে অন্যান্য পর্বে'র তুলনায়। তার প্রমাণ, এ-পর্বের গল্পগুলির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী কেবল রূপকথা। এ-প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, রূপকথা পরিবেশনে এই পর্বেও তরুণ লেখকরা যেমন উৎসাহী. তেমনি প্রবীণরাও। তবে, স্বাভাবিক কারণেই, তরুণদের হাতে সোনা কিছু কম ফলেছে। ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনার মতো রূপকথার ক্ষেত্রেও তাঁদের দলের বিশিষ্টতমো প্রতিনিধি হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ। বর্তমানে সাংবাদিকতায় যশস্বী কিন্তু সাহিত্যচর্চা'য় একান্তই অনীহ, এই লেখকের গ্রন্থখানির নাম 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' (১৯৬২)। ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনায় তরুণ দলে তাঁর কোনো উল্লেখযোগ্য দোসর আমরা খুঁজে পাইনে। কিন্তু রূপকথার আসরে তাঁর আসন অতোটা নিরঙ্কুশ নয়। এ-আসরে আমরা আরো দুই-একখানি উপভোগ্য গ্রন্থ পেয়েছি। যেমন, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'রাজপুত্র আর কোটালপুত্র' (১৯৬৩)! প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রূপকথাগ্রন্থ-গুলির মধ্যে ব্যাপক সমাদর পেয়েছে বন্দে আলী মিয়ার 'কুচবরণ কন্যা' (১৯৬১) আর 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' (১৯৬৪), খোদেজা খাতুনের 'রূপকথার রাজ্যে' (১৯৬০), আশরাফ সিদ্দিকীর 'ভোম্বল দাস' (১৯৬৩), হাবীবুর রহমানের 'হীরা মতি পান্না' (১৯৬৭) এবং সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'উল্টো রাজার দেশ' (১৯৭০)। শিশুসাহিত্যে

সরদার জয়েনউদ্‌দীন স্বল্পবাক। কিন্তু তাঁর রচনার এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমাদের রূপকথাসাহিত্যে দুর্লভ। তিনি রূপকথা পরিবেশন করেন গ্রামের মজলিসী ঢঙে,—

> …হে মাঝি মাল্লাগণ! যা কপালে লেখা আছে, তা ঘটবেই। হাজার চেষ্টা হলেও তা থেকে রেহাই নাই। আমার এ পোড়া কপালে আর কি লেখা আছে। যত ক্লেশ পাই যত দুঃখ পাই তা আমি সইতে পারবো, পারবো না কেবল এ পোড়ামুখ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে। যদি কোনদিন কপালের দুঃখ ঘোচে সুখের নাগাল পাই তবে সবাইকে সাথে নিয়ে দেশে যাব। তার আগে নয়।…

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে আমরা শিশুতোষ নাটকের নাম পাই অন্যান্য পর্বের তুলনায় বেশী। এবং এ-পর্বে বিষয়ের বৈচিত্র্যও ব্যাপকতরো হয়েছে। যদিও আঙ্গিক—বা সামগ্রিক উৎকর্ষের—বিচারে অগ্রগতির বিশেষ কোনো লক্ষণই এক্ষেত্রে চোখে পড়ে না।

এ-পর্বের প্রথম দিকের নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌরীশচন্দ্র সরকারের 'স্পুটনিক যখন ছুটলো' (১৯৬১), এম, শামছুল হকের 'মিথ্যার খেশারত' (১৯৬৯), মিয়া আবদুল গনির, 'দাদুর স্বপ্ন' (১৯৬২) এবং মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের 'মণ্টুর পাঠশালা' (১৯৬২)। দ্বিতীয় নাটকখানি বক্তব্যে শিক্ষামূলক এবং ঘটনাবলীতে অন্ততঃপক্ষে অংশতঃ কৌতুকধর্মী। কাহিনী সত্যিই নাটকীয় এবং এই কাহিনীকে লেখক নিপুণ হাতে বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত করেছেন। 'দাদুর স্বপ্ন'-এর কাহিনী রূপকথাপ্রতিম। রাজহত্যার মাধ্যমে সমাপ্ত এক অভ্যুত্থান এবং প্রতি-বিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে লিখিত এই কাহিনীও শিক্ষামূলক। কিন্তু রচনা হিসেবে নাটকখানি অত্যন্ত কাঁচা। মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের 'মণ্টুর পাঠশালা'-তেও অপরিণত হাতের ছাপ আছে। তবে, কাহিনীটি শিক্ষামূলক। 'মণ্টুর পাঠশালা' এক দুষ্টস্বভাব ধনীসন্তানের কাহিনী। যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে ভালো ছেলেতে পরিণত হয়েছে। কাহিনীর দিক থেকে গ্রন্থখানি উপভোগ্য।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের আরো তিনখানি নাটক প্রকাশিত হয়। 'চাঁদের ছেলে' (১৯৬৪), 'হারজিত' (১৯৬৫) এবং 'পুতুলের ঘর' (১৯৬৫)। লেখকের প্রথম নাটকের কাহিনীর মতোই 'চাঁদের ছেলে' আর 'হারজিত'-এর কাহিনীরও উপজীব্য দুষ্টস্বভাব ছেলেদের কুকীর্তি। 'চাঁদের ছেলে'-তে লেখক একটি ভ্রান্ত ধারণারও শিকার। তাঁর বিশ্বাস, ধনীর সন্তানরা দুষ্ট, কিন্তু দরিদ্রের সন্তানরা ভালো। অপিচ, এ-গ্রন্থের সমগ্র কাহিনীই অস্বাভাবিক। 'হারজিত'-এর কাহিনী ছক-কাটা এবং গতিহীন। তবে, 'পুতুলের ঘর' মোটামুটি হিসেবে সহনীয়।

আবু সাঈদ জহরুল হকও দুষ্টস্বভাব ছেলেদের নিয়ে একখানি নাটক রচনা করেছেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত এই নাটকখানির নাম 'কিশোর-মেলা'। কাহিনী, বিষয়ের উল্লেখ থেকেই অনুমেয়, শিক্ষামূলক। কিন্তু স্কু-কু'র দ্বন্দ্বের পটে আঁকা 'কিশোরমেলা'-র সাধুস্বভাব চরিত্রগুলি যেন আদরের পোষা জীব। ভয় লাগে, শেখানো বুলির পুঁজি ফুরোলেই তারা বুঝি নির্বাক হয়ে যাবে। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে আমরা দুষ্ট ছেলেকে নিয়ে লেখা আরো একখানি নাটকের নাম পাই। নাটকখানি প্রসাদ বিশ্বাসের 'বিচার' (১৯৬৩)।

ওপরে আমি বাংলাদেশের শিশুতোষ নাটকের যে বিষয়গত বৈচিত্র্যের কথা বলেছি, তার অন্যতমো নিদর্শন আজিজুর রহমানের 'ছুটির দিনে' (১৯৬৪)। এর লক্ষ্য এবং কুশীলব (একজন ছাড়া) সত্যিকারভাবেই শিশুজন। 'ছুটির দিনে' আমাদের একমাত্র শিশুতোষ কাব্যনাটিকা। এর সমস্ত অংশই ছড়ার আঙ্গিকে রচিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'সুড়ঙ্গ'-ও (১৯৬৪) বিষয়ের দিক থেকে বিচিত্র। নব্যবাদী, প্রতীকাশ্রয়ী এই নাটক-খানি রচনা হিসেবে পরীক্ষামূলক এবং সত্যিই সার্থক। গ্রন্থখানির প্রাণ এক রহস্য। এবং বক্তব্য, রহস্য সম্পর্কে সব মানুষের মনোভাব এক নয়। কোনো কোনো মানুষ চায় রহস্য ভেদ করতে, তাকে জানতে। এমনকি, বাস্তব লাভের হিসেবী আলো ফেলে দেখতেও। আবার, কেউ কেউ আনন্দ পায় কেবল তার উপস্থিতিতেই। গ্রন্থখানির সংলাপও অত্যন্ত উপভোগ্য। এম, এস, হুদার 'জাগরণ'-ও (১৯৬৬) বিষয়ের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রাচীন সমাজের দ্বন্দ্ব-কলহ-ষড়যন্ত্র

নিয়ে লিখিত এই নাটকখানির মূল লক্ষ্য নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বে নবীনের জয় ঘোষণা। তবে, বিষয়গত কারণেই, এ-গ্রন্থ ঠিক ছোটোদের নয়, তরুণদের। এমনকি, বয়স্কজনও এ-নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেন। সামান্য দোষত্রুটি সত্ত্বেও রচনা হিসেবে 'জাগরণ' সার্থক। বস্তুতঃ, আমাদের শিশুতোষ নাট্যসাহিত্যে 'জাগরণ' বিষয় এবং রচনা উভয় দিক থেকেই অন্যতমো শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং এর দোসর আমরা খুব কমই পেয়েছি।

বাংলাদেশের অন্যতমো শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কল্যাণ মিত্র ছোটোদের জন্যে দুখানি নাটক রচনা করেছেন,—নারী-ভূমিকাবর্জিত 'রাস্তার ছেলে' (১৯৬৫) এবং পুরুষ-ভূমিকাবর্জিত 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৬৭)। দুখানির কাহিনীই সু-কু'র সুরে বাঁধা এবং দুজন পূর্বসূরীর দুখানি বিখ্যাত নাটকের কাহিনীর ছায়াবাহী।

সূচনা এবং বিকাশ উভয় পর্বেই ছোটো নাটিকার একাধিক উল্লেখযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে এমন গ্রন্থের নাম পাই মাত্র দুটি,—জোবেদা খানমের 'ছোটদের একাঙ্কিকা' (১৯৬৩) আর দৌলতুননেছা খাতুনের 'ঝরণা' (১৯৬৯)। 'ছোটদের একাঙ্কিকা' পাঁচটি রচনার সংকলন। কোনো রচনার কাহিনীই মৌলিক নয়। লেখিকা কেবল সুপরিচিত বিদেশী লৌকিক কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। প্রায় সব কটি নাটিকাই মোটামুটি হিসেবে রসোত্তীর্ণ। 'ঝরণা' দুটি নাটিকার সংগ্রহ। দুটিই রূপকধর্মী এবং কাহিনীর দিক থেকে উপভোগ্য। এ-ধরনের নাটিকা আমাদের শিশুতোষ নাট্যসাহিত্যে আর দেখিনে।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বের অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য এ, কে, মকবুল আহমদের 'রাখাল রাজা' (১৯৬১), অন্নদামোহন বাগচীর 'কেদার মাষ্টার' (১৯৬৭) এবং মোহাম্মদ হারেসউদ্দীনের 'শাহানশাহ বাবর' (১৯৬৮)।

প্রাগ্‌বৈচিত্র্যায়ণ পর্বের প্রবন্ধসাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখেছি, এ-সাহিত্য কার্যতঃ জীবনীসর্বস্ব এবং জীবনকথা ছাড়া অন্যবিধ বিষয়ের যে-কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের প্রধান উপজীব্য বিজ্ঞান। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বেও শিশুতোষ প্রবন্ধসাহিত্যে জীবনকথার প্রাধান্য নিরঙ্কুশ। এর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রধান বিষয়। তবে, এই ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রে বিষয়ের বৈচিত্র্য কিছু বেড়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে আমরা পাই

ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই বর্ধিত বৈচিত্র্যের সাথে সাথে দেখা গেছে গ্রন্থাদির সংখ্যাগত অগ্রগতি। যেমন জীবন-কথায়, তেমনি ব্যতিক্রমের বিষয়ে। এবং একথা তো বলাই বাহুল্য যে, রচনাশৈলীও বিকাশ পর্বের পর থমকে থাকেনি।

এ-সময়ে সবচেয়ে বেশী জীবনকথা লিখেছেন বন্দে আলী মিয়া, আবু যোহা নূর আহমদ, কাজী আবুল হোসেন, হাফেজ হাবীবুর রহমান প্রমুখ কয়েকজন লেখক। তাঁদের দ্বারা আলোচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ রাষ্ট্রনেতা, কেউ সাহিত্যসেবী, কেউ বা বিজ্ঞানী কিংবা ধর্মগুরু অথবা রাজনীতিক। নির্বাচন সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নয়। আলোচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এমন 'মহাপুরুষ'-এর নামও দুই-একটি পাওয়া যাবে, ইতিহাসের পটে যাঁদের সাক্ষাৎ মেলে সাময়িক-ভাবে। এবং যাঁদের বিশিষ্টতাও সাময়িক। ইতিহাসের পট থেকে তাঁদের নাম অচিরকাল পরেই মুছে যায়। হয়তো তাঁরা জনধিকৃতও। যেমন, হিটলার আর আইয়ুব খান। নীরস জীবনকথাকে সরস করে তোলবার ক্ষমতাও সব জীবনীকারের থাকে না। তবে, উল্লিখিত লেখকদের গ্রন্থগুলি তথ্যের দিক থেকে মোটামুটি হিসেবে সমৃদ্ধ এবং তাঁরা আলোচিত ব্যক্তিদের জীবন আর কীর্তিমালার স্পষ্ট ধারণাও দিতে পেরেছেন।

রচনাবলীতে আর তথ্য পরিবেশনে আমরা সর্বাধিক কুশলতার পরিচয় পাই, প্রবীণ দলের লেখকদের মধ্যে, বন্দে আলী মিয়ার রচনা-বলীতে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'হজরত আয়েশা' (১৯৬১), 'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' (১৯৬১), 'ছোটদের সোহরাওয়ার্দী' (১৯৬২), 'ছোটদের কামাল আতাতুর্ক' (১৯৬২), 'মাইকেল মধুসূদন' (১৯৬৩), 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (১৯৬৪) ইত্যাদি। বন্দে আলী মিয়ার প্রবীণ সতীর্থ দলের খুব কম লেখকের রচনাই সুখপাঠ্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা নবাগত বা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত, বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে তাঁদেরও বহু জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বয়েসে তাঁদের অনেকেই কিছুটা নবীন। এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের রচনাভঙ্গি নতুনের অনুসারী। যেমন, হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ তাঁর 'হীরে মুক্তো পান্না'-য়

(১৯৬১), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'ছোটদের উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার'-এ (১৯৬৩), শাহাবুদ্দীন আহমদ 'ছোটদের নেপোলিয়ন'-এ (১৯৬৩) এবং হায়াৎ মামুদ 'রবীন্দ্রনাথ'-এ (১৯৬৭)। রচনাভঙ্গির নতুনত্বে শেষোক্ত গ্রন্থখানি আমাদের শিশুতোষ জীবনীসাহিত্যের অন্যতমো শ্রেষ্ঠ রচনা। এর নবম অধ্যায় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,—

> বার্লিন থেকে ম্যুনিক—ব্যাভেরিয়ার রাজধানী, প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এক বিখ্যাত প্রকাশকের বাসায় সাক্ষাৎ হলো টোমাস মানের সঙ্গে। টোমাস মান? কে তিনি? বলাই বাহুল্য, সম-ভাবের ভাবুক, লেখক। বয়স বেশি হয় নি, পঁয়তাল্লিশের কাছে। কিন্তু এরই মধ্যে পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছে তাঁর উপন্যাস। পঁচিশ বছর বয়সে বেরোয় তাঁর প্রথম রচনা 'বুডেনব্রুকস', বিশালায়তন গম্ভীর উপন্যাস। তারপর রাতারাতি বিশ্বজোড়া খ্যাতি। আরো আট বৎসর পরে ইনিও অভিনন্দিত হয়েছিলেন নোবেল পুরস্কারে।...

শিশুতোষ প্রবন্ধে বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য অন্যবিধ রচনায়ও বেশ কিছুটা লক্ষণীয়। আগেই বলেছি, এই রচনাগুলির অধিকাংশই বিজ্ঞানবিষয়ক। যদিচ এগুলি সংখ্যায় বেশী নয়। এবং বিষয়ের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিজ্ঞানগ্রন্থগুলির প্রধান উপজীব্য পৃথিবী তথা জীবজগতের জন্ম, পরমাণু এবং আকাশচারণ।

এই বিশ্লেষণে প্রথম বিষয়টি নিয়ে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পাই জহুরুল হকের 'সৃষ্টির ইতিহাস' (১৯৬১), আবদুল হক খন্দকারের 'জীব-জগতের জন্মকথা' (১৯৬৫) এবং সত্যেন সেনের 'আমাদের এই পৃথিবী' (১৯৬৮)। জহুরুল হকের গ্রন্থখানির ভাষা তথা প্রকাশভঙ্গি সহজ, সাত থেকে দশ বৎসরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী। এমন সহজ ভাষা বা প্রকাশভঙ্গি আমাদের আর কোনো শিশুতোষ বিজ্ঞানগ্রন্থ নেই। কিন্তু লেখকের মতামত কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভট। 'জীব-জগতের জন্মকথা'-র কিছু কিছু তথ্য—এবং অনেকাংশে লেখকের ভাষাও—ঈষৎ প্রাচীনপন্থী। সত্যেন সেনের গ্রন্থখানি পড়লে মনে হয়, তাঁর বিশ্বাস, বিজ্ঞানের বিষয়াবলীর একটি নিজস্ব আকর্ষণ আছে, এ-কারণে

সেসবের পরিবেশনে ভাষাগত ভোজবাজি নিষ্প্রয়োজন। আর, হয়তো তার জন্যেই তাঁর ভাষায় বা রচনাভঙ্গিতে কোথাও আড়ম্বর নেই। তার অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, তাঁর ভাষা বা রচনাভঙ্গি নিরক্ত। বস্তুতঃ, প্রচুর তথ্যের সমাবেশ এবং নানা মতামতের উল্লেখ আর আলোচনা সত্ত্বেও গ্রন্থখানির ভাষা এক সারল্যে স্নিগ্ধ, মূলতঃ-কথাশিল্পী সত্যেন সেনের গাল্পিক মনের মমতায় লালিত, যা সহজেই পাঠককে নিবিষ্ট রাখে।

পরমাণু-সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য সুবোধ দাশগুপ্তের 'এটম থেকে এনার্জি' (১৯৬৯), আবুল আব্বাস খোন্দকারের 'পদার্থের কথা' (১৯৭০) এবং সত্যেন সেনের 'এটমের কথা' (১৯৫০)। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতেও সত্যেন সেনের আলোচনা সর্বত্রই কথাশিল্পীর স্নেহে লালিত। সুবোধ দাশগুপ্ত এবং আবুল আব্বাস খোন্দকারের গ্রন্থ দুখানি সুখপাঠ্য হয়নি।

আকাশচারণ আমাদের শিশুতোষ বিজ্ঞানসাহিত্যের এক প্রিয় বিষয়। এর আলোচনার সূত্রপাত সূচনা পর্বেই ঘটে। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে আমরা আকাশচারণ-সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাই দুখানি,—ফজলুল হাসান ইউসুফের 'আকাশচারী' (১৯৬৮) এবং সুব্রত বড়ুয়ার 'চাঁদে প্রথম মানুষ' (১৯৬৮)। 'আকাশচারী'-র লেখক সর্বত্রই আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের ভাষার। তবু তথ্য কোথাও উপেক্ষিত নয়। তার ফলে, আকাশচারণের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসরণে পাঠকদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু অনেক প্রসঙ্গই বড়ো বেশী সংক্ষিপ্ত। এমনকি, শুধুমাত্র উল্লেখেই সমাপ্ত। সুব্রত বড়ুয়ার 'চাঁদে প্রথম মানুষ' আমাদের শিশুসাহিত্যে চন্দ্রবিজয়-সম্পর্কিত একমাত্র গ্রন্থ এবং আকাশচারণবিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আলোচ্য বিষয়ের পরিবেশনে লেখক যথেষ্ট কুশলী। তাঁর সাহিত্যিক মন প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গকেই কাব্যের স্পর্শ দিয়েছে। অথচ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় কল্পনার সংযমের প্রয়োজন যে অপরিহার্য, তাও তিনি জানেন এবং সে-জানার মর্যাদাও রক্ষা করেন। যদিচ শিশুসাহিত্যের সীমার দিকে তিনি সব সময় খেয়াল রাখেননি। তাঁর রচনাভঙ্গির নমুনা,—

> চাঁদ। বহু কালের শত-শতাব্দীর পুরোনো পৌরাণিক চাঁদ। চাঁদ ছিলো মানুষের স্বপ্ন, কল্পনার রাণী। বিনিদ্র যুবকের পুলক,

স্বপ্নোত্থিতা যুবতীর আনন্দ। শিকি-জ্যোৎস্নার আলোয় ঘর ভরে গেলে, কোনো মধ্যরাতে কারো ঘুম ভাঙলে, চাঁদের মুখ দেখে তার মনে পড়েছে হাজারো স্মৃতির ছবি।…

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে গণিতের ওপরও দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, - নুরুল হুদার 'গণিতের জগত' (১৯৬৯) এবং শামসুল হকের 'মানুষ কি করে গুণতে শিখল' (১৯৬৯)। প্রথম গ্রন্থখানির বিষয় গণিতের বিভিন্ন শাখার কতকগুলি তত্ত্ব এবং তথ্য। গণিতের মতো নীরস এবং অবশ্যই অপ্রিয় আর ভীতিপ্রদ— বিষয়কেও যে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তার প্রমাণ এই গ্রন্থখানি। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির বিষয় সংখ্যার ইতিহাস। লেখকের ভাষা সরল এবং প্রথম দিকে রচনাভঙ্গি অংশতঃ গল্পের অনুকারী। এ-গ্রন্থের আগে শামসুল হকের আরো একখানি সুখপাঠ্য প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়,—'বই পড়া ভারী মজা' (১৯৬৫)।

আমাদের বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্যতমো শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মোহাম্মদ নাসির আলীর 'যোগাযোগ'-ও এই পর্বেই প্রকাশিত হয় (১৯৬৮)। এ-গ্রন্থ মুখ্যতঃ যানবাহনের অগ্রগতির ইতিহাস। মোহাম্মদ নাসির আলীকে তাঁর পাঠকরা দেখেছেন প্রধানতঃ নিপুণ গল্পকার হিসেবে। কিন্তু প্রবন্ধকার রূপেও তাঁর নৈপুণ্য যে কম নয়, তার অন্যতমো প্রমাণ 'যোগাযোগ'। একক বিষয় নিয়ে লেখা অন্যান্য বিজ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমানের 'আকাশে তারার মেলা' (১৯৬৩) এবং রফিক আহমদ আর ফজলুর রহমানের টেলিভিশনের কথা' (১৯৬৮)।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে কয়েকজন লেখক তাঁদের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলনও প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য আবদুল্লাহ্ আল-মুতীর 'রহস্যের শেষ নেই' (১৯৬৯) আর 'আবিষ্কারের নেশায়' (১৯৬৯), হাবীবুর রহমানের 'পুতুলের মিউজিয়াম' (১৯৬৪) এবং ডঃ মুহাম্মদ কুদরত-এ-খোদার 'বিচিত্র বিজ্ঞান' (১৯৬৪)।

বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে নিজস্ব উদ্যোগের যে অভাব সূচনা এবং বিকাশ পর্বে আমাদের লেখক-প্রকাশক মহলে দেখা গেছে, দুঃখের বিষয়, বৈচিত্র্যায়ণ পর্বেও তা দূর হয়নি। এ-সময়েও আমরা বিদেশী গ্রন্থের প্রচুর অনুবাদ পাই। এবং সেসব অনুবাদে বিষয়গত বৈচিত্র্যও যথেষ্ট আছে।

নেই কেবল আমাদের গর্ববোধের কোনো অবকাশ। কেননা, গ্রন্থগুলির অনুবাদ এবং প্রকাশনার সকল উদ্যোগই গ্রহণ করেছে বিদেশী প্রচার প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য শুধু এই যে, এ-পর্বে দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। ব্যতিক্রান্ত গ্রন্থ দুখানি কাজী আবুল হোসেনের 'কালাম-ই-রসুল' (১৯৬১) এবং ফেরদাউস খানের 'আজব দেশে টমকিন্স্' (১৯৬১)।

পুনর্বর্ণনের ক্ষেত্রে এ-পর্বে আমরা বেশ কিছু সুখপাঠ্য গ্রন্থ পেয়েছি। যদিও এগুলিতে বিষয়গত বৈচিত্র্য আদৌ নেই। পুনর্বর্ণিত সব রচনাই কহিনীমূলক,—হয় গল্প, নয়তো উপন্যাস। এবং অধিকাংশ গল্পেরই মূল উৎস লৌকিক। যেমন, সানাউল হকের 'পুতুল সৈনিক' (১৯৬১), কাজী মাসুমের 'দেশ বিদেশের চলতি গল্প' (১৯৬২), আলমগীর জলীলের 'জুতো পায়ে পুষি বেড়াল' (১৯৬৩), হাবীবুর রহমানের 'মন চলে মোর তেপান্তরে' (১৯৬৪) আর লায়লা সামাদের 'শ্রীশ্রী বিড়ালোত্তম দাস"-এর। শেষোক্ত গ্রন্থখানি নয়টি পুনর্বর্ণিত শ্লাভ উপকথার সংকলন এবং এর লক্ষ্য কচি বয়েসের ছেলেমেয়ে। গ্রন্থখানির ভাষা অত্যন্ত সহজ। নাম-গল্প থেকে এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,—

> এক বুড়ীর এক বেড়াল ছিল। বেড়ালটির গায়ের রঙ ছিল ভয়ানক কালো আর চোখ দুটো ছিল সবুজ। অন্ধকারে তার শরীর দেখা যেত না, শুধু চোখ দুটো আগুনের শিখার মত দপদপ করতো।
>
> বুড়ী হঠাৎ মরে গেল একদিন। বেচারী বেড়াল কি করবে, কোথায় যাবে, কি করে খাবে? এই নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লো। অবশেষে বুড়ীর বাড়ী ছেড়ে সে বনের পথ ধরলো।...

অ-লৌকিক উৎসের কাহিনীর সার্থক পুনর্বর্ণন পাওয়া যায় মাত্র দুখানি গ্রন্থে,—আশরাফ-উজ-জামানের 'পৃথিবীর সেরা বই' (১৯৬২) আর হাবীবুর রহমানের 'বনে বাদাড়ে'-তে (১৯৬৩)। হাবীবুর রহমানের গ্রন্থখানি সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। তবে, মূল লেখকের নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি।

পুনর্বর্ণনের ক্ষেত্রে কাহিনী নির্বাচনের সময় আমাদের লেখকদের লক্ষ্য থাকে মুখ্যতঃ রূপকথার দিকে। কিন্তু মোহাম্মদ নাসির আলীর

'ভিনদেশী এক বীরবল'-এ (১৯৭০) এর এক ব্যতিক্রম ঘটে। গ্রন্থখানিতে মধ্যপ্রাচ্যের জ্ঞানী-রসিক নাসিরউদ্দীন হোকা-সম্পর্কিত অনেকগুলি গল্প পুনর্বর্ণিত হয়েছে।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে শিশুতোষ পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় অন্ততঃপক্ষে ষোলোখানি। দুখানি ছাড়া এ-সময়কার সব শিশুপত্রিকাই মাসিক। এ-পর্বের পত্রিকাগুলির বৈশিষ্ট্য,—প্রকাশনার পারিপাট্যে, রুচির পরিচ্ছন্নতায় এবং রচনার উৎকর্ষে এগুলির অধিকাংশই অন্যান্য পর্বের পত্রপত্রিকার তুলনায় অনেকখানি অগ্রসর। বিষয়ের দিক থেকেও এ-সময়ে কিছু বৈচিত্র্য দেখা গেছে। ষোলোখানির মধ্যে তিনখানি পত্রিকা বিজ্ঞানের। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ-জাতীয় উৎকর্ষ আর বৈচিত্র্যের জন্যে প্রধানতঃ কালের তথা রুচির অগ্রগতি এবং শিশুপাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধিই দায়ী।

এ-পর্বের প্রথম পত্রিকা 'পাপড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে, রাজশাহী থেকে, হাবীবুর রহমানের ('হাবীব ভাই') সম্পাদনায়। 'পাপড়ি' যাত্রা শুরু করে মাসিক রূপে। কিন্তু চতুর্থ সংখ্যা থেকে পত্রিকাখানি পাক্ষিক আকারে এবং দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে দ্বিমাসিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে একে আবার পাক্ষিক আকারে দেখা যায়। আমাদের দেশে 'পাপড়ি'-র আগে আর কোনো দ্বিমাসিক শিশুপত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বের আরো কয়েকখানি শিশুপত্রিকার জন্মও মফঃস্বল শহরে। মাসিক 'সোনার কাঠি' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে, সৈয়দ তাইফুল ইসলামের সম্পাদনায়, বগুড়া থেকে। তিন সংখ্যার পর মৃত এই পত্রিকাখানি কোনো দিক থেকেই আকর্ষণীয় ছিলো না। মফঃস্বলের তৃতীয় পত্রিকা মাসিক 'নবারুণ' প্রকাশিত হয় সিলেট থেকে। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক ছিলেন শামিম আজাদ। তারপর খয়রুল আমীন লস্কর। ১৯৬৫ সালের মে মাসের পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। মফঃস্বলের চতুর্থ পত্রিকা 'টাপুর টুপুর' (প্রধান সম্পাদকঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শফি; সম্পাদকঃ এখলাসউদ্দিন আহমদ)। এর আত্মপ্রকাশ ঘটে চট্টগ্রাম থেকে, ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে। মুদ্রণ-পারিপাট্যে

এবং অঙ্গসজ্জায় পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র চমক সৃষ্টি করে। রুচির পরিচ্ছন্নতার জন্যেও ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত, 'টাপুর টুপুর' কিন্তু রচনার মান রক্ষায় প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। এর প্রধান কারণ, পত্রিকাখানির পৃষ্ঠায় প্রকৃত শিশুসাহিত্যিকদের পরিবর্তে সর্ব শ্রেণীর লেখকের আসর বসানোর প্রয়াস। তবু স্বীকার্য, 'টাপুর টুপুর' বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিশুপত্রিকা। মফঃস্বলের সর্বশেষ শিশুপত্রিকা মাসিক 'নব-জাগরণ' প্রকাশিত হয় নভেম্বর, ১৯৬৬-তে, জামালপুর থেকে, সৈয়দ মোহাম্মদ তারিকের সম্পাদনায়।

এ-সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিশুপত্রিকার সংখ্যা ছিলো অন্ততঃপক্ষে এগারো। এগুলির মধ্যে চারখানি প্রকাশিত হয় সরকারী এবং আধা-সরকারী উদ্যোগে। আধা-সরকারী উদ্যোগের প্রথম পত্রিকা মাসিক 'সবুজ পাতা' যাত্রা শুরু করে ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে, শাহেদ আলীর সম্পাদনায়, ইসলামিক একাডেমী থেকে এবং ইসলামী আদর্শ নিয়ে। দেশের বহু নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিকের স্নেহে লালিত 'সবুজ পাতা' কিছু জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। কিন্তু আর্থিক কারণে পত্রিকা-খানির জীবন বারবার বিড়ম্বিত হয় এবং তার ফলে এর প্রকাশ একাধিক বার সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময়ও পত্রিকাখানির সাময়িক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এর পুনর্জন্ম হয়। দ্বিতীয় আধা-সরকারী পত্রিকা মাসিক 'সাম্পান' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে, যাহিদ হোসেনের সম্পাদনায় এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার অর্থানুকূল্যে। পত্রিকাখানি মুক্তিসংগ্রামের শেষ দিকে বন্ধ হয়ে যায়। প্রকাশনা-সৌষ্ঠব বলতে এ-পত্রিকার কিছুই ছিলো না এবং এর রচনাবলীও কারো বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশনা বিভাগের শিশুমাসিক 'নবারুণ' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে, আবদুস সাত্তারের সম্পাদনায় এবং নজরুল বারীর প্রকাশনা-তত্ত্বাবধানে এর প্রকাশনা-সৌষ্ঠব ছিলো লোভনীয়। রচনাবলীও মোটামুটি হিসেবে উপাদেয় হয়েছে। তবে, সম্পূর্ণতঃ সরকার-নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার যা অসুবিধা,— নানাবিধ বিধিনিষেধের প্রতি আনুগত্য,— তার ফলে 'নবারুণ' সকল শ্রেণীর শিশুসাহিত্যিকের স্নেহ লাভ করতে বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমের

রূপ নিতে পারেনি। মুক্তিসংগ্রামের পর এ-পত্রিকার প্রকাশ সাময়িক-ভাবে বন্ধ থাকে।

এ-পর্বে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য সাহিত্যপত্রিকা 'পূরবী,' 'কচি ও কাঁচা', 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'মুকুল' এবং 'কলকণ্ঠ'। মাসিক 'পূরবী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সংকলন রূপে, আমিনুজ্জামানের সম্পাদনায়। ১৯৬৫ সালের আগস্ট থেকে এই পত্রিকা দ্বিমাসিকের রূপ নেয়। মাসিক 'কচি ও কাঁচা'-র প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ, ১৩৭১)। এর সম্পাদক রোকনুজ্জামান খান নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত শিশুসাহিত্যিক এবং ইতঃপূর্বেও একাধিক পত্রিকার শিশুবিভাগ আর শিশুপ্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় পুষ্ট 'কচি ও কাঁচা' আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনচ্ছ রুচির স্বাক্ষর এ-পত্রিকায় কোনো দিনই দেখা যায়নি। কিন্তু প্রথম দিকে এর সম্পাদনায় কিছু দ্বিধান্বিত পদক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে। তবে, তার দ্বিধা ছিলো সাময়িক। সমগ্র বাংলার অন্যতমো শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিশুপত্রিকা 'কচি ও কাঁচা' মুক্তিসংগ্রামের সময় হানাদার বাহিনীর হামলার ফলে বন্ধ হয়ে যায়। 'সৃষ্টি সুখের উল্লাস'-এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে, গোলাম মোরশেদের সম্পাদনায়। পরবর্তী কালে এর সম্পা-দনার ভার নেন নীলুফার বানু। পত্রিকাখানির কপিগুলি দেখলে সন্দেহ হয়, নিছক সৌখিন উৎসাহ ছাড়া এর প্রকাশের আর কোনো কারণ ছিলো না। বাইরের আথিক সমর্থন এবং কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিশুসাহিত্যিকের রচনা পাওয়া সত্ত্বেও এ-পত্রিকা তাই চার সংখ্যার পরে আর অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে পাক্ষিক 'মুকুল' হোসেন কামালের সম্পাদনায় এবং মোহাম্মদ মোদাব্বেরের পরোক্ষ পরিচালনায় পূর্ণতঃ শিশুমাসিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক-পরিচালকের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আর আন্তরিকতা এবং খ্যাতনামা লেখকদের সস্নেহ সহযোগিতার বলে মাসিক 'মুকুল' আত্মপ্রকাশের অল্প কালের মধ্যেই দাঁড়িয়ে যায়। সাহিত্যপত্রিকায় রূপান্তরণের পর কর্তৃপক্ষ এর রচনাবলীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা খুব বেশী করেননি। তবু, পত্রিকাখানির সম্পর্কে একটি

কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'মুকুল' নতুন লেখক সৃষ্টির এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ দানের ব্যাপক আয়োজন করে। এমন আয়োজন ইতঃপূর্বে 'রঙধনু' ছাড়া আর কোনো শিশুপত্রিকায় দেখা যায়নি এবং সে-পত্রিকায় প্রতিযোগিতাও এতো ব্যাপক ছিলো না। প্রায় আড়াই বৎসর চলবার পর 'মুকুল' বন্ধ হয়ে যায়। মাসিক 'কলকণ্ঠ' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে, শরফ্উদ্দিন খানের সম্পাদনায়। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের স্নেহে ধন্য কিন্তু প্রকাশনার দিক থেকে দীন, এই পত্রিকাখানি চার সংখ্যার বেশী টিকে থাকতে পারেনি।

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম ষান্মাসিক শিশুপত্রিকা 'ফুলকি'। এর সম্পাদিকা ছিলেন আফিফা হক। সম্ভবতঃ চার সংখ্যার পর এর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী শিশুপত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে শিশুসাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে বৈচিত্র্যও দেখা যায় এই বৎসরেই। আমাদের দুখানি বিজ্ঞানপত্রিকা—'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' আর 'টরেটক্কা'-র আবির্ভাব ঘটে উক্ত বৎসরে, যথাক্রমে আগস্ট এবং অক্টোবর মাসে। দুখানিই মাসিক। 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' ঢাকার বিজ্ঞান গবেষণাগারের অন্যতমো মুখপত্র রূপে খন্দকার আবদুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কিশোর পাঠকজনের জন্যে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের আলোচনা প্রকাশনই ছিলো এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এর পাঠ্যপুস্তকসুলভ আকার এবং প্রচ্ছদ, নীরস এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাষা, অতি অনিয়মিত প্রকাশ, অক্ষম সম্পাদনা ইত্যাদি দেখলে মনে হয় না, উক্ত লক্ষ্য সাধনের কোনো প্রকার সদিচ্ছা আধা-সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানির কর্তৃপক্ষ পোষণ করেছেন। বস্তুতঃ, পাঠক-গ্রাহকের দৃষ্টি পরিহারের সর্ববিধ প্রয়াস ছিলো এর সকল কিছুতেই স্পষ্ট। ফলে, কার্যতঃ এ-পত্রিকা গবেষণাগারের কর্মীদের নাম মুদ্রণ তথা অনিকেত সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে পরিণত হয়। 'টরেটক্কা'-র আত্মপ্রকাশ ঘটে ঢাকার ওয়েস্ট এণ্ড হাই স্কুলের অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘের মুখপত্র রূপে, মোঃ আবদুল কাদেরের সম্পাদনায়। (পরবর্তী কালে অবশ্যি সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছাত্রের নাম দেখা যায়।) এর সব

কাজই সম্পাদিত হত সংঘের সদস্যদের দ্বারা। এ-পত্রিকা ছিলো স্কুলের ছাত্রদের। সুতরাং এর ঐশ্বর্যশালী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিষয়, ভাষা, রচনাশৈলী ইত্যাদিতে 'টরেটক্কা' ছিলো সত্যিই ছোটোদের উপ-যোগী এবং সত্যিকার শিশুভোগ্য পত্রিকা। যতো দূর জানি, বাংলা ভাষায় এমন শিশুতোষ বিজ্ঞানপত্রিকা আর প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকাখানির প্রায় দু'বছর টিকে ছিলো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের শহীদ দিবসে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে আরো একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি 'মিতালী বিজ্ঞান সংঘের মুখপত্র' রূপে চিহ্নিত ছিলো। এবং এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদনার ভার নেন এন, আহমেদ আলমগীর। পরবর্তীকালে সম্পাদক হন মিতা আহমেদ। পত্রিকাখানি ছিলো ত্রৈমাসিক। কিন্তু সম্পাদক-প্রকাশকরা এর পরিচয় দেন 'সংকলন' বলে। তাঁরা হয়তো চেয়েছিলেন কিশোরদের হাতে একখানি ত্রৈমাসিক বিজ্ঞানপত্রিকা তুলে দিতে। কিন্তু সম্ভবতঃ সরকারী অনুমতি গ্রহণের ঝামেলা পরিহারের জন্যে বা অনুমতি না পাওয়ায় তা করেননি। এবং এই জন্যেই তাঁদের পত্রিকার পরিচয় দিয়েছেন 'সংকলন' বলে।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে পত্রপত্রিকার থেকেও বেশী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সংকলন প্রকাশে। প্রথম দুটি পর্বে আমরা সংকলন পাই মোট আট-খানি। কিন্তু শুধু বৈচিত্র্যায়ণ পর্বেই সংকলন প্রকাশিত হয় অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দোখানি এবং এগুলির কিছু শ্রেণীগত বৈচিত্র্যও ছিলো। এ-সময়কার দুখানি সংকলন শুধুমাত্র ছড়ার, একখানি রূপকথার এবং দুখানি গল্পের।

এ-পর্বের প্রথম সংকলন সাহেরা বেগম চৌধুরানী-সম্পাদিত 'হরেক রকম' (১৯৬১)। আমাদের শিশুসাহিত্য-সংকলনগুলির মধ্যে প্রকাশনায় রুচির প্রথম আভাস দেখা যায় এই সংকলনখানিতে। যদিচ রঙে রেখায় মধুর কোনো বর্ণালী এ-সংকলন সৃষ্টি করেনি। অপিচ, নিছক গল্প রচনার সংগ্রহ 'হরেক রকম' চরিত্রে ছিলো পারিবারিক এবং সম্পাদনায় পরিকল্পনাহীন।

১৯৬১ সালে বন্দে আলী মিয়ার পরোক্ষ সম্পাদনায় এবং ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে আর একখানি সংকলন প্রকাশিত হয়। সংকলনখানির নাম 'ময়ূরপঙ্খী'। বাংলার শিশুতোষ সংকলনের

সমৃদ্ধ জগতে বাংলাদেশের সংকলনের প্রথম উত্তরণ 'ময়ূরপঙ্খী'-র মাধ্যমে। এর প্রকাশনায় রুচির যে ব্যাপ্তি দেখি, তা সত্যিই সুশোভন। অধিকন্তু, এতে বাংলা শিশুসাহিত্যের বহু প্রথম শ্রেণীর লেখকের রচনা সংকলিত হয়। কিন্তু এ-সংকলন সম্পূর্ণতঃ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের পরিচায়ক ছিলো না। এর রচনাবলীর এক-তৃতীয়াংশই পশ্চিম বাংলা থেকে নেয়া হয়।

'ময়ূরপঙ্খী'-র পর ঢাকা থেকে পাঁচমিশেলী রচনার সংকলন প্রকাশিত হয় তিনখানি। হাবীবুর রহমান-সম্পাদিত 'সপ্তডিঙ্গা' (১৯৬২), আল-কামাল আবদুল ওহাব-সম্পাদিত 'মধুমালতী' (১৯৬৪) এবং মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দীন-সম্পাদিত 'পূবালী ফসল' (১৯৬৪)। যদিচ প্রচ্ছদে আর রচনাচিত্রে—এবং প্রকাশনাসৌষ্ঠবেও—'ময়ূরপঙ্খী'-র তুলনায় ঈষৎ ম্লান, 'সপ্তডিঙ্গা' সর্বতোভাবেই বাংলাদেশের সংকলন। এর অধিকাংশ লেখক-লেখিকাই ছিলেন তরুণ। এমনকি, অনেকেই কার্যতঃ নতুন। এ-সংকলন তাই ছিলো, মুখ্যতঃ, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের নব রেখাবলীর সংগ্রহ। এবং এর অনুজ 'পূবালী ফসল'-ও। তবে, 'মধুমালতী'-তে প্রবীণ আর প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনাই ছিলো বেশী।

এই সংকলনগুলির পর ঢাকা থেকে যে সমস্ত সংকলন আত্ম-প্রকাশ করে, বিষয়ের দিক থেকে সেগুলি ছিলো শ্রেণীবিভক্ত। যেমন, ১৯৬৬ সালে শিশু গ্রন্থ মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত এবং ইদু বাউদিয়া-সম্পাদিত 'এলের পাত বেলের পাত'। অতি ক্ষীণকায় এই সংকলন-খানি ছিলো শুধুমাত্র ছড়ার। পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত হয় দুখানি সংকলন,—শামসুজ্জামান খান-সম্পাদিত 'সূর্যমুখী' এবং আবুল কাসেম চৌধুরী-সম্পাদিত 'মেঘমল্লার'। দুখানিই গল্পের, শুধুমাত্র গল্পের এবং মুখ্যতঃ তরুণদের রচনায় পুষ্ট। কেবল ছোটোগল্পের সংকলন 'সূর্যমুখী'-তে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাব্বিশটি রচনা সংগৃহীত হয়। এর সমস্ত গল্পই বিভিন্ন পূর্বজ সংকলন আর পত্রপত্রিকা থেকে নির্বাচিত। অর্থাৎ ফরমায়েসী রচনার উৎকর্ষে সম্পাদক আস্থাশীল ছিলেন না। 'মেঘমল্লার' সম্পূর্ণতঃই রূপকথাজীবী। সংকলনখানির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এর কোনো কোনো রূপকথায় আধুনিক বক্তব্য প্রচারিত হয়। ঢাকার সর্বশেষ গল্প-সংকলন

রোকনুজ্জামান খান-সম্পাদিত 'ঝিকিমিকি' (১৯৬৮)। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত এই সংকলনখানিতে প্রথম সংস্করণে চৌদ্দোটি এবং দ্বিতীয় সংস্করণে পনেরোটি গল্প সংগৃহীত হয়। লেখকদের প্রায় সকলেই আমাদের শিশুসাহিত্যের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রচনাগুলি মোটামুটি হিসেবে সুখপাঠ্য। 'ঝিকিমিকি' সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সংকলন। ১৯৬৮ সালেই সরকারী উদ্যোগে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ঢাকার সর্বশেষ সংকলন, ছোটোদের লেখা দেশাত্মবোধক গানের সংগ্রহ 'এদেশ আমার'।

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে মফঃস্বল থেকে আমরা পাই চারখানি সংকলন। মতলুব আলী-সম্পাদিত এবং রংপুর থেকে প্রকাশিত 'কলিকা' এখ্‌লাস-উদ্দিন আহমদ-সম্পাদিত এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ' (১৯৬৬) আর 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৬) এবং এমদাদুল কবির সিদ্দিকী-সম্পাদিত আর বগুড়া থেকে প্রকাশিত 'উদয়ন' (১৯৬৮)।

'কলিকা'-য় বিশজন লেখকের রচনা সংকলিত হয়। তাঁদের অধিকাংশই—এবং 'উদয়ন'-এর লেখকরাও—ছিলেন নতুন। 'ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ'-এও নতুন লেখক কিছু দেখা গেছে। এবং 'টাপুর টুপুর'-এও। কিন্তু এই সব নতুন লেখক যে-রচনাশক্তির অধিকারী, 'কলিকা'-র বা 'উদয়ন'-এর নতুন লেখকদের তা ছিলো না। বস্তুতঃ, উক্ত সংকলন দুখানি সম্পূর্ণরূপেই সৌখিন প্রয়াসের ফল।

'ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ' প্রকাশনাসৌষ্ঠবে আর অঙ্গসজ্জায় এদেশের অন্যান্য সংকলনের তুলনায় কেবল উন্নততরোই নয়, অপরূপও। কার্যতঃ, এসব বিষয়ে সংকলনখানি সত্যিকার অর্থেই শিশুমনোহর এবং যে কোনো অতি আধুনিক সংকলনের সগোত্র। অপিচ, এর লক্ষ্য ছিলো কেবল ছড়া সংগ্রহ করা। এবং এর সংগ্রহে রচনাভঙ্গি আর বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও একেবারে উপেক্ষিত থাকেনি। তবে, যদিচ ছড়া নামে সংগৃহীত, এর অধিকাংশ রচনাই আসলে 'উচ্চাঙ্গের পদ্য'। সংকলনখানির আরো একটি দুর্বলতা ছিলো। এর চৌষট্টিজন ছড়াকারের মধ্যে মাত্র বাইশজন বাংলাদেশের। বাকী সবাই পশ্চিম বাংলার। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হলেও এ-সংকলন মাত্র এক-তৃতীয়াংশে এদেশের ছড়াসাহিত্যের

পরিচয় দেয়। রচনাবলীর অতর্কিত উৎকর্ষ সত্ত্বেও সংকলনখানি তাই আমাদের মনকে তৃপ্ত করে না। এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদের দ্বিতীয় সংকলন 'টাপুর টুপুর' পাঁচমিশেলী রচনার সংগ্রহ এবং উক্ত নামের শিশুমাসিক প্রকাশনের ভূমিকা। প্রকাশনাসৌষ্ঠবে আর অঙ্গসজ্জায় এখানিও অপরূপ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, 'টাপুর টুপুর'-এ এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ পরদেশনির্ভর নন। এবং সামান্য দোষত্রুটি সত্ত্বেও রচনার ঐশ্বর্যে 'টাপুর টুপুর' বাংলাদেশের অন্যতমো শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য-সংকলন। প্রথম প্রকাশের কিছু কাল পর এর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ওপরে আমি বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তাতে এর সকল শাখারই অগ্রগতি আর প্রবণতাবলীর হিসেব দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু অনিবার্য কারণেই এ-আলোচনা সংক্ষিপ্ত। এবং অবশ্যই অসম্পূর্ণও। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ, আলোচিত কালের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই দশক, কিন্তু আলোচনার পরিসর সীমিত। অন্য দিকে, গ্রন্থাদির অভাব আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ করবার পথে এক দুর্ভেদ্য বাধা। প্রথম অসুবিধাটির ক্ষেত্রে আপাততঃ আমাদের কিছুই করণীয় নেই। কিন্তু দ্বিতীয়টির সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য-সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনার অবলম্বন, ওপরের মন্তব্যাদি থেকেই লক্ষণীয়, মুখ্যতঃ গ্রন্থকেন্দ্রিক। কিন্তু এ-সাহিত্যে এমন বহু রচনা আছে, যা যে কোনো বিচারেই সার্থক, অথচ গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছন্দিত রচনার ক্ষেত্রে। আমরা আগেই দেখেছি, আমাদের শিশুসাহিত্যে ছন্দিত রচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, কিন্তু এ-জাতীয় রচনার গ্রন্থের সংখ্যাই সবচেয়ে কম।

গ্রন্থের এই অভাবের কারণ যা-ই হোক না কেন, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এদেশের অনেক লেখকই প্রকাশনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। কেউ অংশতঃ, কেউ বা সম্পূর্ণতঃ। প্রকাশনার সুযোগ যাঁরা আদৌ পাননি, তাঁদের দলে আছেন আমাদের প্রথম সমাজসচেতন শিশুরঞ্জক কবি প্রজেশকুমার রায়, পল্লীগতপ্রাণ কাজী কাদের নওয়াজ

এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে আর অগতানুগতিকতায় ভাস্বর আহসান হাবীব। অথচ তাঁদের কারো রচনাই পরিমাণে তুচ্ছ নয়।

১৯৬২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত প্রজেশকুমার রায়ের কবি-জীবন শুরু হয় বিভাগপূর্ব কালে। কিন্তু তাঁর অধিকা[illegible] রচনারই প্রকাশকাল ষষ্ঠ দশক। প্রজেশকুমার রায়ের কাছে সাহিত্য কেবল নেশার বিষয়ই ছিলো না, পেশাও ছিলো। এ-কারণে এবং সমাজ-নৈতিক চেতনার প্রখরতার দরুনও—তাঁর লেখনী স্থি[illegible]-নিশ্চিন্ত সাধনার অবকাশ পায়নি। তবু, গতানুগতিকতার প্রতি বিমুখ বলে তিনি আমাদের শিশুসাহিত্যের যে কোনো আলোচনায় স্মরণীয়। তাঁর সমাজচেতনার সাথে প্রায় ক্ষেত্রেই মিশে রয়েছে এক হাস্যরসের ধারা। যেমন, নীচের ছড়াটিতে,—

তাইরে নাইরে নাইরে না।
ঢাকা গেলেই টাকা পাবে,
টাকার অভাব থাকবে না।
ঢাকা থেকে এলো খবর,
টাকার জন্যে আসবে না।...
ঢাকা গেলেই চিনি খাবে,
[illegible]বার অভাব থাকবে না।
ঢাকা থেকে জবাব এলো,
খাবার জন্যে আসবে না।...

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রজেশকুমার রায় ছোটোদের জন্যে কেবল ছড়াই লেখেননি, কিছু কবিতা এবং গল্পও লিখেছিলেন।

গল্প এবং কবিতা উভয়ের ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন আহসান হাবীবও। কিন্তু কাজী কাদের নওয়াজ প্রায় সর্বাংশেই কবিতার সেবক। তিনি সামন্ততঃ২ পল্লীর রূপরসে মুগ্ধ। যে-রূপরসের উৎস কুটির-সারির ছায়াম্লানায়, তরুলতার আন্দোলনে, ছোটো নদীর কলস্বনে, এবং দোয়েল-কোয়েলের গীতকলিতে। মাঝে মাঝে তাঁকে অবশ্যি হাস্যরসের রসিক রূপে এবং নীতিপ্রচারকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। কিন্তু সেসব যেন ব্যতিক্রম।

প্রজেশকুমার রায়ের রচনায় যা মিত পরিসরে আভাসিত, বাংলাদেশের অন্যতমো শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক আহসান হাবীবের রচনায় তা ব্যাপ্ত। তাঁরা একই যুগধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু আহসান হাবীবের রচনা-বলীতে প্রচার গৌণ। সন্দেহ নেই, সমাজচেতনার সাথে শিল্পচেতনার সখ্য স্থাপনের প্রয়োজনে অবিচল বিশ্বাস এর অন্যতমো কারণ। অপিচ, কবিতার ক্ষেত্রে তিনি নিরীক্ষাপ্রিয়। গদ্য এবং পদ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই তিনি অংশতঃ কেবল আনন্দদাতা, অংশতঃ আদর্শবাদী। তাঁর একখানি শিশুতোষ উপন্যাস এবং একখানি রূপকথাগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও ছন্দিত রচনা বা নিগ্রহ গল্প আজও গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করেনি। ছড়া এবং কবিতা রচনায় সমভাবে নিপুণ, আধুনিক শিশুসাহিত্যিক আহসান হাবীবের 'শীতের গান' শীর্ষক একটি বিখ্যাত কবিতার একাংশ,—

জানলায় চোখ রেখে চোখ যায় যদ্দুর—
খুকুমণি বলে,
মাগো, বলোতো মা কদ্দুর,
রোদ আর কদ্দুর!
আমার খোকন যদি মাগো, মা
শীতে যায় মরে যায় হ্যাঁগো মা
মা তবে
কি হবে?...
আয় আয় রোদ্দুর আয় ভাই
দেবো—গরম গরম পিঠে যতো চাই—
কি হবে মা, আমার যে সারা বুক
ঢিপ, ঢিপ, ধ্বকধ্বক দুরদুর!

বলা বাহুল্য, প্রকাশনার সুযোগ থেকে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত অপেক্ষা-কৃত তরুণ এবং নবীনের দল। তাঁদের কারো কারো অধিকাংশ রচনা এবং অধিকাংশেরই সমস্ত রচনা এখনো পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। এ-দলের সবচেয়ে শক্তিমান অথচ সবচেয়ে দুর্ভাগা লেখক শামসুর রাহমান। যিনি সপ্তম দশকে মাত্র কয়েক বছরের সাধনায়ই রচনায় পরিমাণ, বিষয়ের বর্ণিল বৈচিত্র্য, শিল্পের নৈপুণ্য আর সমাজচেতনার

প্রাখর্য দিয়ে আমাদের অভিভূত করে ফেলেন। তিনিও গদ্য এবং পদ্য উভয়েরই কারবারী। কিন্তু তাঁর গদ্য রচনার সংখ্যা কম। আধুনিক কাব্যরীতির অনুরাগী এবং নিষ্ঠাবান সাধক শামসুর রাহমান তাঁর শিশুতোষ ছন্দিত রচনায় ভাষা বা ছন্দ নিয়ে খুব বেশী পরীক্ষানিরীক্ষা করেননি। এসবে তিনি মুখত্যঃ সাধারণ কাব্যরীতির কুণ্ঠাহীন অনুসারী। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এ-সত্ত্বেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রখর। একটি ছড়ায় তিনি নিজেই পাঠকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,—

আমার ছড়া টিয়ের মতো,
ঠোকর মারে জোরসে,
দোষ দিবিনে দুই চোখে তুই
দেখিস যদি সর্ষে!

কাব্যিক ক্ষমতায় শক্তিমান এবং সমাজচেতনায় সবল আরো অনেকের রচনাই আলোচিত কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। যেমন, আবু সালেহ, রফিকুল হক, মীর মোশাররফ হোসেন আর আখতার হোসেন। আলোচিত কালের শিশুসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন এই সব—এবং উপরি-উক্ত অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকের—রচনাবলী গ্রন্থাকারে পাওয়া যাবে।

এতোক্ষণ যা বলা হয়েছে, তার ভিত্তিতে আরো দুই-একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে এই আলোচনায় যতি টানি।

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য বস্তুগত উপকরণ আর শিক্ষাগত তথা সাংস্কৃতিক চেতনার অপ্রতুলতার দরুন গোড়ার দিকে বিশেষ অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। কিন্তু কালক্রমে সে এই সব অসুবিধা অনেকাংশেই কাটিয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় আদর্শের আংশিক অস্পষ্টতা, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদির জন্যেও সে-সময়ে আমাদের শিশুসাহিত্য কম বিঘ্নিত হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ অবশ্যি উপমহাদেশ-বিভাগের অনতিকাল পর থেকেই উক্ত অস্পষ্টতা আর সঙ্কীর্ণ মনোভাবকে ঘৃণা করতে শেখে। এর এক স্পষ্ট প্রমাণ জীবনীসাহিত্যের ক্রমবর্ধমান উদারতা। রাষ্ট্রের

নীতিগত প্রতিকূলতা আর তার অনুসারী কিছু ব্যক্তির পথরোধী উল্লম্ফনের দরুন এই উদারতা অবশ্যি সাধারণ মানবতাবোধের বাইরে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। বিশেষ করে, প্রতিবাদী চেতনায় আর প্রগতিশীল চিন্তায়। অন্য দিকে, শিশুসাহিত্যের গুণগত অগ্রগতি তো দূরের কথা, তার সংখ্যাগত অগ্রগতিতেও রাষ্ট্রের আনুকূল্য ছিলো প্রায় শূন্যের কোঠায়। এমনকি, রাষ্ট্র তার নিজস্ব নীতি আর আদর্শের প্রচারেও উল্লেখযোগ্য বা বিশদ কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সর্বশেষে, বিষয়ের বৈচিত্র্যের হিসেব নিতে গেলে আমরা দেখি, পাকিস্তানী আমলের শিশুসাহিত্যে বর্ণালী স্বল্পরেখ। বিশেষতঃ, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। যেখানে জীবনকথা ছাড়া জ্ঞান বা আদর্শের আর কোনো ব্যাপক উৎস আমরা খুঁজে পাইনি। এক্ষেত্রে—এবং অন্যত্রও—আমাদের ইতিহাস সন্ধানে আমরা ছিলাম নিরাগ্রহ. দেশের সামাজিক, ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বৈচিত্র্যের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন এবং তার শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি নিদারুণভাবে উদাসীন। এমনকি, শিশু তথা কিশোর পাঠকদের সাধারণ জ্ঞান দানের জন্যে একখানি বিশ্বকোষও আমরা প্রণয়ন করতে পারিনি।

তবু, ওপরের আলোচনা থেকে এও তো স্পষ্ট যে, নানাবিধ দুর্বলতা আর অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা যা পেয়েছি. তাও আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। বরং তার অনেকখানিই আমাদের গর্বের বস্তু। আর তার চেয়েও বড়ো কথা,—আমার বিশ্বাস, সবচেয়ে বড়ো কথা,—এক দশকের ওপর সামরিক যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার সময়েও আমরা অগ্রগতি সাধন করেছি। কেবল সংখ্যাগত দিকে নয়, গুণগত দিকেও, প্রতিবাদী চেতনায় আর প্রগতিশীল চিন্তায়, প্রাক-সামরিক যুগেও যা ছিলো দুর্লভ। একটি গঠনমুখী সাহিত্যশাখার এমন অগ্রগতি অবিস্মরণীয়।

[১৯৭৩]